ATMA JIBONI, PRABHANDA, RAMYA RACHANA, BHRAMAN KAHINI

MA [Bengali]

Fourth Semester

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr Aniruddha Biswas

Assistant Professor, Sree Gopal Banarjee College Bagati, Hoogly

Authors

1. **Dr. Tapan Kumar Mandal,** Professor, Department of Bengali, Daimon Harbar Women University
2. **Swaraj Kumar Das,** Assistant Professor, Department of Bengali, Fakirchand College
3. **Debyan Chaudhuri,** Assistant Professor, Department of Bengali, Sahid Matangini Hajra Govt College for Women
4. **Dr. Sanat kumar Mandal,** Professor, Department of Bengali, Culcutta University

Copyright © Reserved, 2018

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বইম্যাপিং
প্রথম একক : আত্মজীবনী	**একক -১** পৃষ্ঠা (1 - 84)
দ্বিতীয় একক : প্রবন্ধ	**একক - ২** পৃষ্ঠা (84 - 142)
তৃতীয় একক : রম্যরচনা	**একক - ৩** পৃষ্ঠা (143 - 178)
চতুর্থ একক : ভ্রমণসাহিত্য	**একক - ৪** পৃষ্ঠা (179 - 216)

সূচীপত্র

প্রথম একক : আত্মজীবনী **পৃষ্ঠা (1 - 84)**

রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নির্বাচিত অংশ) : শিবনাথ শাস্ত্রী

দ্বিতীয় একক : প্রবন্ধ **পৃষ্ঠা (85 - 142)**

শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ : সুশোভন সরকার

শব্দের পবিত্রশিখা : শঙ্খ ঘোষ

বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সম্ভার : কাজী আবদুল ওদুদ

রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষাসমস্যা : অশোক মিত্র

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টিতে : আনিসুজ্জামান

তৃতীয় একক : রম্যরচনা **পৃষ্ঠা (143 - 178)**

চাচাকাহিনী : সৈয়দ মুজতবা আলী

চতুর্থ একক : ভ্রমণসাহিত্য **পৃষ্ঠা (179 - 216)**

মরুতীর্থ হিংলাজ : অবধূত

টিপ্পনী

মুখবন্ধ / ভূমিকা

টিপ্পনী

আমরা এই বই থেকে যে বিষয়গুলি জানতে পারবো -

(ক) আত্মজীবনী :

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ		: শিবনাথ শাস্ত্রী

(খ) প্রবন্ধ :

শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা	:	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ	:	সুশোভন সরকার
শব্দের পবিত্রশিখা	:	শঙ্খ ঘোষ
বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সম্ভার	:	কাজী আবদুল ওদুদ
রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষাসমস্যা	:	অশোক মিত্র
উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টিতে:		আনিসুজ্জামান

(গ) রম্যরচনা :

চাচাকাহিনী	:	সৈয়দ মুজতবা আলী

(ঘ) ভ্রমণসাহিত্য :

মরুতীর্থ হিংলাজ	:	অবধূত

প্রথম একক :আত্মজীবনী

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী

টিপ্পনী

বিন্যাসক্রম :

১. ভূমিকা

২. বিষয়সংক্ষেপ

৩. রামতনুর জন্মকথা, সমকাল ও কলকাতার অবস্থা

৪. উনিশ শতক : বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তার ও হিন্দু কলেজ

৫. বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন ও বিস্তার

৬. বিদ্যাসাগরের যুগ

৭. ব্রহ্মসমাজের নব উত্থান ও প্রভাব

৮. রামতনু লাহিড়ীর অন্তিম জীবন পর্ব

৯. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

১. ভূমিকা :

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের প্রণেতা শ্রী শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭ - ১৯১৯) মহাশয় সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে দুচার কথা জানা প্রয়োজন। তাঁর লেখা এই উল্লেখযোগ্য চরিতধর্মী গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনার পূর্ব প্রাবন্ধিক তথা সমাজ সংস্কারক শিবনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে হয়, রামতনুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল বড়ই নিবিড়। এ প্রসঙ্গে শিবাথ শাস্ত্রী বলেছেন, 'যেমন চুম্বকে যে দিকে টানে, তেমনই তিনি আমাকে টানিয়া লইলেন'। রামতনুর মৃত্যুর পর শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপর দায়িত্ব আসে তাঁর জীবন চরিত লেখার। যাইহোক এই লেখক শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম মাতুলালয়ে। বাংলা ১২৫৩ সাল, ১৯ শে মাঘ, ইংরেজি ১৮৪৭ সাল ৩১ শে জানুয়ারী, রবিবার পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম। ক্রমশ মামা বাড়িতে বড়ই আদর যত্নে শিবনাথ প্রতিপালিত হতে থাকেন। শিবনাথ ভূমিষ্ট হয়ে মাতামহী, তাঁর দুই জননী, দুই মামী, দুই মাসী ইত্যাদির আদর অভ্যর্থনার অন্ত রইল না। কিন্তু কিছুদিন পর তার মাতুলালয়ে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হল। অবশেষে মায়ের সঙ্গে মজিলপুর এলেন। যাইহোক ক্রমশ বড় হয়ে ওঠা। নয় বছর বয়সে শাস্ত্রী মহাশয়ের উপনয়ন হয়। এর অল্প দিন পর বাবার সঙ্গে তিনি কলকাতায় চলে এলেন। শুরু হয়ে গেল

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

টিপ্পনী

শিবনাথের জীবনের গতি পরিবর্তন। এরপর পরিণত বয়সে শিবনাথ ১৮৮৮ খ্রীঃ ১৫ এপ্রিল কলকাতা থেকে বিলাত যাত্রা করেন। ছয়মাস পরে তিনি বিলাত থেকে ফিরে আসেন। পরিণত বয়সে পন্ডিত শিবনাথ কবি ভবুক ও রসিক পুরুষ হয়ে ওঠেন। সংস্কৃত ভাষার সুপন্ডিত শিবনাথের গদ্যে পদ্যে ভাষার নবমাত্রা পেয়েছে। বলা যায়, পন্ডিত শিবনাথ বাংলা দেশের এক বিশেষ যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর যৌবনে কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষায় দীক্ষিত একদল বাঙালির মধ্যে একটা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রবল বণ্যা বয়ে গিয়েছিল। যৌবন কাল থেকে আমৃত্যুকাল শিবনাথ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের স্রোতে প্রবাহিত হয়েছিল। কাজেই একথা ধ্রুব সত্য উনিশ শতকের সংস্কার যুগের ইতিহাসের সঙ্গে পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন ও কর্ম ধারা অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। বলাবাহুল্য, ব্রাহ্ম সংস্কার যুগেদর একটা ইতিহাস আছে, পন্ডিত শাস্ত্রী মশাই সে ইতিহাস লিখে গেছেন। সুতরাং বলা যায় উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসের মূল্যবান বহুবিধ উপকরণ শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনার মধ্যে ছড়ানো রয়েছে। তেমনই এক মূল্যবান উনিশ শতকের উপকরণ সমৃদ্ধ একটি চরিতধর্মী গ্রন্থ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'।

পূর্বেই বলেছি 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা এক অণ্যতম জীবন চরিতধর্মি গ্রন্থ। উনিশ শতকের সমাজকে জানতে গেলে এই অণুপম ও অসমান্তরাল গ্রন্থ পাঠ না করলে অপূর্ণতা থেকে যাবেই - একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই। কৃষ্ণনগরের লাহিড়ী পরিবারের সন্তান রামতনু সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি মন্তব্য দিয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকা অংশে লেখক বলেছেন - 'তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে সমাগত ভদ্রলোকদিগের অনেকেই এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার একখানি জীবনচরিত লিখিত হয়। তাহার পুত্র শরৎকুমার ও আমাকে সে বিষয়ে অণুরোধ করিলেন। গৃহে আসিয়া ভাবিতে ভাবিতে তাহার একখানি জীবন চরিত লিখিবার ইচ্ছা হইল।' বলাবাহুল্য যার ফলস্বরূপ আমরা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে এ গ্রন্থ পেলাম। লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী খুব ছোটবেলা থেকেই রামতনু লাহিড়ীর নাম শুনে পরিচিত। শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতামহ স্বর্গীয় হরচন্দ্র ন্যায়রত্নের কাছে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় কিছুদিন বাড়ীতে শিক্ষা নেন। কিন্তু অল্প সময় পড়িয়ে থাকলেও শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতামহ সেই গুণগ্রাহী ছাত্রের গুণে মুগ্ধ। কাজেই তাঁর সম্পর্কে প্রশংসা শাস্ত্রী মহাশয় বাল্যকাল থেকেই শুনে আসছেন। সৌভাগ্য বলত সেই গুণী সাধু পুরুষের সঙ্গে কলকাতায় ১৮৬৯ সালে শবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম পরিচয় হয়। তারপর একে অপরের বড়ই পছন্দের মানুষ হয়ে ওঠেন। রামতনু লাহিড়ী মহাশয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বড়ই আপনজন বা কাছের মানুষ হিসেবে গ্রহণ করলেন। এমনকি লাহিড়ী পরিবারের মানুষেরা শাস্ত্রী মহাশয়কে আত্মীয় বলেই স্বীকার করে নিলেন।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

2

উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় অবশ্যই রামতনু লাহিড়ি মহাশয় সমাজ সংস্কার

আন্দোলনের একজন অণ্যতম ব্যাক্তি। সেই সুহৃদ ব্যাক্তির জীবন চরিত লিখতে বসে শিবনাথ শাস্ত্রী অনুভব করলেন, লাহিড়ী মহাশয় যৌবনের প্রথম পর্বে নব্যবঙ্গের তিন দীক্ষাগুরু তথা রামমোহন, ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও দ্বারা প্রভাবিত ও তাঁদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। সুতরাং রামতনু লাহিড়ীকে আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই সমকালের বঙ্গসমাজ ও তৎকালীন সমাজ সংস্কারক যুবকবৃন্দকে বাদ দিয়ে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। বলাবাহুল্য বঙ্গদেশে সমকালের অনভান্য সমাজ সংস্কারকদের মতই রামতনু লাহিড়ী ও একজন। সুতরাং বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্ত সহ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন চচরিত লিখতে মনস্থির করলেন শাস্ত্রি মহাশয়। এছাড়াও শাস্ত্রী মহাশয় আরও একটি কারণ হিসেবে তাঁর এই গ্রন্থের ভূমিকা অংশে লিখেছেন - 'ইহার আর একটু কারণও আছে।আমার পূর্ববর্তি কোন কোন ও লেখক ডিরোজিও ও তাঁহার শিষ্যদলের প্রতি বিশেষ অবিচার করিয়াছেন। তাঁহার ইহাদিগের নাস্তিক ও সমাজ বিপ্লবেচ্ছু যথেচ্ছাচারী লোক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এরূপ অমূলক অপবাদ আর হইতে পারে না।'

অবশ্যই একথা স্বীকার্য রামতনু লাহিড়ী ছিলেন ডিরোজিওর যথার্থ অনুগামী। ডিরোজিও ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তিনি গুরুর ভাব পেয়েছিলেন। চিরদিন গুরুকে হৃদয়াসনে বসিয়ে তিনি পূজা করেছেন। সমাজে নাস্তিক গুরুর নাস্তিক শিষ্য হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর জীবনচরিতে প্রমাণ দেয় তার ঈশ্বর ভক্তির কথা। তাঁর ঈশ্বর ভক্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন -

> "আমাদের গৃহে যখন তিনি বাস করিতেন, তখন সর্বদা দেখিতাম সে, অতি প্রত্যুষে তিনি উঠিয়াছেন, এটি ওটি করিতেছেন এবং গুণগুণ স্বরে গান গাইতেছেন - "মন সদা কর তাঁর সাধনা"। আমার বিশ্বাস এই সাধনা তার নিরন্তর চলিত। এই কি নাস্তিক গুরুর শিষ্য ? অতএব প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা দেখাইয়া ইহাদিগকে অকারণ অপবা হইতে রক্ষা করাও আমার অণ্যতর উদ্দেশ্য।"

২.বিষয় সংক্ষেপ :

প্রথম পরিচ্ছেদ : কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগরের রাজবংশ ও কৃষ্ণনগরে লাহিড়ীদের বাস।

রামতনু লাহিড়ী, এই নামের সাথে কৃষ্ণনগরের যোগাযোগ বড় গভীর। আর কৃষ্ণনগর - এর আলোচনায় সবার প্রথমে স্মরণীয় নদীয়ার রাজপরিবার। এই রাজপরিবারের সঙ্গে লাহিড়ী বংশীয়দের যোগাযোগ বহুদিনের। লাহিড়ী পরিবারের কৃষ্ণনগরে আগমণ ও বাসের ইতিহাসের দিকে দেখলে চোখে পড়বে রাজপরিবারের সাথে সংযোগ সূত্রতা।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

4

রাজপরিবার ও লাহিড়ী পরিবারের সমান্তরাল যাত্রাপথে, পারস্পারিক ও সৌহার্দ্যের ক্ষেত্রে ভক্তিভাজন শ্রী রামতনু লাহিড়ীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁকে জানা বা বোঝার জন্য প্রয়োজন তাঁর সমকালীন ইতিহাসের নিরিখে কলকাতা ও কৃষ্ণনগর ও কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ইতিহাস প্রথমেই আলোচ্য। জনশ্রুতি আছে, ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর আদিশূর কোন যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য কন্যাকুজ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আনান, তার মধ্যে ভট্টনারায়নের উত্তর পুরুষই হোলেন কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার। যদিও এই বিচারের ক্ষেত্রে একটি কাহিনী মনে রাখা প্রয়োজন - ভট্টনারায়নের উনত্রিশতম পুরুষ কাশীনাথ ছিলেন ভূমির অধিকারী ও ধনবান। এঁদের আদিবাস ছিল বিক্রমপুরে। সম্রাট আকবরের শাসন কালে বাংলার নবাব তাকে বিতাড়িত করলো, পালানোর পথে নবাবের সেনাদের হাতে তিনি ধরা পড়েন ও নিহত হন।তাঁর আসন্নপ্রসবা স্ত্রী আশ্রয় পান আন্দুলিওয়া নিবাসী বাগওয়ান পরগনার জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের বাড়ীতরে। সেখানে তাঁর একটি পুত্র জন্মালে তার নাম রাখা হয় রামচন্দ্র। নিঃসন্তান হরেকৃষ্ণ তাকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে তাকে সমাদ্দার উপপাধি দেন। তাই রামকচন্দ্র সমাদ্দারেদর চারপুত্রের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন ভবানন্দ। ইনি বিদ্রোহী যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য কে দমন করার জন্য পাঠানো সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাপতি রাজা মানসিংহকে সাহায্য করার কারনে সম্রাটের প্রসন্নতায় নবদ্বীপে প্রভৃতি কয়েকটি পরগণার জমিদারী ও 'মজুমদার' উপাধি লাভ করেন। এই ভবানন্দ মজুমদার কৃষ্ণনগরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আগে মাটীয়ারী নামকের একজায়গায় এই বংশের রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক গোপজাতির বাসস্থল সেই জায়গা তখন রেউই নামে একটা ছোট গ্রাম ছিল এবং ঐ সমস্ত গোপেরা মহাসমারোহে কৃষ্ণের পুজো করত বলে রাঘবের পুত্র রুদ্র রাজনধানীর নাম রাখলেনক কৃষ্ণনগর। সেই থেকে এই কৃষ্ণনগরই রাজাদের বাসভূমি হয়ে আছে। যদিও এর মাঝে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মহারাষ্ট্রীয়দের জ্বালাতনে ভীষণ বিরক্তিবোধ করে কৃষ্ণনগর ত্যাগ করে তার ছ'ক্রোশ দূরে বড় ছেলের নামে 'শিবনিবাস নগরের স্থাপনা করে কিছুদিন সেখানে ছিলেন কিন্তু তাঁর নাতি ঈশ্বরচন্দ্র শিবনিবাস ত্যাগ করে আবার কৃষ্ণনগরেই ফিরে আসেন। ক্রমশ কৃষ্ণনগর বাঙলাদেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান হয়ে ওঠে। সমসময়ে নদীয়ার রাজারা ছিলেন হিন্দু সমাজপতি, কুলধর্মেদর রক্ষাকারী ও গুণীজনের উৎসাহদাতা এবং নামেমাত্র যবন রাজাদের অধীনে থেকেও সবদিক থেকেই স্বাধীন রাজার মতো বসবাস করতেন এই পরিবার। এই বংশের রাজাদের মধ্যে সবথেকে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন মহরাজ কৃষ্ণচন্দ্র। ভবানন্দ মজুমদারের সময় থেকে জমিদাররীর উন্নতি হতে থাকলেও কৃষ্ণচন্দের সময় একাশিটি পরগনা এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রুদ্রের ছেলে রমাজীবন; রামজীবনের ছেলে রঘুরাম, রঘুরামের ছেলে কৃষ্ণচন্দ্র। তার জন্মকাল ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দ। অতি অল্প বয়স থেকেই তাঁর কার্য কুশলতা ও চরিত্রে চাতুরীর প্রমাণ মেলে। জনরব আছে যে, তিনি তাঁর বাবার

থেকে উত্তরাধিকারত্বে বঞ্চিত হলেও আপন চাতুর্যে সেই সম্পত্তি লাভ করেন। এর কিছু সময় পরে বঙ্গদেশের দক্ষিণ দিকে মহারাষ্ট্রীয়দের উপদ্রব অত্যন্ত বাড়তে থাকে। নাগপুর বাসী মহারাষ্ট্রীয়রা তাদের পাওনা 'চৌথ' আদায়ের ছলে দিল্লী সম্রাটের অধিকারভুক্ত নানা জায়গায় আক্রমণ করলে তাদেদর উপদ্রবের আঁচ বাঙলাতেও ছড়াতে থাকে। এই ঘটনা বাঙলার ইতিহাসে বর্গীরা হামলা নামে খ্যাত। সময়টা ১৭৪০, বাংলার মসনদে তখন নবাব আলিবর্দী খাঁ; বর্গীর হাঙ্গামা ক্রমশ ছড়াতে লাগল। কৃষ্ণচন্দ্রের শাসন কালের মাঝামঝি আলিবর্দী খাঁ পরলোক গমন করলে তাঁর মেয়ের ছেলে সিরাজদৌল্লা বাংলা সিংহাসনে বসেন । সুখপ্রিয় তরলমতি সিরাজেদর নানা অত্যাচারে নাজেহাল রাজ্যের প্রধান ব্যাক্তিরাএক হয়ে তাকে সিংহাসনচ্যুত করার পরিকল্পনা করলে, জনশ্রুতি আছে যে, রাজা মহেন্দ্র রাজা রামনারায়ন প্রমুখের ডাক পেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সেই সভায় যান এবং তাঁরইও পরামর্শে ইংরেজদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হবে এমনটাই ঠিক হয়। সিরাজ নিহত হলে আলিবর্দী খাঁর জামাতা মীরজাফর সিংহাসনে বসেন, তার পর তার ছেলে মীরণ ও তারপরে জামাতা মীরকাশীম নবাবের পদে বসেন। মীরকাশীমের রাজত্বকালে কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর ছেলে শিবচন্দ্রকে মুঙ্গেরের দূর্গে কিছুদিন বন্দী করা হয়, ইংরেজদের সহায়তা করার অপরাধে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমের কাছ থেকে বাঙলা - বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের দেওয়ানীর সনদ পেয়ে ইংরেকজরা রাজস্ব বাড়ানোয় মনোযোগ দিলেও তাঁদের অনভিজ্ঞতায় যে ঘোর বিশৃঙ্খললার সৃষ্টি হয় তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে অর্থনীতিতে। সাথে দুবছরের অনাবৃষ্টির ফলে ভয়াবহ মন্বন্তরে বাঙলা পরিণত হয় শ্মশানে ।ছিয়াত্তরেদর মন্বন্তর প্রায় এক কোটি লোকের প্রাণ কেড়ে নিলেও নতুন প্রতিষ্ঠিত ইংরেজশাসকের তরফ থেকে এই মহামারী রোথ করার জন্য কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না। এরপরেই ইংরেজ সরকার বাঙলা দেশকে নানা পরগণায় ভাগ করে জমিদারদের সাথে রাজস্বের নতুন ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হন এবং সেই সময়েই নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর বড়ছেলে শিবচন্দ্রের নামে জমিদারীর নতুন বন্দোবস্ত করে নিলেন।

দৃঢ়চেতা অধ্যাবসায়শীল কার্য্যক্ষম কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন গুণগ্রহিতা ও গূণীগণের উৎসাহদাতা। বিক্রমাদিত্যের মতো তাঁর রাজসভাও অলংঙ্কৃত করে থাকত সুপন্ডিত , সুকবি, সুগায়ক ও সুরসিকগণ। এমনই অসংখ্য প্রতিভাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবিবর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কর। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ডাকেই তিনি কৃষ্ণনগরে আসেন ও রাজা দেশেই রচিত হয় মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অন্নদামঙ্গল। শুধু ভারতচন্দ্র নয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুণীজনের সমাদরের দীর্ঘতালিকায় সুপ্রসিদ্ধ রামপ্রসাদ সেন, সুরসিক গোপালভাঁড়ের প্রমুখের নাম মেলে। বিদ্য-বুদ্ধি-সুরসিকতার কদর দানে সমর্থণ হলেও কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কারের প্রতি। বরং একথা বলা যায় যে, সামাজিক প্রাচীন যে সমস্ত কুরীতির জালে সমাজ তথা দেশ আবদ্ধ হয়েছিল তিনি সেই

টিপ্পনী

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

6

জালকে কাটার প্রয়াস না করে, বরং সেই জালকে আচরো বেশী দৃঢ় করেছিলেন। জনরব আছে যে, রাজা রাজবল্লভ নিজের অল্পবয়সী বিধবা মেয়ের দুঃখ -যন্ত্রনা কে উপলব্ধি করে দেশের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রথা চালু করার চেষ্টা করলে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিকূল তার কারণেই তা সম্ভব হয়নি। কৃষ্ণচন্দ্রের পর নদীয়ার সিংহাসনে বসেন রাজা শিবচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, তারপর গিরীশচন্দ্র- এঁদের মধ্যে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ছীলেন অমিতব্যয়ী ও শৃঙ্খলতাবিহীন একটি মানুষ; যার কারণে কৃষ্ণচন্দ্রের সময়কার নদীয়া রাজ্যের যে উন্নতি সাধন হয়েছিল তার অবনতি ঘটতে লাগল। জমিদারী বিক্রি হতে আরম্ভ হোল, নিলামে চড়তে লাগল ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকল। এঁর পরবর্তীতে গূণীগণের উৎসাহগত মহারাজ গিরীশচন্দ্র সিংহাসনে বসলেও বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ না করে ধর্মানুষ্ঠানে মেতে উঠলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সময়কার ৮৪পরগণা ধীরে ধীরে ৫/৭ টি পরগণা ও কিছু নিষ্কর গ্রামে এসে দাড়ালো। তাঁর সময়েই দিল্লীর প্রসিদ্ধ গায়ক কায়েম খাঁ ও তাঁর তিন সুবিখ্যাত পুত্র কৃষ্ণনগরে এসে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁদের আগমনে কৃষ্ণননগরে সঙ্গীত বিদ্যার চর্চায় এলো জোয়ার। মহারাজের মৃত্যুর পর তার দত্তক পুত্র শ্রীশচন্দ্র জমিদারীর ভার নেন এবং নষ্ট বিষয় পুনরুদ্ধারে মন দেন । কৃষ্ণচন্দ্র ছাড়াও আর যে ব্যাক্তির নাম নদীয়ার রাজপরিবারের ইতিহাসে গৌরবময় স্থান গ্রহণ করেছে তিনি হলেন মহারাজা শ্রীশচন্দ্রর। সে সকল ব্যাক্তির নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ভূমির অধিকারীদের দিয়ে আবেদন করিয়ে তা সরকারকে ফেরত দিতে বাধ্য করেন তিনি। দেশের ও সমাজের নানারকম উন্নতির দিকে লক্ষ্য দেন এবং সেক্ষেত্রে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয় বৈধতা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হন। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার, রাজবাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, কলিকাতাকে অনুকরণ করে কৃষ্ণনগরে মিশনারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা, নিজবাড়িতে একটি অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন - এমন প্রভূত বিষয়ে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র কীর্তি লক্ষনীয় । নিজেদর ও দেশের মঙ্গল সাধননচে সর্বদা রত এই মানুষটিই জীবনের শেষের দিকে নানাবিধ কুসঙহগে পড়ে সুরা ও গানবাজনার আমোদে নিজেকে ডুবিয়ে ফেলে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে পরলোক গমণ করলেন। শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাজা সতীশ চন্দ্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হলেও কোন উৎকৃষ্ট নজির রাখতে পারলেন না, বরং বলা যায় তাঁর ধারাটি ছিল তাঁর পূর্বপুরুষ মহারাজা গিরীশচন্দ্রের মতো। তাঁর মৃত্যুর পর রাজপদে আসীন হন সতীশচন্দ্রের পত্নীর গ্রহণ করা একটি দত্তক পুত্র; যাঁর নাম ক্ষিতীশ চন্দ্র। বিদ্যা, বিদ্ধি ও সৎচরিত্রের অধিকারী হিসাবে মহারাজ ক্ষিতীশ চন্দ্র সুপ্রশংসিত । ধীরে ধীরে নদীয়ার রাজপরিবারের শক্তি যেমন কমছিল তেমনি অপরদিকে, ইংরেজ রাজত্ব স্থাপন ও বাণিজ্য বিস্তারেদর সাথে সাথে বেশ কিছু মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবার ও ধীরের ধীরে কৃষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। এই সমস্ত পরিবারের মধ্যে লাহিড়ীরা উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণনগরে লাহিড়ীরা ঠিক কী ভাবে এসেছিল তার আদি ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে জানা কঠিন হলেও, একথা জানা

যায় যে, এই বংশের পূর্বপুরুষরা বরেন্দ্রভূমি অর্থাৎ রাজশাহী পরগণার কোন জায়গায় বাস করতেন এবং সেখান থেকে বৈবাহিক সূত্রে কৃষ্ণনগরে আসেন। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতের লেখক দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয়ের স্বলিখিত আত্মজীবনচরিত থেকে বিষয়টির সম্পর্কে সম্যক জানা যায়। লাহিড়ী বংশের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কে প্রথমে দেওয়ানবংশে বিয়ে করে নদীয়া জেলাতে এসে বাস করতে শুরু করেচন সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা না গেলেও এটা জানা যায় যে এই বংশের পূর্বপুরুষরা প্রথমে দেওয়ানদের সাথে মাটিয়ারিতে বাস করতেন এবং সেখান ধেকে তাঁরা কৃষ্ণনগরে আসেন । রামতনু লাহিড়ীর বৃদ্ধ পধ্রপিতামহ রামহরি লাহিড়ী কৃষ্ণনগরে এসে স্থায়ীরূপে বাস করেন। রামহরির বড় ছেলে রামকিঙ্কর ছিলেন বেশ বৈষয়িক এবং ছোট ছেলে রামগোবিন্দ ছিললেন গুণবান ও বহু আত্মীয়দের ভারে পীড়িত। রামকিঙ্কর চতাঁর ভাইয়ের চারিত্রিক সারল্যের সুযোগে সুচতুর ভাবে বিষয়সম্পত্তির বিভাজন ঘটালেন। সংসার হোল পৃথক এবং গোবিন্দ বেশ দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করতে লাগলেন। গোবিন্দর পঞ্চপুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় কাশীকান্ত ছিলেন অতিরাশভারি। তাঁর দুটি সংসার ও দুটি পুত্রের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ ঠাকুরদাস ও কণিষ্ঠ রামকৃষ্ণ লাহিড়ী । অতি ধর্মপরায়ন রামকৃষ্ণ লাহীড়ীর আটপুত্র ও দুইকন্যার মধ্যে জ্যষ্ঠপুত্র কেশবচন্দ্র ছিলেন কীর্তিবান ও আদর্শ সন্তান। বাবা-মায়ের প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ়। রামকৃষ্ণ মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র ও সপ্তম সন্তান ছিলেন রামতনু লাহিড়ী। রামতনু লাহিড়ীর আগে কেশবচন্দ্রের পরে রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর তিন পুত্র ওই দুই কন্যা জন্ম নেয়। তাদেদর মধ্যে কেবল কেশবচন্দ্র ও ভবসুন্দরী বেঁচে ছিলেন। রামতনু লাহিড়ীর পরে তাঁর আরো তিনটি ভাই ছিল - রাধাবিলাস, শ্রীপ্রসাদ ও কালীচরন। যশোহরে গিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বরে দুভাইয়ের মৃত্যু হয়। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পরের ভাই বলতে একমাত্র জীবিত ছিলেন কালীজচরণ লাহিড়ী। তিনি মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা করে চিকিৎসক হন। তাঁর ছোটবেলার কথা দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের স্বলিখিত আত্মজীবনচরিতে পাওয়া যায়। মিষ্টি ব্যবহনারে ভরা একজন সহৃদয় চিকিৎসক ছিলেন এই কালীচরণ বাবু, যিনি শুধু রোগীর শরীর স্বাস্থ্যন নয়, এমনকি রোগীর ঘরের চালে খড় আছে কিনা সেদিকেও সমানভাবে লক্ষ্য রাখতেন - এমনটা জনশ্রুতি আছে। দীনবন্ধু মিত্রের সুরধনী কাব্যে মিত্র মহাশয় তাঁর উল্লেখ করেছেন । রাধাবিলাস ও শ্রীবিলাস রামতনু বাবুর মতোই ডেভিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষালাভ করেননি, বরং দেশের অন্যান্য বালকদের ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজের বাসভবনে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করে নিজেই শিক্ষা দেবার কাজে নিজকে নিযুক্ত করলেন। ইংরেজী-সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় পারদর্শী রামতনু লাহিড়ীর অপনরভাই শ্রীপ্রসাদ ছিলেন পরোপকারী মনোভাবাপন্ন মানুষ। সৎ ও ধর্মভীরু এই মানুষটি সময়ে অসময়ে দুখী জনের দুঃখ দেখলেই তাঁর বামহাতে উন্মুক্ত করে দিতেন এবং সে বিষয়ে কাউকে জা নাতে ও চাইতেন না। গুনধাম গোবিন্দ লাহিড়ীর মহাশয়ের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
৪

কাশীকান্ত ছাড়াও আরও যে চারটি পুত্র ছিল। তার মধ্যে প্রথম পুত্র কৃষ্ণকান্ত বিবাহসূত্রে চলে যান পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে। চতুর্থ পুত্র কালীকান্ত ছিলেন অপুত্রক আর তৃতীয় পুত্র গৌরীকান্ত ও পঞ্চমপুত্র শম্ভুকান্ত কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি দৌলিয়া ও বাগানবাড়ী নামের দুটি জায়গায় বাস করতেন। লাহিড়ী বংশের অন্যান্য অনেক গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম হোল এই বংশের ধর্মপ্রবণতা যা গোবিন্দ লাহিড়ীর শাখাস্থ ব্যাক্তিগণের মধ্যে পাওয়া গেছে, এই সারিতে অন্যতম হলেন দ্বারকানাথ লাহিড়ী। দ্বারকনানাথের জন্ম আনুমানিক ১৮২৭ অথবা ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন গোবিন্দ লাহিড়ীর পুত্র শম্ভুকান্তের পুত্রে পুত্র। তাঁর পিতা ছিলেন নীলমনি লাহিড়ী। ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়ে দ্বারকানাথ তাঁর মায়ের সাথে থাকতেন মামার বাড়িতে। পনের বছর পর্যন্ত শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কিছুটা বাঙলা ও ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে তারপর ঘটনাচক্রে বাড়ী ছাড়েন তিনি এবং নিজে উপার্জ্জনক্ষম হয়ে মায়ের দুঃখ ঘোচানোর প্রতিজ্ঞা করেন। কয়েক আনা পয়সা সম্বল করে পনের বছরের বালক গিয়ে পৌঁছায় আগরাতে এবং সেখানে শান্তিপুরের বাসিন্দা এক বাঙালি ভদ্রলোক নিজের বাড়িতে তাঁকে আশ্রয় দেন ; ও তাঁর পড়াশোনার ব্যনবস্থা করে দেন। কয়েক বছরের মধ্যেই দ্বারকানথ ইংরেজীতে পারদর্শী হবে রূপা ও সোনার পদক ও কলেজ পাশ করে ভালো কাজ পেলেন। প্রথম বেতন পেয়েই তিনি তাঁর মা'কে চিঠি লিখলেন ও তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য যাবতীয় পাঠালেন। তাঁর মা আসারপর তিনি মায়ের সেবা ও সংসারধর্মে নিযুক্ত হলেন। বিষয়কর্মে জড়িয়ে থেকেও তাঁর মনে সর্বদা চলত ধর্মনচিন্তা; এমন সময়ে একজন উর্দ্ধতন কর্মচারীর সংস্পর্শে এসে তিনি আকৃষ্ট হলেন খ্রীষ্টধর্মের দিকে ও শুধু তাই নয় সরাসরি দীক্ষীত হলেন সেই ধর্মে। তাঁর এই কাজ মানতে পারেননি তাঁর মা ; এবং তার ফলস্বরূপ যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন তাঁর মায়ের দিক থেকে ঘোর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার বিবরণে সে ছবি মেলে। তবে সবথেকে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, মায়ের তিরষ্কার - দুর্ব্যবহার প্রভৃতি পেয়েও কোনদিন তাঁর ব্যবহার তাঁর মায়ের প্রতি বিরূপো হয়নি। বাবা -মাকে শ্চরদ্ধা ভক্তি করার যে ধর্ম লাহিড়ী ্বংশের মধ্যে বংশধর্ম হিসাবে চলমান ছিল, সেই ধর্মকেই যেন বহন করেছেন দ্বারকাননাথ লাহিড়ী। এই চরিত্রের কারণেই ১৮৫৭'র সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিপাইরা যখন আগরানগর আক্রমণ করে প্রতিটা ইংরেজ ও খ্রীষ্টানদের হত্যা করতে প্রবৃত্ত হয় তখন সেখানকার হিন্দুরাই তাঁকে লুকিয়ে রেখে তাঁর প্রাণ বাঁচায়। এই চরিত্রের কারণেই সুরাপান নিবারণী সভার সুপরিচীত বক্তা রেভারেন্ড ইভান্স যিনি ১৮৫৭ সালে ৮ মাস দ্বারকানাথের সাথে আগ্রার কেল্লায় বন্দী ছিলেন - বলেছিলেন - Meek as a Lamb, humble as a baby, true as steel" - অর্থাৎ তিনি মেষশাবকের মতো নিরীহ, "শিশুর মত বিনয়ী আর ইস্পাতের মত সত্যনিষ্ঠ। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে লাহিড়ী বংশের ব্যাক্তিরা অনেকেই সহৃদয়ে, সদাশয়, সত্যবাদীন ও ধর্মপরায়ন ছিলেন। এই সমস্নত গুণাবলী

রামতণূ লাহিড়ীর ব্যাক্তিচরিত্রেও উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। এখনও এই লাহিড়ী পরিবারের ব্যাক্তিগণ কৃষ্ণনগরে সম্মানের দিক থেকে সবার প্রথমে। এঁদের অনেকেই নানা কাজের উপলক্ষে দেশের নানাস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করছেন কিন্তু যেখানেই গিয়েছেন, প্রায় সকলেই সাধুতা-সত্য নিষ্ঠা এবং পরোপকারের গুণে প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জন করে নিয়েছেন।

টিপ্পনী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম, শৈশব, বাল্যদশা ও কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা।

সময়টা ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্রমাস। জন্ম হোল রামতনু লাহিড়ীর। জন্মস্থান বারুইদুদা গ্রামে তাঁর মামার বাড়ি। পিতা ছিলেন রামকৃষ্ণ লাহিড়ী আর মাতা বারুইদুদা গ্রামের বাসিন্দা, রাজবাড়ির দেওয়ান, রাধকান্ত রায়ের কন্যা জগদ্ধাত্রী দেবী। জগদ্ধাতী যে রায়বংশের মেয়ে তাঁরা কৃষ্ণনগরে দেওয়ান চক্রবর্তীর বংশ নামে বিখ্যাত। এঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন ষষ্ঠীদাস চক্রবর্তী, যিনি বারেন্দ্রভূমি থেকে খাঁ-ভাদুড়ি-সান্যাল-লাহিড়ী-মৈত্রেয় প্রভৃতি ছ'ঘর নপ্রসিদ্ধ কুলীনকে নদীয়ায় এসে স্থাপণ করেছিলেন বলে, ছয়ঘরের প্রতিষ্ঠা কর্তা নামে খ্যাত ছিলেন। সেই থেকে এই দেওয়ান বংশের অনেকেই রাজবাড়ীর দেওয়ানের কাজ করে আসছেন। তাঁর ছিলেন ধর্মভীরু ও বিশ্বস্ত, সেকারনেই কখনই রাজাদের ক্ষতিসাধন করে নিজেরা রাজ্যসম্পদের অধিকারী হননি, বরং রাজাদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে সবসময় তৎপর থেকেছেন। এই বংশের পূর্বকাহিনী থেকে জানা যায় যে তাঁরা বংশপরম্পরায় যা উপার্জন করেছেন তা দিয়ে খানা খোঁড়া, মন্দির তৈরী, দরিদ্রব্রাহ্মণকে দান - এসমস্ত কাজই করেছেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মশায়ের আত্মজীবনচরিতে তাঁর পরিবারের এমনই এক সদাশয় ব্যাক্তি, শ্রী তারাকান্ত রায় মহাশয়ের নানা ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়, যা পাঠককে বিস্মিত করে। রামতনু লাহিড়ীর মাতা এমনই বংশে জন্মেছেন ও বড় হয়েছেদন, সেকারণে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মধ্যে পারিবারিক গূণগুলি সঞ্চারিত হবেছিল। মহারাজ শ্রী শিবচন্দ্রের স্নেহে ও বাবার আদরে বেড়ে ওঠা জগদ্ধাত্রী ছিলেন রূপে-গুণে অনন্য। তাঁর বিয়ের পর তিনি চাইলে নিজের বাড়িতেই পরম বৈভবেই থাকতে পারতেন কেননা সেসময়ে বাড়ীর জামাইরাও অনেক সময় শ্বশুরবাড়িতে বাস করত কিন্তু জগদ্বাত্রী স্বামীর আত্মসম্মানকে মূল্যবান মনে করে নিজের বাড়ি ছেড়ে স্বামীর সাথে কদমতলাতে শশ্বুরবাড়িতে এসে নিতান্ত অস্বচ্ছলতার মধ্যেই মানিয়ে গুছিয়ে থাকতে লাগলেন। লাহিড়ী মশায়ের জন্মের সময় তাঁর পিতা রামকৃষ্ণ সামান্য পুরুষানুক্রমিক বিষয়ের আয় ও নিজে সে সময়ে প্রসিদ্ধ লালাবাবুদের ম্যানেজারি করে যা পেতেন তার সাহায্যেই বেশ কষ্টেই তাঁদের কালাতিপাত হোত। ধর্মভীরু রামকৃষ্ণ উপরি আয়ের দিকে কোনদিনই নজর না দিয়ে বরং প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ধর্ম আলোচনাতে

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
10

দিন যাপন করতেন। পাড়াতে দেবীপ্রসাদ চৌধুরী নামের এক ভদ্র গৃহস্থের বাড়ি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি যেতেন এবং নানাধরণের বিষয়কাজের সূত্রে সেখানে আচরো বহুব্যাক্তি উপস্থিত হোত, এই সমস্ত সজ্জন মানুষদের সাথে রামকৃষ্ণ সুখে সময় কাটাতেন। সেখানে যাওয়ার সময় তিনি কখনো কেশবচন্দ্রকে এবং পরে রামতনুকে সাথে নিয়ে যেতেন। দেবী চৌধুরী মশায়ের বাড়িতে এক ইংরেজী জানা ব্যাক্তি থাকায় শিশুদের তাঁর কাছে ইংরেজী শিখতে দিয়ে বৃদ্ধেরা মগ্ন হোত ধর্মালোচনায়। রামকৃষ্ণ লাহিড়ী নিজে ছিলেন সদাশয় ও সাধু ব্যক্তি। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশবচন্দ্র ছোটবেলা থেকেই গুরুজনদের প্রতি ভক্তি ও বাধ্যতা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের পরিচয় দিতে লাগলেন। তাঁর গুরুজনদের প্রতি ভক্তির কাহিনী ছিল সুবিদিত। রামতনু লাহিড়ীর তাঁর এই বড়দাদাটির উপর শ্রদ্ধাভক্তি ছিল খুবই। কেশবচন্দ্র কলকাতার কাছেই আলিপুরের জজ আদালতে কেরানীগিরি ও এছাড়াও অনেক দেশীয় ও বিদেশী লোকের মামলা মোকদ্দমাতে সাহায্য করে যে যৎসামান্য উপার্জন করতে তার সাহায্যেই নিজের খরচ চালানো, কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে সাহায্য ও কলকাতায় ভাইদের পড়াশোনার জন্য ব্যায় করতেন। এভাবেই কায়ক্লেশে দিনযাপন হোত লাহিড়ী পরিবারের। এমনই এক পরিবারে ছয়টি সন্তানের পর, বিশেষত : কয়েকটি মারা যাওয়ার পর সপ্তম সন্তান হিসাবে জন্মনিলেন রামতনু লাহিড়ী। বারুইদুদা থেকে কৃষ্ণনগরে সকলের মঙ্গলকামনা, গ্রামবাসিনীদের মঙ্গলময় শাঁখের মধ্যে দিয়ে সূর্যালোক দেখলেন শ্রীরাধারান্ত রায়ের দৌহিত্র - রামতনু। আঁতুড় থেকে আটকাই সবই বিধিমেনে পালিত হোল এবং মায়ের স্নেহ - ভালোবাসায় সকলের চোখের আড়ালে বড় হতে থাকলেন তিনি। পাঁচবছর পার হতেই তাঁর হাতে খড়ি করে পড়াশোনা শেখানো শুরু হোল। দেবী চৌধুরী মশায়ের বাড়ীতে যে পাঠশালা ছিল সেখানেই শিশু রামতনুর পড়াশোনা আরম্ভ হয়। সে সময় কোনও ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীর বাইরের চন্ডীমন্ডপে পাঠশালা বসত, সাধারণ ভাবে বর্ধমান জেলা থেকে কায়স্থ জাতীয় গুরুরা আসতেন এবং বেত হাতে মাঝে একটি খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকতেন। বালকেরা প্রথমে মাটিতে খড়ি দিয়ে বর্ণপরিচয় করত এবং তারপরে তালপাতায় স্বরবর্ণ, ব্যাঞ্জনবর্ণ, যুক্তবর্ন প্রভৃতি লিখত। গুরুমশাইয়ের কোন নির্দিষ্ট বেতন ছিলনা, প্রতি গৃহস্থ নিজের সন্তানের পাঠশালায় পাঠাবার সময় গুরুমশায়ের সাথে আলাদা ব্যবস্থা করতেন এবং সেই ব্যবস্থার ফল-স্বরূপই মাসে সামান্য ১০/১২ টাকা আয় ও যাত্রা-মহোৎসব-পার্বণ বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে তাঁদের কিছু উপরিও জুটত। এই দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সকল বালকরা যত বেশী খুশি করতে পারত তাদের ওপর বেত্রাঘাত কম পড়তো, নতুবা শুধু পিঠে বা হাতে বেত পড়া নয়; নাড়ুগোপাল, ত্রিভঙ্গ, চ্যাংদোলা - এমন নানারকমের শাস্তির প্রণালির মাধ্যমে গুরুমশাইরা ছাত্রদের উপর ‘শিক্ষাদান’ করতেন। ১৮৩৪ সালে লর্ডউইলিয়াম বেন্টিক, মিষ্টার উইলিয়াম এডামকে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনার্থে নিয়োগ করলে তিনি য এ তথ্য পেশ করেন, তাতে

পাঠশালায় প্রাব ১৪ প্রকারের সাজা দেবার প্রণালীর উল্লেখ করেছিলেন। পাঠশালায় শাস্তি সম্পর্কিত ঘটনার বিবরণ দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের লেখায় মেলে। লাহিড়ী মশায়ের দৈনিক দিনলিপিতেও পাঠশালায় মারও সেই ভয়ে তাঁর পাঠশালা পালানোর বিবরণ মেলে । বালক রামতনুর ঘোড়ার চড়ার ইচ্ছা ছিল ভীষণ। যখনই পাশের গ্রাম বা কোন জনপদ থেকে কখনো কোন লোক কৃষ্ণনগরে কোন কাজে আসত বা কলকাতার অনুকরণে নতুন ধরণের কিছু ভাড়াটে গাড়ি যখন কৃষ্ণনগর আসত এবং ঘোড়াগুলো রাজপথের পাশে বা মাঠে চড়ে বেড়াত, বালক রামতনু বন্ধুবান্ধবদের সাথে সেই সব ঘোড়া ধরে চড়তেন। এমনকি তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন যখন ঘোড়া কেনার জন্য অন্য একজনের টাকা চুরি করেছিল তখনও বালক রামতনু ছিলেন উৎসাহদাতাদের মধ্যে একজন। শুধু ঘোড়া চড়ে মজা করায় নয় কৃষ্ণনগরের চারিদিকে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশেদর মধ্যে বেড়ে ওঠা রামতনুর মনে এই প্রকৃতি ও তার সৌন্দর্য এক চিরস্থায়ী গভীর ছাপ ফেলেছিল। বালক রামতনু এভাবে বড় হয়ে উঠতে থাকলো ও তাঁর বাবা-মা চিন্তিত ও শঙ্কিত ছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে। কারণ সমসময়ে কৃষ্ণনগরের সমাজে ভরে যাচ্ছিল দুর্নীতিতে, সমাজে অভাব দেখা দিচ্ছিল সদ্‌গুণের । যখন অধিকৃত বাঙালায় সাহসী-সত্যনিষ্ঠ-সরলা-অতিথিবৎসল -এমন গুণসম্পন্ন হিন্দুদের অভাব দেখা দিল। মুসলমান রাজাদের দৃষ্টান্তে দেশে কিছু কুরীতির প্রচলন হতে থাকে, যেমন - ধনীদের মধ্যে স্ত্রীজাতির অয়রোধ ও বহুবিবাহ প্রথা ই, পুরুষদেদর মধ্যে দুশ্চরিত্রতা, তোষামোদজীবিতা-আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনী প্রভৃতি। জাল-জুয়াচুরি, আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য, প্রবঞ্চনা, উৎকোচের সাহায্যে ধনলাভ প্রভৃতি সমাজের মধ্যে ছেয়ে গেল। আর, কৃষ্ণনগর ও এই সমস্ত বিষয়ের স্পর্শ থেকে দূরে থাকতে পারেনি। মহারাজ গিরীশ চন্দ্রের অধিকার কালে রামতনু লাহিড়ীর জন্ম । সেই সময় কৃষ্ণনগরের মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজ ছিল তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত - প্রথম, কেন্দ্রীভূত রাজপরিবার ও তাঁদের নিজেদের সম্পর্কীয়, সংসৃষ্ট ও আশ্রিত ব্যাক্তিরা; দ্বিতীয়ত - স্বাধীনবৃত্ত সম্পন্ন পরিবারবর্গ এবং তৃতীয়ত - ইংরেজদের নব প্রতিষ্ঠিত কাছারীর উকিল - মোক্তার-আমলা প্রভৃতি। রাজা গিরীশচন্দ্রের স্বভাবের দূর্বলতার সুযোগে সমগ্র রাজবাড়িরত চারপাশে ভিড় জমিয়েছিল স্বার্থপর ও হীনচরিত্রের লোকজন। মহাজরাজ শ্রীশচন্দ্র অনেক ভালো কাজ করলেও তয়াঁর কিছু পাপ কাজ সমসময়ের পঙ্কিলতার পরিবেশকে আরো ভরিয়ে তুলেছিল । দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের স্বলিখিত জীবনচরিতে পাওয়া বিবরণ থেকে রাজার আমোদ-প্রমোদ-সুরাপান-গায়িকা দল থেকে বালিকা দাসী ক্রয়-দাসী শ্রনীস্থ বালিকা সুরাপান করিয়ে তার সাথে হাসি পরিহাস প্রভৃতির চিত্র মেলে। এমনকি তাঁর বর্ণনায় প্রায় সকল আমলা-উকীল বা মোক্তারের উপপত্নী রাখা, গণিকালয় স্থাপন, দেবদাসী প্রথা প্রভৃতি সমাজের অন্ধকার দিকগুলি চোখে পড়ে। অর্থাৎ দেশের সামাজিক অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক ও সুস্থ ছিল না। এমতাবস্থায়, রামতনুর মাতা -

টিপ্পনী

পিতা তাঁকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে রাখতেন এবং তাকে স্থানান্তরিত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কেশবচন্দ্র সে সময় আলিপুরে কাজ করতেন এবং কালীঘাটের সন্নিহিত চেতলায় বাসা করে থাকতেন। এবং অবশেষে, ১৮২৬ সালে, বারো বছর বয়সে, শ্রীরামতনু লাহিড়ী কলকাতা এলেন।

টিপ্পনী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : লাহিড়ি মহাশয়ের কলিকাতা আগমন ও বিদ্যারম্ভ। কলিকাতার তদান্তীন অবস্থা ও ইহার প্রধান ব্যাক্তিগণ।

১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে রামতনু লাহিড়ী এলেন কলকাতার চেতলায়, তাঁর দাদার বাড়িতে। বড়ভাই কেশবচন্দ্র তখন চিন্তিত ভাইয়ের শিক্ষার বন্দোবস্ত কীভাবে হবে। এই ভাবনায় করেন চেতলার কাছে কোন ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না। অনুমান করা যায়, কলকাতায় আসার আগেই সে সময়ের চলতি রীতি অনুসারে রামতনু কিছুদিন পারসী ভাষার পাঠ নিয়েছিলেন আর অল্প ইংরেজী পড়তে ও লিখতে শিখে এসেছিলেন; কলকাতায় আসার পরে পারসী ও আরবীতে পারদর্শী কেশবচন্দ্র ভাইকে সে বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করতে লাগলেন ও খাতা বেঁধে দিয়ে নিজেই মাষ্টামশায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ছোটভাইকে ইংরেজী লেখাতে লাগলেন যা যতন ও পচরিশ্রম করে ভাইকে শিক্ষা দেওয়ার কাজে নিজেকে নিয়োগ করলেও পুরো বিষয়টা কেশবচন্দ্রের ঠিক মনেরমতো হচ্ছিল না। দিনের বেশীর ভাগ সময়টা তাঁকে তার কাজের জায়গায় থাকতে হোত এবং তখন বালক রামতনু বাসায় ভৃত্য বা দাসীর কাছেই থাকতেন - এই বিষয়টাই ছিল তাঁর চিন্তার বিষয়। কারণ, চেতলা ও তার কাছাকাছি এলাকার সামাজিক নীতিনৈতিকতার অবস্থা ছিলন জঘন্য, বহু অস্থায়ী গতিশীল নারীপুরুষ এইখানে সবসময় যাচ্ছে-আসছে; স্বার্থপর ও ধর্মজ্ঞান শূণ্য মানুষের ভীড় ছিল এখানে বেশী, এরই মাঝে ঘরে ঘরে গণিকাবৃত্তি ও চাল রপ্তানীর প্রধান স্থান এই চেতলায় সামাজিক জলবায়ু কোনভাবেই বালক রামতনুর উপযুক্ত ছিল না। সেকারণেই ভাইকে এখানে রেখে স্থির থাকতে পারতেন না কেশবচন্দ্র। অবশেষে, একদিন সুযোগ এল - কালীশঙ্কর মৈত্র নামে নদীয়া জেলার বাসিন্দা এক ভদ্রলোক কাজ পাওয়ার বাসনায় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিল্যালঙ্কার ডেভিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পন্ডিতী করতেন ও হেয়ারে প্রিয় পাত্র ছিলেন, তো কেশবচন্দ্র কালীশঙ্করকে কাজ পাওয়ার বিষয়ে সহায়তা করবেন এমন কথা দিয়ে এই সহায়তার প্রতিদানে কালীশঙ্করকে গৌরমোহনেদর সহায়তায় রামতনুকে হেয়ারের স্কুলে ভর্তির সহায়তা চাইলেন। গৌরমোহন এই বিষয়ে সাহায্য করতে রাজি হলেন। বালক রামতনুকে আনানো হোল চেতলা থেকে গ্র সাহেবের গঙ্গাতীরবর্তী বাড়িতে হেয়ারের সাথে দেখা করানোর জন্য। গৌরমোহন হেয়ারেদর প্রিয়পাত্র হলনেও স্কুলে ভর্তির পথটা মসৃণ ছিলনা একেবারেই। 'ফ্রী বালকের আসন' পূর্ণ হবে যাওয়ায় হেয়ার সাহেব গৌরমোহন

বিদ্যালঙ্কারের অনুরোধ রাখতে পারলেন না। বিদ্যালঙ্কার যেহেতু হেয়ারের কোমল প্রকৃতির কথা জানতেন তাই তিনি লাহিড়ী মশাইকে বলে দিলেন "হেয়ারের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন ছুটিতে হইবে।" বালক রামতনু সে কাজেই করতে লাগলেন। হাতি বাগানে বিদ্যালঙ্কারেদর বাসা থেকে কোনদিন সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া করে, কোনদিন বা অনাহারে হেয়ার বাড়ি থেকে বেরোনোর আগেই গ্রে সাহেবের বাড়ীর সামনে গিয়ে হাজির হতেন; ও তার পাল্কীর সাথে ছুটতে আরম্ভ করতেন। হেয়ারের পাল্কী যেখানে যেখানে যেত তিনি যেতেন, অপেক্ষা করতেন। এইভাবে দুমাস কেটে গেলে হেয়ার বুঝলেন বালক নাছোড়বান্দা এবং পড়াশোনার বিষয়েন এঁনার আগ্রহ ভীষণ, তখন তিনি রামতনুকে ফ্রী বালকের দলে নিতে রাজী হলেন। রামতনু ভর্তি হলেন স্কুল সোসাইটির স্থাপিত স্কুলে ফ্রী বালক রূপে। ঐ স্কুল পরে কলুতোলা ব্রাঞ্চস্কুল ও তারপরে হেয়ার স্কুল নামে খ্যাত হয়েছে।

ডেভিড হেয়ারের জন্ম ১৭৭৫ ক্রীষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডে। ১৮০০ সালে ঘড়িওয়ালার কাজ নিয়ে তিনি এদেশে আসেন এবং কাজের সূত্রে এদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। হেয়ার নিজে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না ঠিকই কিন্তু এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের প্রয়োজীয়তা অনুভব করেছিলেন। ১৮১৪ সালে রামমোহন কলকাতায় অবস্থান করতে শুরু করলে হেয়ারের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ১৮১৬ তে হেয়ার নিজেই উদ্যোগ নিয়ে একদিন রামমোহন রায়ের আত্মীয়সভার এক অধিবেশনে উপস্থিত হলেন ও সভাশেষে ইংরেজী শিক্ষা চালু করার বিষয়ে অনেক আলোচনা করলেন। আলোচনা শেষে ঠিক হোল যে, এদেশের বালকদের শিক্ষা দেবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। আত্মীয় সভার অন্যতম সদস্য এই প্রস্তাবন তখনকার সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ঈষ্টের (Sir Hyde East) কাছে পেশ করলে তাঁর উৎসাহ ও যত্নে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুকলেজ। এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে হেয়ার তাঁর কমিটির একজন সদস্য নিযুক্ত হন এবং ডাক্তার এইচ. এইচ. উইলসনের (H.H. wilson) অধীনে থেকে তাঁর পরামর্শ মতো অবিশ্রান্ত মনোযোগের সাথে স্কুলটির উন্নতির কাজে ব্রতী হলেন। ১৮১৭ সালের ২০ শে জানুয়ারি, খোলা হল হিন্দুকলেজ। সে বছরই হেয়ারের উদ্যোগে ও সমকালীন ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকদের সাহায্যে স্থাপন করা হোল। স্কুলবুক সোসাইটি নামে একটি সভা। এই সভার সদস্যরা ছাত্রদের পড়ার উপযোগী ইংরেজী ও বাঙলা নানা ধরনের বই চালু ও ছাপার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। রামমোহন রায় তাঁর বন্ধু হেয়ারকে সাহায্য করে নতুন ধরণের স্কুলপাঠ্য বইপত্র চালু করতে শুরু করলেন। ১৮১৮-র ১লা সেপ্টেম্বর হেয়ারের উদ্যোগে স্থাপিত হোল আরেকটি সভা নাম তার "স্কুল সোসাইটি"। হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব এই সভার সম্পাদকেদর পদ গ্রহণ করলেন ও কলকাতার নানা স্থানে নতুন প্রণালীতে ইংরেজী ও বাঙলা শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করা

টিপ্পনী

ছিল এই সোসাইটির উদ্দেশ্য। এদেশীয় বালকদের শিক্ষাদানের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন এবং সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত নানা জায়গার নানা বিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের অবস্থা ও তাদেদর শিক্ষার অগ্রগতি বিষয়ে সতর্ক লক্ষ্য রাখতেন। লাহিড়ী মশাই যেদিন বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন সেদিন আরো একজন ব্যাক্তি তাঁর সঙ্গে একই শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন, তিনি হলে রাজা দিগম্বর মিত্র। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, ইনি পরে ডেপুটি ম্যজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টররূপে খ্যাত হয়েছিলেন। প্রথমদিকে কেশবচন্দ্রেদর অনুরোধ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার বালক রামতনুকে নিজের বাসায় আশহরয় দেন ও রামতনু সেখান থেকে স্কুলে পড়তে থাকে কিন্তু বিদ্যালঙ্কারের বাড়ীর পরিবেশ বালকের বসবাসেদর অনুপযুক্ত হওয়ায় কেশবচন্দ্র ভাইকে তাঁদের বাবার মামাতো ভাই রামকান্ত খাঁ মশায়ের বাড়ীতে শ্যামপুকুরে রেখে আসলেন। এবাড়ীতে বালক রামতনু স্নেহে ও যত্নে বড় হতে লাগলেন। এই বাড়ীর কাছাকাছি তাঁর সহপাঠী দিগম্বর মিত্র বাস করতেন, রামতনু তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার সূত্রে দিগম্বরের মায়ের কাছ থেকে বিশেষ স্নেহ পেতে লাগলেন। সে সময়টাই ছিল এমন। বন্ধুদের মায়েরা অত্যন্ত স্নেহ ও সুরক্ষায় ভরিয়ে রাখত আপন পুত্রে সহপাঠীদের মন ও জীবন। পন্ডিতবর বিদ্যাসাগর মশায়ের ছোটবেলার সাথী গোপালচন্দ্র ঘোষের মা রাইমনি ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে এমনই বিশেষ জায়গা অধিকার করে ছিলেন। মা-বোনেদের স্নেহ ছেড়ে কলকাতায় আসা রামতনুর জীবনে কোন পাপ প্রলোনভননেকর অন্ধকাচর ছায়া পড়তে পারেনি রামকান্ত খাঁ মশায়ের স্ত্রী ও দিগম্বর মিত্রেদর মায়ের স্নেহের রক্ষাকবচের গুণে। তখনকার কলকাতায় মফস্বল থেকে আসা বেশীর ভাগ ব্যাক্তিরাই এক বছরের মধ্যে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তো। অজীর্ণ রোগে শরীর কাহিল হয়ে পড়তো এবং ধীরে ধীরে সেই অসুখ আরো নানারকম অসুস্থতাকে টেকে আনত। কলকাতায় তখন জলের কল ছিলনা, প্রতিটি বাড়ীতে একএকটি কূপ ও প্রতিটা গ্রামে দু-চারটি পুকুর ছিল। এসব পচা দুর্গন্ধময় জলেভরা পুকুরে কলকাতা ছিল পরিপূর্ণ এবং এই পুকুরগুলিই ছিল জ্বরের উৎস। সরকার জায়গায় জায়গায় দীঘি খুঁড়ে দিয়েছিল এবং সেই দীঘির জল পানের জন্য ব্যবহার করা হোত। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল লালদীঘি। রাজপথের পাশে এক একটা চওড়া নর্দমা ছিল, যার আয়তন ছিল আট-দশ হাতের বেশী, নর্দমা গুলি কাদা আর পাঁকে ভরে থাকত আর তার ফলে বাতাস থাকত দুর্গন্ধে ভরা। এরই সাথে ছিল মাছি ও মশার উপদ্রব - এই সময়েই বালক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কলকাতায় এসে বলেছিলেন - "রেতে মশা দিনে মাছি / দুই নিয়ে কলকেতায় আছি। তখন মিথ্যে, প্রবঞ্চনা, ঘুষ, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করে ধনী হওয়াকে মানুষ লজ্জার বিষয় মনে করতেন বরং এমন লোকদের কৌশল ও বুদ্ধি প্রশংসা পেত। ধনী গৃহস্থরা খোলাখুলি বারঙ্গনাদের সাথে আমোদ প্রমোদে লজ্জা পেত না। তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভারত থেকে এক ধরনের গায়িকা ও নর্ত্তকীরা

তখন শহরে আসত, তাদের বলা হত 'বাঈজী'। নিজের বাড়িতে বাইঝীদের সমাদর করে ডেকে আনা ও তাঁদের নাচ দেখা ধনীদের কাছে ছিল প্রধান গৌরবের বিষয়। কোন ধনী ব্যাক্তি কোন প্রসিদ্ধ বাঈজীর জন্য কত হাজার টাকা ব্যায় করেছেন সেই খবর ভদ্রলোকদের বাড়ির বৈঠকখানায় ঘুরত এবং কেউই এ খবরকে দোষের মনে করতো না। সে সময়ে শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদের বড়ীতে 'বাবু' নামে এক শ্রেনীর মানুষ দেখা দিল। তারা পারসী ও অল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে পুরানো ধর্মবিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভোগ সুখে দিন কাটাতো। এই সময়ে ও এরই কিছু সময়পরে গাঁজা খাওয়া বিষয়টা শহরের মথ্যে অতিরিক্ত আরে বেড়ে গেল, নানা স্থানে বড় বড় গাঁজার ঠেক বসত। বাগবাজার, বটতলা, বৌবাজার ইত্যাদি আনা জায়গায় এমনই গাঁজার আড্ডা ছিল। বৌবাজারের দলকে বলা হত পক্ষীর ফল। কবি, পাঁচালি ও বুলবুলির লড়াইয়ে মেতে উঠেছিল শহর। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে থেকে হরু ঠাকুর ও তার চ্যালা ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালরা শহরে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। সে সময়কার কবিওয়ালদের মধ্যে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির নাম উল্লেখযোগ্য। সমকালীণ সময়ে পাঁচালিওয়ালাদের মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ন নস্কর প্রভৃতি কয়েকজন ছিলেন বিশেষ প্রসিদ্ধ। তবে এঁদের মধ্যে সেরা ছিলেন দাশরথি রায়। বুলবুলির লড়াই দেখা ও ঘুড়ি ওড়ান সে সময়েদর শহরে ভদ্রলোকদের একটি মহা আনন্দের বিষয় ছিল। সেই কৌতুক দেখার জন্য লোক ভেঙে পড়ত। শহরেদর লোকেদের ধর্মভাব ছিল বিচিত্র-বেদের নানারকম বিষয়, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান এসব কোনকিছুরই সমাদর এখানে ছিল না। কিন্তু লোক মেতে থাকত দুর্গাপুজোয় বলিদান - নন্দউৎসবের কীর্ত্তন - দোলযাত্রার আবীর রথযাত্রার গোল; এসমস্ত বিষয় নিয়ে। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, তীর্থ ভ্রমণ, অনশনের সাহায্যে বড় বড় পাপ থেকে রেহাই মেলে ও পবিত্রতা লাভ করে পুণ্যার্জন করা যায় এসমস্ত কথাই মানুষ জন বিশ্বাস করত। নিজের হাতে নিরামিষ খাবার রান্না করে আহার পবিত্র কাজ বলে মনে করা হোত। কলকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণরা নিজেদের গৌরব আর আধিপত্য রক্ষা করার ব্যাপারে ছিলেন বীশেষ যত্নশীল। তাঁরা কাজের জায়গা থেকে ফিরে এসে স্নান করে বিজাতীয় ছোঁয়াছুঁয়ি দোষ থেকে নিজেদের মুক্ত করতেন ও সন্ধ্যেবেলার পুজো সেরে দিনের ৮ ভাগে খেতে বসতেন। এর ফলেই তাঁদের যশ বাড়তো। আর যে সমস্ত ব্যাক্তিরা এই কষ্ট করতে পারতেন না তাঁরা কাজের জায়গায় যাবার আগেই সন্ধ্যে - পুজো হোম এসবই শেষ করতেন; আর নৈবদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদের দান করতেন, এতেই তাঁদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হোত। তখনকার ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে বেশী মনোযোগ দিতেন অথচ তাঁরাই প্রায় জ্ঞানহীন ছিলেন বেদের বিষয়ে। আদিশাস্ত্র বেদেদর প্রতিছিল চরম অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা। একদিকে যখন শহরের এমন অবস্থা তখন অন্যদিকে ঘোর আন্দোলন কেঁপে উঠেছিল শহর। সেই আন্দোলনের প্রথম কারণ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

রামমোহন রায়ের উত্থাপিত ধর্মান্দোলন । ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খানাকুলন কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম। পিতা রামকান্ত রায় ছোটবেলায় তাঁকে নিজের বাড়ীতে সামান্য কিছু শিক্ষা দিয়ে প্রায় ৯/১০ বছর বয়সে পাটনায় পাঠিয়ে দেন; পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করার জন্য। বয়স বাড়ার সাথে সাথে পারসী ও আরবীতে সুশিক্ষিত রামমোহনের মনে হিন্দুধর্মের প্রচলিত পৌত্তলিকতার প্রতি প্রশ্ন ওঠে এবং এই বিষয়ে জনশ্রুতি আছে যে বাবার সাথে মনান্তর ঘটলে তিনি বাড়ী ছেড়ে সন্ন্যাসী -ফকিরদের সঙ্গে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। নানাজায়গায় ঘুরতে ঘুরতে তিব্বত হয়ে স্বদেশে ফিরে তিনি কাশীধামে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা শেখাব নিজেকে যুক্ত করেন। এসময় তাঁর বাবার সাথে আবার সম্মিলন ঘটলে বাড়ীতে ফেরেন ও বাবার আদেশে বাইশ বছর বয়সে নিজের চেষ্টায় ইংরেজী ভাষা শিখতে শুরু করেন। ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি নীবে রামগড়, ভাগলপুর প্রভৃতি জায়গায় কিছুদিন কাজ করে অবশেষে রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেবের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮০৩ এ পিতা রমাকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর তিনি মুর্শিদাবাদে যান এবং সেখানে পারসী ভাষায় লিখিত তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বই 'তহতুনা মোহদ্দীন' কে ছাপানো ও প্রচার করেন । প-রবর্তিতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় এসে পাকাপাকি ভাবে বাস করতে শুরু করেন। কলকাতায় আসার আগে রঙ্গপুরত্ত্ অনভান্য জায়গায় তিনি যে একেশ্বরবাদের প্রচার করেছিলেন তাঁর কলকাতা আসার আগেই তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলনের ঢেউ সেখানে এসে পৌঁছেছিল । তিনি কলকাতা আসার সাথে সাথেই অগ্রসর, উদার, চিন্তাসিল ও সংস্কার প্রয়াসী কিছু ব্যাক্তি তাঁর সাথে যুক্ত হলেন, এছাড়াও কিছু বিষয়ী লোক তাঁকে উঁচুদরের ক্ষমতাবান মানুষ মনে করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উচ্ছেতে তাঁর সাথে জুড়ে গেলেন। তিনি সকলকে নিয়ে ১৮১৫ তে স্থাপন করলেন 'আত্মীয় সভা', সেখানে বেদান্ত ধর্মের ব্যাখ্যা ও বিচার বিষয়ে আলোচনা হোত। এমনই এক সময় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রাদেশীয় পন্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বাসী ব্রাহ্মণ বিহারীলাল চৌবের বাড়িতে আয়োজিত মহাসভায় সভাভর্তি লোকজনের সামনে বাগযুদ্ধে পরাস্ত করে রামমোহন রায় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮১৫ থেকে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ; এই পাঁচবছরের মধ্যে তিনি বইয়ের পর বই প্রকাশ করতে থাকলেন -

বেদান্তদর্শনের অনুবাদ - ১৮১৫

বেদান্তসার এবং কেন ও ঈশোপনিষদের অনুবাদ - ১৮১৬

কঠ, মুন্ডক ও মান্ডুক্যোপনিষদের অনুবাদ এবং হিন্দু একেশ্বরবাদ সমন্ধীয় গ্রন্থ ইংরাজী ও বাঙ্গলাতে - ১৮১৭।

সতীদাহ সম্বন্ধীয় বিচাচর পুস্তক, বৈষ্ণব গোস্বামীর সহিত বিচার পুস্তক গায়ত্রীর

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

16

ব্যখ্যা পুস্তক এবং সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ - ১৮১৮।

সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তক, মুন্ডক ও কঠোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ - ১৮১৯।

রামমোহনের ধর্ম বিচার প্রথমে হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তিনি বেদ - দর্শন অণুবাদ ও ছাপিয়ে স্বদেশীদের মধ্যে বিতরণ করছিলেন। ফলত - তাঁর প্রতি দেশবাসীর বিদ্বেষ চরমে ওঠে, যার ফলস্বরূপ হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর সঙ্গে কেউ একই কমিটিতে কাজ করতে না চাওয়ায় তাঁকে কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। রামমোহন নিজের ধর্ম অণুমোদিত একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। ১৮২০ তে তিনি যীশুর উপদেশাবলী নামে একটা বই প্রকাশ করেন এবং ১৮২১ এ রামমোহনের সংশ্রয়ে এসে ব্যাপিষ্ট সম্প্রদায়কভুক্ত মিশনারী মিষ্টার উইলিয়াম আজম খ্রীষ্টীয় ত্রিশ্বরবাদ ছেড়ে দিয়ে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করেন। এই ইয়ে মিশনারীদের সাথে তাঁর মতভেদ তৈরী হয়। হিন্দু - খ্রিষ্টান উভয় পক্ষই রামমোহনের বিরুদ্ধে চলে যায়। এছাড়াও 'কমিটি অব' পাবলিক ইনস্ট্রকশন তখনকার প্রাচ্য শিক্ষা বিস্তারে পক্ষপাতীদের পরামর্শে কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি ঐ কাজের প্রতিবাদ করে সে সময়ের গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট বাহাদুরকে চিঠি লেখেন এবং সে চিঠিতে এদেসে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন। এই বিষয়টি নিয়ে সমগ্র বঙ্গসমাজ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল প্রাচ্যের পক্ষে এবং অপরদল দাঁড়ায় প্রতীদ্যের পক্ষে। ১৮২৬ এ এই দুই দলের বিবাদে কলকাতার সমাজ টালমাটাল হতে থাকে। তখন অপর আরেক কারণে দেশের লোকের মন উত্তেজিত ছিল। ১৮২৫ - এ কলকাতার কাছে একটা হত্যাকান্ড ঘটে, তাতে হিন্দু বিধবাদের সহমরণ প্রথার বিষয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু হয় এবং সেই সময়েই ঐ প্রথা রদ না হলেও কিছু নিয়ম স্থাপোন করা হয়। রামমোহনের দল সতীদাহ নিবারের জন্য আন্দোলন করতে থাকে। তাঁর 'কৌমুদী' তে সতীদাহের বিপক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ হতে থাকে। সেই সময় কলকাতার সমাজ দুই দলে ভাগ হয়েছিল। রামমোহনের দলে ছিলেন কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ এবং প্রাচীন হিন্দুদলে ছিলেন রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, রামকমল সেন প্রমুখরা।

টিপ্পনী

দ্বারকানাথ ঠাকুর :

জয়রাম ঠাকুরের বংশজাত দ্বারকানাথের জন্ম ১৭৯৪ সালে। বাল্যকালে সর্ব্বরণ নামে এক ফিরিঙ্গীর স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। পারসীও আরবী ভাষায় ছিল তাঁর দক্ষতা। কিছুদিন নীল ও রেশমের রপ্তানীর কাজ করে অবশেষে নিমকের এজেন্ট প্লাউডেন সাহেবের দেওয়ানীর পদ পেলে বিশেষ ধনবান হয়ে ওঠেন। কার টেগোর অ্যান্ড কোং নামের একটি কোম্পানি স্থাপন করে স্বাধীন বনিক হিসাবে কাজ শুরু করে। সহৃদয়তা ও

বদান্যতায় তিনি ছিলেন সেরা। তাঁর উপার্জ্জন ও দান দুই - ই শক্তিছিল অদ্ভুত। ১৮২৬ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর শহরের সভ্রান্ত ধনীদের মধ্যে ছিলেন অগ্রগণ্য ও রামমোহন রায়ের অতিশয় কাছের মানুষ।

টিপ্পনী

রাধাকান্ত দেব :

ইনি শোভাবাজার রাজবাড়ী গোপীমোহন দেবের পুত্র ছিলেন। এই বংশ চিরদিন কলকাতার হিন্দুসমাজে অগ্রনীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৭৯৩ তে জন্ম রাধাকান্ত দেবের। ইংরাজী, পারসী, আরবী ও সংস্কৃতে পারদর্শি রাধাকান্তকে রামমোহন রায়ের ধর্ম আন্দোলন শুরু হলে, কলকাতার ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষাকারী রূপে বরণ করেন। হেয়ারের উদ্যোগে স্কুলবুক সোসাইটিও স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হলে তিনি ছিলেন অন্যতম উৎসাহিদের মধ্যে একজন। স্ত্রী শিক্ষার উন্নতির জন্য 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক' নামে বই প্রকাশ করেন। ইনি পরে রাজসম্মান সূচক স্যার উপাধি পেয়ে বহুকাল হিন্দুসমাজপতির সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রামকমল সেন :

ইনি ছিলেন সুবিখ্যাত কেশচন্দ্র সেনের পিতামহ গঙ্গাতীরের গৌরীভা গ্রামে বৈদ্যবংশে তাঁর জন্ম। ১৮০১ সালে পড়াশোনার জন্য তাঁর কলকাতায় আসা। ১৮০৪ আলে Dr. William Hunter প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থানী প্রেসে তিনি কাজ পান। Dr. Huntedr ও আরেক সত্ত্বাধিকারী Dr. Leaden কলকাতা ত্যাগ করে জাভা চলে গেলে রামকমল তখন সেখানে ম্যানেজার নিযুক্ত হন। পরবর্তিতে Dr. Wilson এর সাহায্যে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটিতে কেরাণীর কাজে নিযুক্ত হন। পরে নিজের প্রতিভা ও পরিশ্রমে ঐ সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ও কমিটির সদস্য হন। অবশেষে ট্যাঁকশালের ষদেওয়ান ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ১৮১৭ তে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হলে তিনি তার কমিটিতে ছিলেন। কিছুদিন সংস্কৃত কলেজেদর অধ্যক্ষতা করেছিলেন এবং মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে তৈরী করা মেডিক্যাল কমিশনের একজন সদস্য ও ছিলেন।

মতিলাল শীল :

১৭৯১ সালে কলুটোলার সুবর্ণ বণিক স্কুলে এঁর জন্ম। ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়ে খুব ভালো ভাবে বিদ্যাশিক্ষা করার সুযোগ না পেলেও পাঠাশালায় বাংলা ও শুভঙ্করী শিখেছিলেন দারুন ভাবে। ১৮১৫ সালে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে একটি সামান্য কাজে যুক্ত হন। সেখান থেকে ১৮১৯ সালে স্বাধীনভাবে বোতল ও কর্কের ব্যবসা আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে কেল্লার কাজ ছেড়ে দিয়ে বিদেশ থেকে আসা জাহাজের মুচ্ছুদিগিরির কাজ শুরু করেন। এর ফলে প্রচুর ধনাগম হয়। শিষ্ট, মিতভাষী, পরোপকারী এই ব্যাক্তি

১৮৪২ বঙ্গাব্দে একটি অবৈতিক কলেজ স্থাপন করেন। ১৮২৬ সালে শহরের উন্নতশীল ধনী ও নেতাদের মধ্যে ইনি ছিলেন অন্যতম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : স্বদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও হিন্দুকলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

টিপ্পনী

১৮২৮ সাল রামতনু লাহিড়ী স্কুল সোসাইটির স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে ঢুকলেন কলেজ। এখানে বাঙলা দেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরেজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও হিন্দুকলেজের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন -

দেওয়ানী কাজের ভার কোম্পানীর হাতে আসার পরেও অনেকদিন ফৌজদারী কাজের ভার মুসলিম কর্মচারীদের উপরেই ছিল । তখন বিচারের কাজে ইংরেজ বিচারকদের সাহায্য করার জন্য এক একজন মৌলবী সঙ্গে থাকতেন। কিন্তু আইনজ্ঞ মৌলবী পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন হোত, সে কারণেই এই সমস্যা দূর ককরার জন্য, ও রাজ্যভ্রষ্ট মুসলিম সমাজকে সন্তুষ্ট করার আশায়, প্রথম গর্ভনর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বাহাদুর কলাকাতয় একটা মাদ্রাসা স্থাপনের সংকল্প করেন ও ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে সেটি স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয় প্রাচীন আরবী ও পারসী রীতি অণুসারে শিক্ষা দেওয়া হোত, ও এর দায়িত্বে থাকতেন একজন সাবেককালেদর মৌলবী। এরপর এক ভারত হিতৈষী ইংরেজ রেসিডেন্ট জোনাথন ডন্‌কান বাহাদুরের প্রযত্নে কাশীধামে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। কাশীর কলেজের নিয়মাবলীর মধ্যে নির্দিইষ্ট হয় যে সেখানে বৈদ্যশাস্ত্রের অধ্যাপক ছাড়া আর সমস্ত অধ্যাপকই হবেন জাতীয় এবং মনু প্রণীত ধর্মশাস্ত্রের নির্দিষ্ট নিয়ম অণুসারে ছাত্রদের শীক্ষা দেওয়া হবে। সুতরাং একটা বিষয় বোঝা গেল যে সে সময়ে রাজপুরুষেরা হিন্দু ও মুসলিমদের পুরানো রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করতেন না বরং সেসব রীতি নীতির প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা দেখানোর চেষ্টা করতেন । ইংরেজ রাজপুরুষরা যে এদেশের শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন এমনটা নয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ আবার নেওয়ার সময় উপস্থিত হলে; পার্লামেন্ট মহাসভয় সেই প্রশহন উঠল চার্লস গ্রান্ট নামে একজন ভারত হিতৈষী ইংরেজ এদেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচারের বিষয়টি পেশ করেন, সে বিষয়ে একটা ছোট বইও রচনা করে বোর্ড অব কন্ট্রোনোর সদস্যদের হাতে তুলে দেন। এইভাবে যখন একদিকে স্বদেশে-বিদেশে ভারতের শুভাকাঙ্খীরা ক্ষীণ ও দুর্বলভাবে এদেশীয়দের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তখন শিক্ষা বিষয়ে দেশের অবস্থা ছিল শোচীয়। দেশের কোন কোন জায়গায় সংস্কৃতের কিছু চর্চা ছিল ঠিকই কিন্তু তাও শুধুমাত্র ব্যাকরণ - স্মৃতি আর ন্যায়ের শিক্ষায় পরিণতি হয়েছিল। এমনকি বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানসমুদ্র সমান বইপত্রও পন্ডিতেদের অজানা ছিল । এমন

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
20

অবস্থায় নানা কারণে দেশের লোকেদর মন ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকতে লাগল। এদেশে ইংরেজদের ভিত্তইভূমি যত শক্ত হতে থাকল ততই এদেশের মানুষদের অর্থাৎ কলকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের মধ্যে নিজের সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষা দেবার ইচ্ছা বাডতে লাগল । এই সময় কলকাতার কয়েকক্রোশ উত্তরে শ্রীরামপুর নগরে, মার্সম্যান ও ওয়ার্ডনামের তিন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক বাস করত। নতুন রাজ্য পাওয়া ইংরেজ জাতি নিজের রাজ্যের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের ধর্মপ্রচারে অণুমতি দিতে কিছুটা ভয় পেয়েছিল তাই কেরীরা ডেনমার্কের অধিপতির কাছ থেকে ধর্মপ্রচারের অণুমতি নিয়ে দিনেমার জাতির অধীনে শ্রীরসামপুরে গিয়ে বাস করছিল। ১৮০২ সালে পীতাম্বর সিং নামের এক কায়স্থ ব্যাক্তিকে তাঁরা প্রথমে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষীত করে, এদরপর ধীরে ধীরে সেই সংখ্যা বাড়তে থাকে । এরই সাথে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা দুটি দিকে মনোযোগ দিল - এক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের ইংরেজী শিক্ষার উপায় বিধানে দিকে আর দুই, দেশীয় ভাষায় বাইবেল প্রভৃতি বই অনুবাদ করার জন্য বাঙলা ভাষার অনুশীলন। এদেশে নবাগত সিবিলিয়ানদের শাসনকার্য সুষ্টভাবে পরিচালনা করার জন্য, দেশীয় চাষা রীতি-নীতি সম্পর্কে অবগত করানোর প্রয়োজনে গভর্ণর উইলিয়াম কলেজ। মূলত দেশীয় ভাষা শিক্ষাই ছি সেই কলেজের মূল উদ্দেশ্য। ফলত প্রয়োজন পড়ল বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের ; আর সে পচরণেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্ককার, উইলিয়াম কেরী, রামরাম বসু প্রমুখ ব্যাক্তিগণ কিছু বই রচনা করেন। যার মধ্যে রাজীব লোচনের ‘কৃষ্ণচন্দ্র চরিত’ কেশরীর ‘বাঙ্গলা ব্যাকরণ’, ‘রামরামবসুর ‘প্রতাপপাদিত্য চরিত’ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ‘বত্রিশ সিংহাসন’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । উইলিয়াম কেরি এই কলেজের শিক্ষক ছিলেন, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই ও কিছুদিন এখানে শিক্ষকতা করেছিলেন। অপরদিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহায্যে পরোক্ষভাবে দেশে বাংলা ভাষার চর্চা চলতে লাগলো তেমনি কলকাতার নানা জায়গায় জায়গায় কিছু ফিরিঙ্গী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করলেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় সার্বরণ (Sherburne) নামেওর এক ইংরেজের কথা, যিনি চিৎপুর রোড়ে একটি স্কুল স্থাপন করলে; এইজ স্কুলে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম শিক্ষা লাভ কচরেছিলেন। সেই সময় ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাক্যরচনা বা ব্যাকরণ এসব শিক্ষার দিকে মূল লক্ষ্য দেওয়া হোত না, কেবল ইংরেজী শব্দ ও তার অর্থ শেকাবার দিকে মূলত মনোযোগী দেওয়া হোত। যে ব্যাক্তি যত বেশি সংখ্যক ইংরাজী শব্দ ও অর্থ মুখস্থ করত, ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত বলে তার তত বেশী খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হোত। এইভাবে যখন ইংরেজী শিক্ষার জন্য দেশের লোকের ব্যগ্রতা বাড়ছিল দিন দিন , তখন সে বিষয়ে ইংরেজ মনযোনগ দেননি পাছে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত করতে গেলে দেশের লোক বিরক্ত হয়। তাদের সেই ভয়ের কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। এইভাবে কাটল ১৮১১ সাল। সে বছরই গর্ভনর জেনারেল লর্ড মিন্টোর একটি মন্তব্যে প্রাচীন বিদ্যার ববিলোপের আশঙ্কা ও সে

কারণে কাশীর কলেজ ছাড়া নবদ্বীপে ও ত্রিহুতের অন্তর্গত ভাউরে দুটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবের পিছনে যে কারণটি ছিল, তা হোল স্যার উইলিয়াম জোন্সের সময় থেকে ভারত প্রবাসী ইংরেজদের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনা করা, এই বিদ্যায় অভিজ্ঞ হওয়া তাঁদের মান সম্ভ্রম লাভেদর একটা প্রধান উপায় ছিল। সে কারণেরই অল্প বা বেশী পরিমাণে সংস্কৃত জাআ সে সময়ের ভদ্র ইংরেজদের কাছে ফ্যাশানসম ছিল বলা যায়। লর্ড মিন্টোর এই লিপির ফলে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পাঈর সনদ পুনরায় গ্রহণের সময় সংসদের তাড়া পেয়ে কোর্ট অব ডিরেক্টারসের সদস্যরা ভারতবর্ষীয় গর্ভরর্ণমেন্টকে আদেশ দিলেন যে প্রতি বছর কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা আলাদা রাখতে হবে যা ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে বিদ্যার উন্নতি, পন্ডিতদের উৎসাহদান ও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিকারের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও উন্নতির জন্য ব্যবহার করা হবে। ১৮১৪ সালে, রামমোহন রায় কলকাতায় আসেন হেয়ারের সাথে আলোচনায় নিজের মনের ভাব ব্যাক্ত করেন এবং দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত এন একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করা হবে। প্রস্তাবটি বৈদ্যনাথ মুখুজ্যের মাধ্যমে সেসময়ের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ঈষ্ট (Sir Hyde East) এর কাছে পেশ হলে তিনি খুব উৎসাহ দেখান ও সেই অনুযাবী আলোচনা ও কাজ এগোতে থাকে। গোল বাঁধে কিছুটা পরে, রামমোহন রায়ের কমিটিতে থাকা নিয়ে হিন্দু ভদ্রলোকেদের মধ্যে তীব্র আপত্তই দেখা দেয় কেননা রামমোহন হিন্দুধর্মের পৌত্তইলকতার বিরোধীতা করে একেশ্বরবাদের প্রচার করতেন। এ ঘটনায় স্যার হাইড মহাবিপদে পড়লেন কারণ হেয়ার ও রামমোহনই ছিলেন মূলত এই কলেজ গড়ার ক্ষেত্রে মূল উৎসাহী। এ অবস্থায় হেয়ারের মধ্যস্থতায় বিষয়টা সহজ হোল এবং হেয়ার রামমোহনকে সবকিছু জানালে তিনি শুনেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের নাম কমিটি থেকে তুলে নিলেন। এরপর ১৮১৭ র ২০ শে জানুয়ারী গরাণহাটায় মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ খোলা হোল। শুধু কলকাতা নয়, মফঃস্বলের নানা জায়গাতেও ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধানের চেষ্টা হতে লাগল এবং নানা স্থানে ইংরাজী স্কুল খোলা হোল। কেরী, মার্শম্যানরাও ১৮১৫ তে শ্রীরামপুরে তাঁদের সুপ্রসিদ্ধ কলেজের সূচনা করেন; এছাড়াও রামমোহন রায় - দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যে নানা জায়গায় ইংরাজী স্কুল স্থাপন করতে লগলেন। এদেশের রাজপুরুষরা সাধারণ মানুষের চিন্তা - রুচি - চাহিদার বিষয়ে ছিলেন সম্পূর্ণ অজানা এবং সেকারণেই যখন দেশের সবজায়গায় ইংরেজী শীক্ষার জন্য আগ্রহ বাড়তে লাগল, তখন গর্ভনর জেনারেল ও তাঁর পারিষদদল ব্যাস্ত হয়ে থাকলেন প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ এবং নদীয়া আর ত্রিহতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে। নানারকম বিষয়ে চিন্তা করে অবশেষে সে কলেজ স্থাপনও হোল বটে কিন্তু ছাত্রদের বৃত্তিদেওয়া - প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রণে জলের মত টাকা ব্যায় হতে লাগল, উপরন্তু সে সকল গ্রন্থ কেনার লোক পাওয়া

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গেল না। ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বিষয়ে সরকার উদাসীনতা দেখে দুখী রামমোহন এসময় সংস্কৃত কলেজের বিরোধীতা ও ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপনের পক্ষে সওয়াল করে সরাসরি বড়লার্ট লর্ড আর্মহাষ্ট কে চিঠি দেন। রামমোহনের চিঠির পচরাথর্ণ পূর্ণ হোল না বটে কিন্তু এই চিঠির ফলস্বরূপ সরকার স্থির করল যে কলকাতার মসাঝে যে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা হবে তারই সাথে আগে প্রতিস্ঠিত হিন্দু কলেজের জন্য বাড়ি তৈরী হবে। এই অনুসারে, ১৮২৪ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী দুটি কলেজ বাড়ীর ভিত্তই স্থাপিত হোল। হিদু কলেজের মূলধন ইটালীর বেরেটো কোম্পানীর কাছে রাখা ছিল এবং এই কোম্পানী দেইউলিয়া হওয়ায় সেই অর্থের বেশিরভাগটাই নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বাথ্য হয়ে কলেজ কমিটি সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করে। সরকার সাহায্য করতে রাজী হয় এই মর্মে যে , সরকারের নিযুক্ত কোন একক কর্মচারীকে কলেজের পরিদর্শক রূপে নিযুক্ত করতে হবে এবং সেই অনুসারে তখনকার কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সম্পাদক এইচ. এইচ. উইলসন সাহেব প্রথম পরিদর্শক নিযুক্ত হন, ১৮২৮ সালে রামতনু লাহিড়ী, দিগম্বর মিত্র স্কুল সোসাইটির স্কুল থেকে আসলেন হিন্দু কলেজে। ভর্তি হলেন চতুর্থ শ্রেণীতে। সিক্ষক হিসাবে পেলেন বঙ্গের নবযুগের প্রবর্তক হেনরী ভিভয়ান ডিরোজিও (Henry Vivian Derozio) কে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা।

১৮২৫ থেকে ১৮৪৫ এই কুড়ি বছরকে বাঙলার নতুন যুগের জন্মকাল বলা যায়। এই সময়ে রাজনীতি - সমাজনীতি শিক্ষা; সবদিকেই নবযুগের সূচনা হয়েছিল। ইংরেজ বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে পরিণত হোল ঠিকই কিন্তু তাদের মধ্যে রাজা সুলভ আচরণ আসতে সময় লেগেছিল। বহুদিন পর্যন্ত কোম্পানী ও কোম্পানীর অনেক কর্মচারীর মনে রাজা নয়; বরং বণিক ভাবই বেঁচে ছিল। তারা শুধু মাত্র অর্থ উপার্জন নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। বৈধ পথে কোম্পানী তার কর্মচারীদের যে অনেক টাকা বেতন দিতে পারত তা নয়; বরং অতিরিক্ত অল্পবেতনেই কর্মচারীরা এতদূর দেশে আসতেন কারণ এ দেশে তখন অবৈধ পথে অনেক অর্থ উপার্জন করা যেত। এসব কর্মচারীদের বলা হোত কুঠীওয়ালা। তারা কোম্পানীর কুঠীগুলি দেখাশোনা করা, ব্যবসার জিনিষের বেচা - কেনা বিষয়ে দেখা করা, হিসেবপত্র রাখা ও কোম্পানীর নানা রকম ব্যবসায়িক কাজে সাহায্য করতেন। ১৭৬৫ তে কোম্পানি দেওয়ানির জন্য সনদ পেলে রাজস্ব আদায়ের ভার পড়ল এসব কুঠীওয়ালাদের ওপরেই আর ফৌজদারি কাজের দায়িত্ব মুর্শিদাবাদের মুসলমান গভর্ণমেন্টের হাতেই থাকল। কুঠীওয়ালারা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বণিকের মনোভাবটাই ধরে রাখল, কোন ভাবেই দেশের রাজা হিসেবে সেই নজরে প্রজাদের সুখ-দুঃখ বোঝার চেষ্টা করল না,

ফলত বাঙলায় নেমে এল - ছিয়াত্তর 'মন্বন্তর'। এই দুর্ভিক্ষের বছরে সমগ্র প্রজজাসংখ্যার প্রায় তিনভাগের একভাগ দুর্ভিক্ষের কারণে মারা পড়লেও কোম্পানি কিন্তু তার রাজস্বের এক পয়সাও ছাড়েনি। অর্থাৎ বোঝা যায়, ইংরেজরা দেশের রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও রাজার দায়িত্ব সে সময় অনুভব করতে পারেনি। ইংরেজরা সমগ্র দেশ দখল করলেও তারা এই দেশে পাকাপাকি ভাবে বসতে পারবে কিনা; এই বিষয়ে প্রজাদের মনে সন্দেহ ছিল কিন্তু সময় এগোনোর সাথে সাথে তারা বুঝল ইংরেজ রাজ্য স্থাবী হতে চলেছে আর ইংরেজরা ধীরে ধীরে এত বিরাট সাম্রাজ্যের দায়িত্ব অনুভব করতে লাগলো। এমন এক অবস্থায় রাজাও রাজার মনে যে সাধারণ প্রশ্নটি ঘুরতে লাগল, তাই হোল শাসন নীতি কোন দিকে যাবে? - প্রাচীন নাকি নবীন! আর প্রজারা ভাবতে লাগলো কাকে সাদরে গ্রহণ করি? - প্রাচীন নাকি নবীন! ১৮২৫ থেকে ১৮৪৫ এই ২০ বছরের মধ্যে এই দুই প্রশ্নেরই বিচার ও মীমাংসা হওয়ায় ঐ কালকে বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ বলা যায়। নতুন রাজারা যতদিন এদেশ ও দেশবাসীদের সম্পূর্ণভাবে বুঝে নিতে পারেননি, ততদিন পর্যন্ত কোন বিভাগেই পুরানো নিয়মকানুনের উপর হাত দেয়নি তারা। এমনকী রাজনীতি বিভাগেও দেশীয় কর্মচারীদের দিয়ে, দেশীয় রীতিতেই সবকাজ চালিয়েছেন। প্রথমদিকে এদেশীয় নায়েব - দেওয়ান নিয়োগ করে তাদের হাতেই রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়েছেন। তারপর লর্ড কর্ণওয়ালিস এদেশীয় ব্যাক্তিদের উঁচুপদ থেকে সরিয়ে যখন সে জায়গায় ইউরোপীয় ব্যাক্তিদের বসালেন এবং ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত যখন এদেশীয়দের সেরেস্তাদারের ওপরের পদে ওঠার অধিকার থাকলো না, তখন থেকেই এদেশীয়দেদর আসল পতনের সময় শুরু হোল ল আইন আদালত, শিক্ষাবিস্তার এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্র শেখানোর জন্যও তাঁরা বহুবছর পর্যন্ত পুরানো পন্থারই পক্ষপাতী ছিলেন। কিছুটা ভয়ে, কিছুটা লোকের মন রাখার জন্য আর কিছুটা রাজনীতির কারণেই তাঁরা শুরুতে সববিষয়েই পুরানোকে রক্ষা করে চলতে লাগলোও; অনেক তর্কবিতর্কের পর পুরানোকে সরিয়ে নতুনকেই প্রতিষ্ঠা করা হোল ও ইংরেজদের তরফে মেকলে ও বেন্টিঙ্ক এই নতুন যুগের সারথি হয়ে উঠেছিল। নবীন ও প্রবীণের টানাপোড়ন এদেশীয়দের মনেও চলছিল, তাঁদের মধ্যে শিক্ষিত ও এগিয়ে থাকা ব্যাক্তিরা নবীনকে বরণেই মত দিলেন। দেশীয়দের পক্ষ থেকে রামমোহন - হেয়ার সাহেব - ডিরোজিও এই তিনজন সারথি হয়ে উঠলেন। লর্ড আর্মহাষ্টকে লেখা রামমোহনের চিঠিকে নতুন যুগের প্রথম শাঁখের সুর মনে করা যেতে পারে; তবে সেই শাঁখের ধ্বনি ছিল সামরিক। তবে একথা স্বীকার করতে বে যে, তিনি নতুনকে বরণ করতে গিয়ে পুরানো থেকে সরে যাননি। হিন্দু জাতির মহাত্ম্যকে বুকে আঁকড়েই তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান - নীতি ইত্যাদিকে অনুকরণ যোগ্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু সব রকমের সামাজিক বিপ্লবেরই একটা ঘাত - প্রতিঘাত থাকে এবং সেই আঘাত ও প্রত্যাঘাতে ধীরে ধীরে যা কিছু পুরানো সবই মন্দ ও যা কিছু নতুন সব

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ভালো - এমন একটা সিদ্ধান্ত যেন উঠে আসতে থাকলো। ফরাসি বিপ্লবের আন্দোলনের ঢেউ ভারতে এসে ঢুকলে সেই আন্দোলনের আবেগের ফলাফলে বাঙলার যুবকদের মধ্যে সবরকমের কুসংস্কার উপধর্ম - প্রাচীন রীতিকে ভান্ডার প্রবণতা দেখা দেইল এবং এরফলে অতিরিক্ত প্রচীত্য পক্ষপাতিত্ব দেখা গেল। সময়টা ১৮২৮ ; ডিরেজিও শিক্ষক হয়ষে ঢুকলেন হিন্দু কলেজে, এই সময়েই রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ধর্ম ও সমাজসংস্কারের আন্দোলন, নব প্রবর্তিত ইংরাজী শিক্ষার ঢেউ, গর্ভনর জেনারেল হিসাবে বেন্টিঙ্কের আসা - সবকিছু যেন একসাথে একটি যোগসূত্র তৈরী করল। ধীর বিচারশীল লর্ড বেন্টিঙ্কের সময়ই বাঙালীয় সহমরণ প্রথা রদ, ঠগীদমন, ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন, মেডিকেল কলেজের স্থাপনা এই সমস্ত কাজগুলি পরপর বাস্তবে কার্যকরী হতে থাকে। বেনটিঙ্ক এদেশে পা দিতে রামোহনের সমাজ সংস্কার মূলক কাজের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। মিশনারী উইলিয়াম আজম ত্রিশ্বর বাদ ত্যাগ করে একেশ্বরবাদী হওয়ায় মিশনারীদের রাজ এসে পড়ে রামমোহনের ওপর এবং শত্রুর মত তারা তাঁকে আক্রমণ করতে থাকে। মিশনারীরা নিজেদের ছাপাখানায় তাঁর লিখিত ইংরেজী বই ছাপাতে অস্বীকার করলে তিনি ধর্মতলাতে 'ইউনিটেরিয়ান প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করলেন। ও ধীরে ধীরে তাঁর একেশ্বরবাদে প্রচারকাজের পরিধি বাড়াতে লাগলেন। এমনই এক সময় অর্থাৎ ১৮২৮ এর ৬ই ভাদ্র রামমোহন রায় কলকাতার চিৎপুর রোড়ে ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ির বাইরের বৈঠকখানা ভাড়া নিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্মসমাজ। তাঁর সাথে ছিলেন কাশীনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক প্রভৃতি আত্মীয়সভার বন্ধুরা। প্রতি শনিবার সন্ধেবেলা সেখানে ব্রহ্মোপসনা হোত। তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তী এই প্রথম সমাজের সম্পাদক ছিলেন। এই সভার স্থাপন কলকাতার হিন্দু সমাজের মধ্যে আন্দোলন তৈরী করল। একদিকে যখন হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে চলছিল বাগ্‌বিতন্ডা ও আন্দোলন তখন হিন্দু কলেজের মধ্য দেখা গেল ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা। ডিরোজিও কলেজে ঢুকেই চুম্বক যেমন লোহাকে টানে সে ভাবেই কলেজের বালকদের নিজের দিকচে আকৃষ্ট করে নিলেন ও শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব গভীর সম্পর্ক তৈরী হোল। তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণীত ছাত্রদলের অনেকেই পরবর্তীকালে বেশ নাম ডাক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ডিরোজিও তাঁর অনুগামীদের নিয়ে তৈরী করলেন তাঁর 'একাডেমিক এসোসিক্রশন' (Academic Association)। প্রথম কিছুদিন অন্যকোন জায়গায় সভার অধিবেশন হলেও শেষে মানিকতলার একটি বাড়ীতে হোত এই অধিবেশন হলেও শেষে মানিকতলার একটি বাড়ীতে হোত এই অধিবেশন। ডিরোজিও ছিলেন সভার সভাপতি ও প্রথম সম্পাদক ছিলেন উমাচরণ বসু নামে একজন যুবক। সভার উল্লেখযোগ্য বক্তারা ছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ আর উৎসাহী শ্রোতা ছিলেন রামতনু

লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতিরা। এই সভার অধিবেশনে সমস্ত নৈতিক ও সামাজিক বিষয়কে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা তৈরী হোল এবং তারা অসংকোচে দেশের প্রাচীন রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করলেন। ডিরোজিও প্রভাব বালকদের মধ্যে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে তার ফলস্বরূপ হিন্দু পরিবারের মধ্যে গোলযোগ তৈরী হতে শুরু করল, শহরের মধ্যে হুলুস্থুলু পড়ে গেল। একদিকে যখন শহর তোলপাড় এমন সময় ১৮২৯ এর ৪ঠা ডিসেম্বর মহামতি লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে আদেশ প্রচার করলেন। এরই অল্পদিন পরে, ১৮৩০ এর ১১ই মাঘ রামমোহন রায় তাঁর নতুন তৈরী বাড়িতে ব্রাহ্মসভাকে স্থাপন করলেন - এসমস্ত ঘটনায় কলকাতায় হিন্দুরা খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল। রাধাকান্তদের উদ্যোগী হয়ে ধর্মসভা নামে একটি সভা স্থাপন করলেন, মতিলাল শীল কলুটোলাতে তারই একটা শাখা ধর্মসভা স্থাপন করলেন, ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় দুগুন উৎসাহের সথে সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারে মাতলেন। এইভাবে হিন্দু ও ব্রাহমসমাজের পারস্পরিক রোশ ও আক্রোশের ফলে সমাজের মধ্যে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। সতীদাহ প্রথা নিবারন ও ব্রাহ্মসভা স্থাপন এই দুই বিষয়ে কলকাতা বাসী হিন্দুদের মন এমনই উত্তেজিত হয়েছিল যে, সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে আইন রদ করার জন্য এক আবেদন পত্রে বহুসংখ্যক লোক স্বাক্ষর করতে লাগল, আর অপরদিকে রামমোহন লর্ড বেন্টিঙ্ককে সহমরণ রদের জন্য ধন্যবাদ দিতে অভিনন্দনের চিঠি লিখলে তাঁর কিছু বন্ধু ছাড়া আর কেউ সেখানে স্বাক্ষর করলো না। এরি মধ্যে বিখ্যাত খ্রীষ্টান মিশনারি আলেকজান্ডার ডফ কলকাতায় এসে রামমোহনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে অনুভব করলেন যে এদেশে ইংরেজী স্কুল স্থাপন করে, ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে হবে। রামমোহন তখন বিলেত যাওয়ার আয়োজন করছিলেন। তিনি ব্রাহমসমাজের প্রথমে ব্যবহার করা ফিরিঙ্গী কমলা বসুর বাড়ীতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দিয়ে ডফকে সহায়তা করে, বিলেতের উদ্দেশভে পাড়ি দিলেন। ডফ স্কুল স্থাপন করে নবশিক্ষিত যুবকদলের কাছে থাকার আশায় হিন্দু কলেজের কাছে বাসা করে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। এদিকে, হিন্দুকলেজ কমিটির সদস্যরা কলেজ থেকে ডিরোজিওকে তাড়ানোর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয়ে উঠল। সুপ্রসিদ্ধ্য রামকমল সেন মশায়ের উদ্যোগে ১৮৩১ এর এপ্রিলে অবশেষে দিরোজিওকে পদচ্যুত করা হোল। ডাক্তার উইলসন মারফত এই খবর পেয়ে ডিরজিও সঙ্গে সঙ্গে পদষত্যাগের চিঠি লিখলেন এবং তাঁর উপর যে সমস্ত দোষারোপ করা হয়েছিল, সে সবটুকুকেই তিনি দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করলেন। কলেজ ছাড়বার পরে তিনি যে কয়েকমাস বেঁচে ছিলেন সে সময়ের মধ্যেও অসংখ্য কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন অসম্ভব পরিশ্রমে ১৮৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তিনি কঠিন ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ি হন, টানা ৬ দিন ত২আর শিষ্যদল রাত দিন এক করে সেবা করলেও সুস্থ করা গেল না, অবশেষে ২৪ শে ডিসেম্বর তিনি প্রাণবায়ু ত্যাগ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

করলেন। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব ও সদেই কারণে কমিটি গঠন করা এ সব হলেও ধীরে ধীরে সবই তলিয়ে গেল সময়ের অতলে। নব্যবঙ্গের একজন প্রধান শিক্ষক ও দীক্ষাগুরুর চিহ্ন ও আর বেঁচে থাকলো না। ডিরোজিও যে ঢেউ তুলে দিয়েছিলেন তা সহজে শান্ত হোলনা, আর এই ঢেউয়ের বিক্ষিপ্ততায় অস্থির সময়ে দাঁড়ীয়ে তাঁর শিষ্যরা সবসময়ই সঠিক পদক্ষেপ যে নিতে পেরেছিল এমনটাও হয়নি। এই অস্থিরতার ফলে ঘটে যাওয়া এক ঘটনাসূত্রে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের হিন্দুত্ব পরিবার তাঁকে পরিত্যাগ করে। কৃষ্ণমোহন মে মাস থেকে Inquirer নামে এক সংবাদপত্র প্রচার করে সেখানে হিন্দুদের প্রতি উপহাস করতে থাকে। এই পত্রিকাতেই ১৮৩২ এর ২৮ শে আগষ্ট ডিরোজিও শিষ্য মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণের খবর প্রকাশ পায় আর সে বছরই ১৭ই অক্টোবর কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষীত হয়। ১৮৩৩ সালে লাহিড়ী মশাই কলেজ থেকে পাশ করে হিন্দুকলেজে শিক্ষকরূপে যোগ দেন এবং এই বছরই ইংল্যান্ডের ব্রিষ্টলনগরে রাজা রামমোহনররায় দেহত্যাগ করেন। দিনটি ছিল ২৭ শে সেপ্টেম্বর। লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় থেকে এদেশীয়রা হাজার বড় হলেও সেরেস্তাদের ওপর উপরে পারতো না; রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ও মহামতি বেন্টিঙ্কের পরামর্শে, গভর্নমেন্টের অধীনে উঁচু উঁচু পদ এদেশীয় ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যাক্তিদের জন্য খুলে গেল এই সময় থেকেই সালটা ছিল - ১৮৩৩।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : রামতনু লাহিড়ীর যৌবন - সুহৃদগ বা নব্যবনঙ্গের প্রথম ষযুগের নেতৃবৃন্দ।

ডিরোজিওর প্রতিভার আলোয় তাঁর দিকে কলেজের ছাত্ররা আকৃষ্ট হয়েছিল ও তেরী হয়েছিল তাঁর কিছু অনুগামী। তাঁরা ডিরোজিওর বাড়িতে যাতাযাত করত, তাঁর সাথে বিবিধ বিষয়ে আলোচনায় মাততো। বালকদের মনে ডিরোজিওর প্রভাব ছিল গভীর ও এঁরা সকলেই তাঁর একাডেমিক এসোসিয়েশনের সদস্য হয়েছিলেন। রামতনু লাহিড়ী ছিলেন এই দলের ছোট ভাইয়ের মতো ; তিনি প্রতিভাবলে রসিককৃষ্ণ মল্লিকদের সমকক্ষ না হলেও নানা বিষয়ে এদেরকে বড় ভাই মনে করে তাঁদের কথা শুনতেন। সমস্ত জীবনই তাঁদের সাথে লাহিড়ী মশায়ের গভীর প্রিতি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় ছিল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

26

কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় :

ডিরোজিওর শিষ্যদের নামের তালিকা করলে ও লাহিড়ী মশায়ের যৌবনের শুভকাংখীদের সম্পর্কে আলোচনা করলে সবার প্রথম যে নামটি আসে, তা হলে

কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়। ১৮১৩ সালে কলকাতার ঝামাপুকুরে তাঁর মায়ের বাড়িতে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর মায়ের বাবা রামজয় বিদ্যাভূষণ ছিলেন প্রসিদ্ধ ধনী শান্তি রামসিংহের সভাপন্ডিত। তাঁর বাবা জীবনকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ি ২৪ পরগণার নবগ্রামে হলেও তিনি বিয়ের সূত্রে বিদ্যাভূষণ মশায়ের বাড়িতেই থাকতেন। কৃষ্ণমোহনের মা ছিলেন শ্রীমতী দেবী। কৃষ্ণমোহন ছাড়াও তাঁদের আরো দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। সংসারের আয়তন বাড়ার কারণে জীবনকৃষ্ণ শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে একটি আলাদা বাই বানিয়ে সেখানে ধাকতে সুরু করলেন। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারেই ভালো ছিল না। বরং বলা যায় কায়ক্লেশে দিন কাটতো। সে সময় ভারতবন্ধু হেয়ার কালীতলাতে স্কুল সোসাইটির অধীনে একটা পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করলে কৃষ্ণমোহন সেখানে ভর্তি হন; অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আপন প্রতিভায় হেয়ার সাহেবের চোখে পড়েন ও হেয়ার তাঁকে ১৮২২ সালে নতুন প্রতিষ্ঠিত স্কুল সোসাইটির স্কুলে নিয়ে যান এবং ১৮২৪ এ কৃষ্ণমমোহন স্কুল সোসাইটির অবৈনিক ছাত্ররূপে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করলেন। পড়াশোনার বিষয়ে তাঁর মনোযোগ ছিল অন্যের কাছে উদাহরণ স্বরূপ। পারিবারিক বহু সমস্যার সাথে মোকাবিলা করে পড়াশোনা করলেও বিদ্যালয়ে কেউই তাকে পড়াশোনায় ছাড়িয়ে যেতে পারতো না। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগ দিলে অন্যান্য বালকদের মতো কৃষ্ণমোহনও তাঁর দিকে আকৃষ্ট হলেন, তিনি তখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। ডিরোজিও তাঁকে নিজের শিষ্যদলের মধ্যে অন্যতম বলে মেনে নিলেন এবং যখন একাডেমিক এসোসিয়েশন স্থাপিত হল তখন কৃষ্ণমোহন তাঁর যুবকসদস্যদের মধ্যে একজন নেতা হয়ে দাঁড়ালেন। ১৮২৯ সালের নভেম্বর মাসে তিনি হিদু কলেজথেকে পাশ করে বেরোনোর পর ডেভিউ হেয়ার তাঁকে নজের স্কুলেদর দ্বিতীয় শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করলেন। বাবু প্রসন্নকুমার ঢাকুর ১৮৩১ সালে 'Reformer' নামে একটা সংবাদ পত্র বের করলে কৃষ্ণমোহন সে বছরেই মে মাসে প্রকাশ করলে Inquirer' নামে একটা কাগজ এবং সেখানে হিন্দুধর্মের রীতি - নীতি - আচার - আচরণের প্তি বিদ্বেষ কে সরাসরি তুলে ধরেন। আলেকজান্ডার ডাফ এদেশে এসে হিন্দু কলেজের কাছে বাসা নিয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করতে শুরু করলো। বন্ধুবান্ধব নিয়ে কৃষ্ণমোহন সে সমস্ত বক্তৃতা শুনতে যেতেনএবং ডফ ও ডিয়াত্রির বাসায় গিয়ে তর্কবিতর্কেও মাততেন। ১৮৩১ এর আগষ্ট আসে হঠাৎই ঘটে যাওয়া এক ঘটনায় তাঁকে বাড়ির লোক বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করায় তিনি গৃহহীন হন সেসময় বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন তাঁর পাশে দঁাড়ান ও নিজের বাড়িতে তাঁকে আশ্রয় দেন। গৃহহীন হবেও তাঁর কাজের উৎসাহ কোন ভাবেই কমেনি বরং তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে ত২আর Inquirer পত্রিকা চালাতে থাকললেন ও সংকোচহীন ভাবেই দফ্ - ডিয়ালট্রি প্রভৃতি খ্রিষ্টীয় প্রচারকদের বাসায় যাতাযাত ও খাওয়াদাওয়া করতে লাগলেন। ১৮৩২ সালের ২৮ শে আগষ্ট তাঁর পত্রিকা 'ইনকোয়ারার' সূত্রে কলকাতা জানতে পারল হিন্দু

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কলেজের অন্যতম ছাত্র ও কৃষ্ণমোহনের বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন, ফলত সমাজে উঠল তুমল আন্দোলন। এরই কয়েক মাসের মধ্যেই, অক্টোবরের ১৭ তারিখে কৃষ্ণমোহন নিজে দীক্ষীত হলেন খ্রীষ্ট ধর্মে। এরপর তাঁর জীবনে পরপর নানা ঘটনা ঘটে চললো। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষীত হওয়ায় তার প্রণয়িনী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী প্রথমে তাঁর সহচারিনী হতে অস্বীকার করেছিলেন কিন্তু অনেকদিন অপেক্ষা করার পর অবশেষে, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এসে যোগ দেন কৃষ্ণমোহনের সাথে। ১৮৩৭ এ কৃষ্ণমোহন লাভ করেন খ্রীষ্টয় আচার্য্যের পদ, ১৮৩৯ - এ তাঁরই ছোটভাই কালীমোহনকে দীক্ষীত করেন নিজের ধর্মে এবং ঐ সালেই তাঁর জন্য হেদুয়ার কোনো একটি ভজনালয় তৈরী হল। গর্ভনর জেনারেল লর্ড হাডিঞ্জের উৎসাহে ১৮৪৫ সাল থেকে সর্ব্বার্থ সংগ্রহ' আমে জ্ঞান - গর্ভ- মহা কোষ ধরণের বই তিনি প্রণয়ন করতে শুরু করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা বেথুনের মৃত্যু হলে তাঁর নামে স্থাপিত সভায় সভাপতি নির্বাচিত হন কৃষ্ণমোহন। ১৮৫২ তে মনোনীত হন বিশপ কলেজের অধ্যাপক পদে, ১৮৬১ - ৬২ তে হিন্দু ষড়দর্শন বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ এক প্রবন্ধের বই বের করেন, ১৮৬৭ তে নিযুক্ত হন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হিসাবে - ইত্যাদি পরপর নানা ধরনের ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটতে থাকে ও তিনি যুক্ত হন নানারকম সম্মানজনক কাজের সাথে।

রামগোপাল ঘোষ :

ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম রামগোপাল ঘোষের জন্ম ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বর্তমান বেচু চাটুজ্যের স্ট্রিট নামের গলিতে তাঁর মাতামহ দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহের বাড়িতে। তার বাবা গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ পৈতৃক বাড়ি ছিল হুগলী জেলার বাগটী গ্রামে। রামগোপালের শুরুর দিকের পড়াশোনা সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানা যায় না এমনকি তাঁর হিন্দু কলেজে ভর্তি হওয়ার বিষয়েও দুরকমের জনশ্রুতি আছে। তবে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করার পরে তাঁর পড়াশোনায় মনোযোগ ও অসাধারণ মেধা দেখে মআমতি হেয়ার তাঁকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দিলেন। ডিরোজিওর শ্রেণীতে ওঠার পর রামতনু লাহিড়ীর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। যে কয়েকটি বালক ডিরোজিওর দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকেছিলেন রামগোপাল তাঁদের একজন এবং অপরদিকে ডিরোজিও ও তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন ও ছুটির পর তাঁর সাথে বসে সমকালীন বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিকদের বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা করতেন। একাডেমিক এসোসিয়েশন স্থাপিত হওয়ার পর রামগোপাল ছিলেন তাঁর সদস্য। এখানেই তাঁর বক্তৃতাশক্তির প্রথম বিকাশ হোল ও তার যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রামগোপাল কলেজ শেষ করতে পারেননি কারণ পরিস্থিতির চাপে কলেজ পাশ করার আগেই তাঁকে এক ধনবান ইহুদী বণিক মিষ্টার জোসেফের সহকারী রূপে কর্মজীবন শুরু করতে হয়। অপেক্ষাকৃত

অল্পবেতনে রামগোপাল মিষ্টার জোসেফের অফিসে কাজ শুরু করলেও খুব তাড়াতাড়ি তাঁর পদ বাড়তে থাকে। কিছুদিন পর মিষ্টার কেলসল এসে জোসেফের সাথে যোগ দিলে তাদের যৌথ ব্যবসায় রামগোপাল মুছুদি হয়ে থাকলেন। ক্রমে জোসেফ ও কেলসলের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হলে রামগোপাল কেলসনের সাথে কারবার করতে শুরু করেন এবং পরে কেলসনের সাথে তাঁর সমস্যা হওয়ায় তিনি ঘোষ কোম্পানী (R.G. Ghosh & Co.) নাম নিয়ে আলাদা করে সওদাগারী কাজ চালাতে লাগলেন। এবং এই তিনক্ষেত্রেই ধনসম্পত্তি ধীরে ধীরে বাড়ার দিকেই এগোছিল। তাঁর বৈষয়িক উন্নতি হওয়ার সাথে সাথেই তিনি মন দিলেন নিজের উন্নতি ও স্বদেশের কল্যান হয় এমন কাজে। প্রবল বন্ধুপরায়ন রামগোপাল ছিলেন সৎ ও সহৃদয়। অতি বড় বিপদেও তিনি তাঁর এই মূল চারিত্রিক বেশিষ্ট্যকে ত্যাগ করেননি। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর রামগোপাল প্রভৃতিরা একাডেমিক এসোসিয়েশনকে বাঁচিয়ে রাকার চেষ্টা করলেও খুব বেশীদিন তারা তা পারেনি। ক্রমশ তা সময়ের স্রোতে বিলীন হয়ে যায়। ফলে শিষ্যদল একসাথে হয়ে লিপি - লিখন - সভা (Epistolary Associcction) স্থাপন করেন, তাঁরাই আবার 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জন সভা' (Society for the Acquisition of General Knowledge) নামে একটি সভা স্থাপন করেন। রামগপাল ছিলেন এই সভার একজন উৎসাহি সদস্য। এই সভার সদস্যরা 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে যে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন রামগোপাল ছিলেন তার লেখকদের মধ্যে একজন। রাজনীতি ক্ষেত্রে সুবক্তা রূপে খ্যাত রামগোপাল ; দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাথে ইংল্যানহড থেকে আসা এক সুবক্তা জর্জ টমসনের (George Thomson) সাথনে পরিচয়ের সূত্রে সরাসরিভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৫১ সালে যখন একনকার ব্রিটিশ এসোসিয়েশন স্থাপিত হয় তখন তিনি তার কমিটির মধ্যে ছিলেন। রামগোপাল নানা স্থানে নান বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে সকলকে আবিষ্ট করে তুলতে থাকেন। তবে শুধু বক্তৃতার দ্বারাই নয় তিনি তাঁর লেখার সাহায্যেও রাজনৈতিক আন্দোলন সহায়তা করেছিলেন। Black Acts বা কালা আইনের ক্ষেত্রে দেশের পক্ষে কলম ধরায় কলকাতা বাসি ইংরেজরা তাঁর উপর চটে গিয়ে তাঁকে Aqrittorticuttural Society র সহকারি সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেয়। কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে নয় দেশের সমস্ত রকম ভালো অনুষ্ঠানে রামগোপাল ছিলেন উৎসাহদাতা। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনের বারান্দায় মআমতি হেয়ারের যে সুন্দর সাদা পাথরের মূর্তিটি আছে তাঁরই চেষ্টায় নির্মান করা হয়েছিল। বৃদ্ধ অবস্থায় বিষয়কাজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি দেশের সবরকম উন্নতির দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুদের কাছে তাঁর প্রায় ৪০,০০০ টাকা পাওনা ছিল ; মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি সেই সব ঋণের কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলে বন্ধুদের অঋণী করে দেন। ১৮৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

রসিককৃষ্ণ মল্লিক :

ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম রসিককৃষ্ণ মল্লিক ছিলেন রামতনু লাহিড়ীর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আনুমান ১৮১০ সালে কলকাতার সিন্দুরিয়া পটী নামের এক জায়গায় রসিকৃষ্ণের জন্মহয়। তাঁর বাবা ছিলেন নবকিশোর মল্লিক। সে কালের রীতি অনুযায়ী রসিককৃষ্ণ কিছুদিন গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়ে ও কিছুটা ইংরাজী শিখে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগদেবার পরে আরো অনেকের মতো রসিক কৃষ্ণ ও তাঁর দিকে আকৃষ্ট হলেন ও অন্যান্যদের মতই আত্মীয় স্বজনের হাতে নিগৃহীত হয়েও ডিরোজিওর দলে যোগ দিলেন। তাঁর পরিবার অনেক বুঝিয়েও যখন ডিরোজিওর দিক থেকে তাঁর মন ফেরাতে পারল না তখন, পাড়ার স্ত্রীলোকদের পরামর্শে তাঁর মন ফেরানোর জন্য তাঁর মা তাঁকে পাগলাগুঁড়ো খাওয়ালেন। হেয়ারের জীবনচরিতে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন যে, এই ওষুধ খেয়ে সমস্তরাত তিনি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন এবং সে অবস্থাতেই তাঁকে কাশী পাঠানোর জন্য পরিবার তোড়জোড় শুরু করল। নৌকা প্রস্তুত, তাঁর হাত পা বাঁধা এমন অবস্থায় জ্ঞান ফিরলে তিনি কোন ভাবে নিজেকে মুক্ত করে বাড়ি থেকে পালালেন ও তারপর চোরাবাগানে একটি বাসা নিলেন। সেই বাসা ডিরেজিওর দলের আড্ডা হয়ে দাঁড়ালো। লাহিড়ী মশাই ও অন্যান্যরা সবসময় সেখানে যেতেন ও সেখানে হিন্দু সমাজের নিয়মনীতি ধ্বংস করার নানা প্রকার পরামর্শ - পরিকল্পনা চলত। পরে জ্ঞানান্বেষণ নামে দ্বিভাষী পত্রিকা বের হলে রসিককৃষ্ণ তার সম্পাদক হন। কলেজ পাশ করে তিনি কিছুদিন হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করেন, তারপর ১৮৩৪ সালের পর যখন হিন্দু কলেজের কৃতিবিদ্য যুবকদের ডেপুটী কালেক্টরী পদ দেওয়া হতে লাগল তখন তিনি সেই পদ পেয়ে অনেকদিন বর্ধমানে বাস করেছিলেন। সেখানে বসবাসের সময় লাহিড়ী মশায়ের সাথে তাঁর সখ্যতা নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয় এবং রসিক কৃষ্ণ হয়ে ওঠেন তাঁর Guide - Philosopher and Friend. অণুমান ১৮৫৮ সালে অসুস্থ হয়ে রসিক কৃষ্ণ কলকাতায় আসেন, তখন তাঁর প্রিয় বন্ধু রামগোপাল ঘোষ তাঁকে তাঁর কামারহাটির বাগানবাড়িতে রেখেচিকিৎসা ও সেবা শুশ্রষা করালেও তাঁকে আর সুস্থ করা যায় নি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ইংরাজীশিক্ষার প্রতিষ্ঠা কাল ১৮৩৪ সাল হইতে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
30

১৮৩৩ সালে রামতনু লাহিড়ী হিন্দুকলেজ থেকে পাশ করে সেই কলেজেই এক ছোট শিক্ষকের কাজ পেলেন, যে পদের বেতন ৩০ টাকার বেশী ছিল না। এই বেতনেই তিনি নিজের ও ভাইদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, কাজ পাওয়া মাত্রই তাঁর বাসা নিরাশ্রয় ও আশ্রয়পার্থি ব্যাক্তিদের আশ্রয়স্থান হয়ে উঠল।

সামাজিকভাবে এই কাল ছিল ইংরেজিশিক্ষার প্রতিষ্ঠা কাল। প্রশ্ন উঠেছিল এদেশীয়দের কোন্ রীতিতে শিক্ষা দেওয়া হবে - প্রাচ্য কি প্রতীচ্য ? এই প্রশ্ন নিয়ে কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সদস্যদের মধ্যে বিবাদ লাগল কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেল না। ১৮৩৪ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক রামমোহ রায়ের বন্ধু মিষ্টার উইলিয়াম আডামকে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনের যুক্ত নিযুক্ত করলেন। তিনি নানা জেলা ঘুরে বিবরণ সংগ্রহ করতে লাগলেন। অপরদিকে গভর্ণর জেনারেলের প্রথম ব্যবস্থাসচিব রূপে নিযুক্ত হয়ে লর্ড মেকলে এসে হাজির হলে এদেশে। কোর্ট অব ডাইরেক্টরসদের ১৮১৩ সালে শিক্ষা সম্বন্ধীয় আদেশষ ইংরাজী শিক্ষা ইসম্বন্ধে খাটে কিনা জানার জন্য সেই পত্র মেকলের হাতে দেওয়া হলে মেকলে বিশেষ বিবেচনা করে ১৮৩৫ সালে ২রা ফ্রেব্রুয়ারী একটি যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য পত্র লিখলেন; যে পত্রের উপসংহারে লেখা ছিল -

"To sum up what I have said : I think it is clear that we are hot fettered by any pledge expressed or implied; that we are free to employ our fundes as we choose; the we ought to employ them to teaching what is best worth working; that English is better worth knowing then Sanskrit or Arabic; that the natives are desirer to be taught English and are hot desirous to be taught Sanskrit or Arabic ....."

এভাবেই মেকলের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে লর্ড বেন্টিঙ্ক কিছুটা সাহস পেলেন ও সে বছর ৭ই মার্চ এক বিধি প্রচার করে, এদেশীয়দের শিক্ষার জন্য কোর্ট অব ডাইরেক্টারদের সেই ১ লক্ষ টাকা কেবলমাত্র ইউরোপীয় সাহিত্য - বিজ্ঞান জন্য ব্যায় হবে এবং ইংরাজী ভাষাতেই সেই শিক্ষা দেওয়া হবে - এই আদেশ জারি করলেন। এই আদেশ প্রচার হওয়ায় কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষা পক্ষপাতীদের ধ্যে য বিবাদ চলছিল তা বিপ্লবে পরিণত হোল ও তা শেষে গিয়ে দাঁড়ালো ব্যাক্তিগত বিদ্বেষে।" এক সেলফ্ ইউরোপীয় গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমুদয় ভারতবর্ষ ও আরব দেশের সাহিত্যে তাহা নাই" - এই কথাটীর অপমানিত হলেন প্রাচ্য শিক্ষাপক্ষপাতীরা এবং কমিটির সভাপতি মি. সেক্সপিয়ার ও সেক্রেটারি মি. জেম্স্ প্রিন্সেপ পদত্যাগ করায় গভর্ণর জেনারেল মেকলেকে সে কমিটি সভাপতি রূপে বরণ করলেন। হিন্দু কলেজ থেকে সদ্য পাশ করা যুবকরা সম্পূর্ণ ভাবে মেকলেকে সমর্থন করে তার ধুয়া ধরলেন। নব্যবঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষাগুরুর হাতে শিক্ষিত নবীন যুবসমাজের দীক্ষা হয়েছিল - ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও এবং মেকলে। তিন জনই তাদের একই ধুয়া ধরিয়ে দিলেন - 'প্রাচীতে যাহা কিছু আছে তাহা হেয় এবং প্রতীচীতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়ঃ।' ডিরোজিওর মৃত্যুর পর একাডেমিক এসোসিয়েশন কে বাঁচানোর বহুচেষ্টা ডিরোজিওর অণুগামীদের তরফ থেকে করা হলেও তা বাচানো যায়নি। এরপর তাঁরা ইজেদের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

জগনোন্নতির জন্য নিজেদের মধ্যে একটি সার্কুলেটিং লাইব্রেরী, একটি এপিষ্টোলারি এসোসিয়েশন ইত্যাদি তৈরী করার চেষ্টা করলেও কোনটাই খুব দীর্ঘকালীন সময় ধরে টিকিয়ে রাখা যায়নি। এমন অবস্থায় একটা সভা স্থাপন জরুরী বোধ করে তাঁরা ১৮৩৮ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারী একটি অনুষ্ঠান পত্রবের করলেন। উদ্যোক্তা হিসেবে ছিলেন তারিনীচরণ বঁভুজ্যে, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও রাজকৃষ্ণ দে। সংস্কৃত কলেজের হলে ১২ই মার্চ উক্ত সভার অধিবেশন হোল। সে সভাতে সভাপতি হলেন তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তি। স্থাপিত হোল "Society for the Acquistion of General Knowledge" অর্থাৎ 'জ্ঞানার্জ্জন সভা' ১৮৩৪ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যার অবস্থা জানার জন্য সে সময়ের কিছু বিশিষ্ট ব্যাক্তিকে নিয়ে এক কমিশন গড়ে তুললেন। সুবিখ্যাত রামকমল সেন ছিলেন কমিশনের একজন সদস্য। অবশেষে এদেশীয়দের ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটা মেডিক্যাল কলেজ খোলা দরকার এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল। ডাক্তার ব্রাম্‌লি (Dr. Bramley) এর প্রথম অধ্যক্ষ হন এবং তাঁরমৃত্যুর পর ১৮৩৭ সালে মহামতি হেয়ার হন সম্পাদক। হেয়ারের প্রেরণাতেই তাঁর ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত প্রথম মৃতদেহব্যবচ্ছেদ করার জন্য এগিয়ে যা। তৎকালী সমাজে একাজটা মোটেও কোন সহজ কাজ ছিল না। নব্যবঙ্গের নেতারা মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদকারী ছাদ্রদের রীতিমত উৎসাহ দিয়ে এই তুন স্থাপিত কলেজকে সবল করতে লাগলেন। এই সময়ে আরো কিছু শুভঅনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। যেমন -

(১) ১৮৩৪ সালে শহরের বড় বড় ইংরেজ ও বাঙালী ভদ্রলোরা একসাথে হয়ে টাউনহলে রাজা রামমোহন রায়ের জন্য একটি সভার আয়োজন করেন; যেখানে অন্যতম বক্তা ছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক।

(২) ১৮৩৬ সালে কলকাতাবাসী ইংরেজি আর ভদ্রলোকদের সাহায্যে স্থাপিত হয় এখনকার "কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী"।

(৩) ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন।

(৪) বাঙলা পাঠশালা স্থাপন।

(৫) মেকানিকাল ইনস্টিটিউট নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপনা করা।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

32

এই সময়ের সবথেকে বড় ও প্রধান ঘটনা হোল 'মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান'। এই ঘটনাটির ফলে বাঙালী দেশে একটা নবযুগের সূচনা হোল। সময়টা ১৮৪২ সাল। এই কালের শুরুতে সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর ভাগ্নে চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ও ব্যাক্তিগত সচিব পরমানন্দ মৈত্রকে নিয়ে বিলেত যাত্রা করলেন। তাঁর বিলেতে যাওয়ার পর এপ্রিল মাসে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র সবাই একজায়গায় হয়ে। বেঙ্গল স্পেক্টেটর

(Bengal Spectator) নামে একটি দুভাষার সংবাদপত্র বার করতে শুরু করলেন। প্রথমে মাসিক ও পরে সাপ্তাহিকে পরিণত য়। এই বছরতি সারা বাংলা দেশের কাছে চিরসমরনীয় একটি খারাপ বছর। মআমতি হেয়ার হঠাৎই ওলাউঠা রোগে আক্রন্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রিয় ছাত্র মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা সুযোগ্য ডাক্তার প্রসন্নকুমার মিত্র অনেক চেষ্টা করেও তাঁর প্রাণরক্ষা করতে পারলেন না। ১৮৪২ এর ১ লা জুন সন্ধে হওয়ার কিছু আগে তিনি চলে গেলেন।এই কবর প্রচার হলে ঘরে ঘরে কান্না হায় হায় রব উঠল। হিন্দু সমাজের শীর্ষ স্থানীয় রাধাকান্ত দেব থেকে স্কুলের ছোত ছোট বালক কেউ আসতে বাকি ধাকল না। খ্রীষ্টীয় ধর্মে বিশ্বাসহীন হেয়ারকে, তাঁরই দেওয়া ও হিন্দুকলেজের সাথে যুক্ত মাটিতে সমাধিস্থ করা হোল। মুষলধারে বৃষ্টি, ঝড় আর বাঙলাভরা শোকের বন্যায় হেয়ার চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন। হেয়ারের শোকে রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল প্রমুখরা অস্থির হয়ে উঠল। বেঙ্গল স্পেক্টেটরে হেয়ারের জন্য শোক প্রকাশ করে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন বসানোর প্রস্তাব করলেন। সেই অনুযায়ী ১৭ই জুন মেডিকভাল কলেজে সেই সভার অধিবেশন হোল। হেয়ারের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য কমিটি তৈরী হোল রামগোপাল ঘোষ ছিলেন সেই কমিটিতে এবং সেই কমিটির চেষ্টাতেই হেয়ারের সুন্দর সাদা পাথরের মূর্তি তৈরি করে হিন্দু কলেজে বসানো হোল। এই বছরের শেষে দ্বারকানাথ ফিরে এলেন; সাথে নিয়ে এলেন সুবক্তা - তেজস্বী - সুপ্রসিদ্ধ জর্জ টমসনকে। তাঁর আমায় নব্য বঙ্গের মধ্যে দেখা গেল আনন্দের স্রোত। নানা স্থানে তিনি বক্তৃতা দিতে লাগলেন এবং সবশেষে কলকাতার ফৌজদারী বালখানা নামের একজায়গায় একটি বাড়ীতে তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ হোল। তাঁর বাগ্মীতার ফলাফলে কলকাতায় স্থাপন করা হোল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইতি। শিক্ষিত যুবকরা মেতে উঠল; রামতনু লাহিড়ীও ছিলেন তাঁদের সাথে। ১৮৪৩ সাল বাঙলা দেশের ইতিহাসে স্মরীয় হয়ে আছে আরো একটা কারণে, তা হোল - এই সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষীত হন ও ব্রাহ্মসমাজকে নতুন জীবন ও নতুন শক্তি দেন। সমস্ত দেশের শিক্ষিতরা যখন পশ্চিমের শিক্ষায় নিজেদের জীবনকে ভরাতে চাইছিল, সে সময় তিনি এদেশের প্রাচীন জ্ঞানের দিকে মুখ ফেরালেন। বেদ বেদান্তের আলোচনার জন্য তত্ত্ববোধনী সভা ও তত্ত্ববোধনী পাঠশালা স্থাপন করলেন। সে সময়ে দেশের শিক্ষিত সমাজের গতিপথ ছিল ছিন্তার বিষয়। ডিরোজিওর স্বাধীন চিন্তার স্রোতে প্রবাহকে সঠিক ধারায় বইয়ে না দিতে পারার অক্ষমতার মাসুল গুণতে হয়েছিল সমকালকে।

১৬ - ১৭ বছরের বালকের কাছে মদ্যপান ও গো মাংস খাওয়াটাই স্বাধীন চিন্তা ও সমাজসংস্কারের পথ বলে মনে হোল। একদিকে যুবকদের মধ্যে দেশীয় রীতির বিরুদ্ধা আচরণ ও অন্যদিকে হিন্দু কলেজে রিচার্ডসন সাহেবের সেক্সপীয়ার পড়ানো - তাঁর মুখে সেক্সপীয়ার শুনে ছাত্ররা সেক্ষপীয়ারের মতো কবি নেই, আর ইংরাজী সাহিত্যের মতো

টিপ্পনী

সাহিত্য নেই; এই জ্ঞানেই বেড়ে উঠছিল এবং ধীরের ধীরে নিজের জাতির প্রতি বিদ্বেষ অনেক বালকের মনের মধ্যেই দৃড় আকার ধারণ করছিল। এ সময় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক ডফ্ ধর্মপ্রচারের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। কিছু ভদ্রঘরের ছেলে ধর্ম পরিবর্তন করলে আন্দোলন শুরু হয় ও হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় কিন্তু সেটি স্থায়ী হয়নি। এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে লাহিড়ী মশাবের ব্যাক্তিগত জীবনে নেমে আসে চরম শোক। তার দাদা কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পর তিনি তৃতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁর প্রথম পত্নী ৪ / ৫ বছরের বেশী বাঁচেননি। দ্বিতীয় স্ত্রীর বাবা তাঁর মেয়েকে তাঁর স্বামীর কাছে পাঠাতে চাইতেন না ; উপরন্তু ৩ / ৪ বছরের মধ্যে পত্নী ও মারা যান। তৃতীয়বার রামতনু মশাই সাঁতরাগাছি গ্রামের স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর চৌধুরীর ছোট মেয়ে বিয়ে করেন এবং সংসার ধর্ম পালন করেন। তাঁর মা কঠিন অসুখে অসুস্থ হলে রামতনু তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং খাওয়া - ঘুম ভুলে তাঁর সেবা করতে থাকলেও তাঁকে সুস্থ করতে পারেননি। কলকাতা শহরেই তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮৪৬ সালের শুরুতে কৃষ্ণনগর কলেজ খোলা হলে লাহিড়ী মশাই তাঁর দ্বিতীয় শিক্ষক রূপে যোগ দেন। কৃষ্ণনগরে ফেরার সময় তাঁর যৌবন সুহৃদগণের দেওয়া প্রীতির চিহ্ন হিসাবে পাওয়া ঘড়িটি তিনি মহামূল্যবান সম্পত্তি মনে করে সারাজীবন যত্ন করে রক্ষা করেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন ১৮৪৬ - ১৮৫৩ পর্যন্ত

১৮৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী মহাসমারোএ খোলা হোল কৃষ্ণনগর কলেজ। সে সময় মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই নতুন প্রতিষ্ঠিত কলেজেদর উৎসাহদাতা হলেন এবং নিজের পুত্র সতীশচন্দ্রকে কলেজে পড়তে দেবার বিষয়ে মনস্থির করলেন। ডি. এম. রিচার্ডসন সাহেব ছিলচেন কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ এবং লাঈড়ী মশাই ১০০ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হলেন। পড়ানোর ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহ, অনুরাগ ও তন্ময়তা তাঁকে ছাত্রদের প্রিয় করে তুলেছিল। ডিরোজিওর মতো তিনিও কলেজ ছুটির পরে বালকদের সাথে কখনো কথাবার্তায়, কখনো বা খেলায় সময় কাটাতেন। এভাবে শুরু হোল তাঁর কষ্ণনগরে শিক্ষকতার কাজ। এই সময় দুদিক থেকে দুরকম স্রোত কৃষ্ণনগরে প্রবাহিত হতে থাকল। - রামতনু লাহিড়ীর ছোটভাই শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী নিজের বাড়িতে একটি অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় খুললেন। আর অণ্যদিকে কলকাতার অণুকরণে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন ও ধর্মসভাও স্থাপিত হোল। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র দাঁড়িয়েছিলেন মাঝখানে ; অর্থাৎ সমস্ত হিন্দু সমাজ ও নবদ্বীপের পন্ডিতরা তাঁর পিছনে যেহেতু ছিল, তাই তিনি সম্পূর্ণভাবে বেদান্ত ধর্মের মুখপাত্র হতে পারলেন না কিন্তু উৎসাহদান - অণুরাগ - আদর - শ্রদ্বার সাথে তাঁদের পাশে থাকলেন। কৃষ্ণনগরে এই ব্রাহ্মধর্মের বীজ পুঁতেছিলেন ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়। লাহিড়ী মশাই যে

কৃষ্ণনগরে এসেই তাদের সঙ্গে মিশে গেলেন তা কিন্তু একেবারেই নয়। ১৮৪৫ সালে উমেশচন্দ্র সরকারের আন্দোলন এগোতে থাকলে কলকাতার ব্রাহমসমাজ নিজের ধর্মকে - বেদান্ত ধর্ম ও বেদকে ভ্রান্তি হীন ঈশহবরের বাণী বলে ঘোষণা করতে থাকে এবং অন্যদিকে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি কটুক্তি করতে থাক। এই দুটি কাজই ডিরোজিওর শিষ্যদলের কাছে অনুচিত কাজ বলে বোধ হয়েছিল। লাইড়ী মশায়ের কাছে, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের বেদকে অভ্রান্ত বলাক্টা মিথ্যা ও খ্রীষ্টধর্মের নিন্দা করাটা উদারতাহীন কাজ বলে মনে হওয়ায় তিনি তাঁদের সাথে যুক্ত হননি; এমনকি তাঁদের পত্রিকা 'তত্ত্ববোধনী' নিতেও অস্বীকার করেন। রাজনারায়ন বসুকে লেখা চিঠিতে এই তথ্যের প্রমাণ মেলে। লাহিড়ী মশাই নবোদিত ব্রাহ্মধর্মের সাথে যোগ না দিলেও তাঁর আবির্ভাবে কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে এক নতুন ভাব এল। শিক্ষাগুরু ডিরোজিওর কাছে যে মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন তার মধ্যে প্রধান ছিল - মানুষের চিন্তা ও কাজকে স্বাধীন রাখতে হবে - রামতনুও সেই বিষয়টিকে সারা জীবন মেনে চলেছিলেন, সেই শিক্ষাই তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।সেই সময় কিছুদিন ধরে কৃষ্ণনগরে বিধবা বিবাহ বিষয়ে নানা ধরণের আলাপ আলোচনা চলছিল। বিদ্যাসাগর মশায়ের আগেই এই বিষয়টি নিয়ে ১৮৪২ সালে রামগোপাল ঘোষরা তাঁদের 'কোলে স্পেক্টেটারে লেখালিখি করেছিলেন। বিধবা বিবাহ চালু করা যে ভীষণ জরুরী এই বিশ্বাস ১৮৪৩ সাল থেকে চক্রবর্তী ফ্যাকশনের সদস্যদের মনের মধ্যে গেঁথে যায়। রাজা শ্রীশচন্দ্র নিজে নবদ্বীপের পন্ডিতদের সাথে বিধবা বিবাহ বিষয়ক বিচারে মেতেছিলেন। সে সময় হঠাৎই পরপর ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার ভুলবিচারের ফলস্বরূপ লাহিড়ী মশায়ের শিষ্যদের ওপর গোমাংস খাওয়ার মিথ্যা অভিযোগ উঠল এবং গো হত্যার আন্দোলনে সামাজিক ভাবে নির্যাতিত বোধ করলেন লাহিড়ী মশায়। এসময় তাঁর প্রথম শিশুপুত্রের এক দূর্ঘটনায় মৃত্যু হলে আত্মীয় স্বজন সে ঘটনাকে বিধাতার অভিশাপ বলে উল্লেখ করে তাঁর মানসিক অশান্তি আরো বাড়ীয়ে দিল - এসব কারণে ১৮৫১ সালে মার্চ মাসে বদলীর আর্জি জানিয়ে তিনি বর্ধমানে বদলী হয়ে যান। কৃষ্ণনগরে যখন এসব ঘটনা ঘটছিল তখন কলকাতায় এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি ও গভর্ণর জেনারেলের মন্ত্রীসভার অন্যতম বিশেষ ব্যাক্তি জ্রিঙ্কওয়াতার বীটন বা বেথুন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা চালু করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি হয়েই তিনি এদেশীয়দের কল্যাণ কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। এসময় বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ পন্ডিতদের সাথে তাঁর পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মানো তিনি তাঁদের সাহায্যে ও দেশের ভদ্রলোকেদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি করতে ব্রতী হন। ১৮৪৯ সালের ৭ই মে দিবসে নিজের নামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর বহুদিন আগে থেকেই বাঙলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা চলছিল - ১৮১৭ তে স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছিল ছেলেদেদর সাথে সাথে মেয়েদের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

শিক্ষ দান বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সদস্যদের মধ্যে মতভেদ হয়। সোসাইতির অধীনে থাকা কোন কোন পাঠশালায় এলেদের সাথে সাথে মেয়েদের শিক্ষাদেবার রীতিও প্রবর্তন করেন। কিন্তু এভাবে ছেলেদের সাথে সাথে মেয়েদেরকেও শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি অনেক সদস্যেরই পচ্ছন্দের হোল না। এবিষয়ে যে বিচার সামনে এল তার ভিত্তিতে একটি সভা স্থাপন করা হোল, যার নাম - "Female Juvenile Society" এই সভার মহিলা সদস্যরা একসাথে নানা জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে প্রবৃত্ত হলেন। রাধাকান্ত দেব হলেন এঁদের উৎসাহ দাতা ও নিজে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক'নামে একটি বই রচনা করে তাঁদের হাতে দিলেন। ১৮২১ সালে স্কুল সোসাইটির কিছু মহিলা সদস্যের প্ররোচনায় ইংল্যান্ডের British ad Fereigh School Society - র সদস্যরা কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করে কুমারী কুক নামে (Miss Cooke) একজন শিক্ষিতা মহিলাকে এদেসে পাঠালেন। তিনি তাঁর চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই নানা স্থানে ১০ টি বিদ্যালয় স্থাপোন করলেন এবং কমপক্ষে ২২৭ জন বালিকা পড়াশোনা করতে লাগল। এভাবে দুবছর কাজ করার পরে তিনি উইলসন নামের এক মিশনারী সাহেবের সাথে বিবাহ সূত্রে সংযুক্ত হওয়ায় আর আগের মত সময় দিতে পারতেন না। এ অবস্থায় কিছু ভদ্র ইংরেজ মহিলা সমবেত হয়ে তখনকার গর্ভনর জেনারেল লর্ড আর্মহাষ্টের স্ত্রি লেডী আর্মহাষ্টকে নিজেদের সভানেত্রী করে স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি করতে বেঙ্গল লেডিস্ সোসাইটি (Bengal Ladies Society) নামে একটি সভা স্থাপন করলেন। এই সভার মহিলা সদস্যদের উৎসাহ ও যত্নে নানা জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন হতে লাগল। এই সোসাইটি বহুবছর কাজ করল। ১৮৩৪ সালে আডাম সাহেব বাঙলাদেশে শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তাতে কলকাতা ছাড়া শ্রীরামপুর, বর্ধমান - কালনা - কাটোয়া - কৃষ্ণনগর- ঢাকা-বাখরগঞ্জ - চট্টগ্রাম - মুরশিদাবাদ ও বীরভূম প্রভৃতি নানা জায়গায় ১৯ টি বালিকা বিদ্যালয় ও প্রায় ৪৫০ টি বালিকার উল্লেখ মিলেছে। কিন্তু এইসব বালিকা বিদ্যালয়ের বেশীরভাগটাই খ্রীষ্টীয় মহোলাদের দ্বারা স্থাপিত ও খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচর কাজের সাথে যুক্ত ছিল। বেথুন সাহেবই প্রথমে সাম্প্রদায়িক ধর্ম শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেথুনের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পরে বারাসাত কৃষ্ণনগর প্রভৃতি মফঃস্বলের আরো নানা জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হতে লাগল। এই স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন নিয়ে কলকাতার হিন্দু সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থাপিত হোল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রী শিক্ষার বৈধতা প্রমাণের জন্য যে শুধুমাত্র বই লিখলেন তা নয় নিজের মেয়েকেও নতুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ভর্তি করিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখরা নিজের বাড়ীর মেয়েদেরও পাঠাতে লাগলেন বিদ্যালয়ে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাঙ্গ করে লিখলেন -

"যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে;/ এ বি শিখে, বিবী

সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে ; / আর কিছুদিন থাকরে ভাই ! পাবেই পাবে দেখ্‌তে পাবে, / আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

বেথুনের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন হওয়াতে যেমন সমাজের মধ্যে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন উপস্থিত হোল এবং তিনি শিক্ষিত দলের প্রিয় হলেন, তেমনি রাজনীতি বিষয়ে একটি মহাআন্দোলন উঠল, তাতে তিনি তাঁর স্বদেশীয়দের অপ্রিয় হলেন।

১৮৫১ সালেরই অপর একটি ঘটনা হোল লাইড়ী মশাই তাঁর পৈতা ত্যাগ করলেন। এঘটনায় তাঁকে নানা প্রকার সমস্যায় পড়তে হোল ঘরে ও বাইরে। হিন্দু সমাজ দলবদ্ধ ভাবে তাঁকে ত্যাগ করলেন। সেই সময় তাঁর দ্বিতীয় শিশুপুত্র জন্মালে বাড়ীতে কাজের জন্য লোক মিললো না। বর্ধমান থেকে তিনি এলেন বালি - উত্তরপাড়া ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার হয়ে। সময়টা ১৮৫২। এখানে এসে তাঁর সামাজিক যন্ত্রণা কিছুটা কম হোল। তাঁর কলকাতায় বসবাসকারী বন্ধুরা তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতে লাগলেন, এঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। পৈতা ত্যাগ করে তিনি যখন নির্যাতন ভোগ করছিলেন তখন শুধুমাত্র তাঁর আত্মীয় স্বজনরা নয় তাঁর শিক্ষিত বন্ধুরা তাঁকে আবার পৈতা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলোও তিনি সে কথ কানে তোলেন নি। লাহিড়ী মশাই যখন উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক তখন কলকাতা সমাজের নতুন কাল চলছে। চারিদিকে ইংরেজী শিক্ষা ও স্ত্রী শিক্ষার প্রসার লাভ করেছে ল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মশায়ের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ নতুন শক্তিরূপে নিজেকে প্রকাশ করছে এবং ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত বর্তমান গদ্য সাহিত্যের সূচনা করছেন।

টিপ্পনী

অক্ষয়কুমার দত্ত :

ইংরাজীর ১৮২০ সালের ১ লা শ্রাবণ নবদ্বীপের চুপী গ্রামে অক্ষয়কুমারের জন্ম। বাবা পীতাম্বর দত্ত, কাজের সূত্রে কলকাতার কাছে খিদিরপুর নামে এক জায়গায় বাস করতেন। ৭ বছর বয়সে পাঠশালায় পড়া শুরু করে, বছর ১০ বয়সে তিনি চলে আসেন তাঁর বাবার কাছে ও সে সময়ের প্রচনীতি রীতি অণুযায়ী অভিভাবকরা তাঁকে পারসী ভাষায় সুশিক্ষিত করতে চাইলেও তাঁর মন ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হোল। তিনি ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আকুল হলেন ও অবশেষে নিজে থেকেই খিদিরপুরে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলে চিন্তিত অভিভাবকরা তাঁকে কলকাতায় রেখে গৌরমোহন আঢ্যের 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' স্কুলে ভর্তি করে দেন। তখন তাঁর বয়স ১৬। কিন্তু বাবার অকাল মৃত্যুতে মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব এসে পড়ায় তাঁকে পড়া শোনা ছাড়তে হয়। সে সময় কঠিন জীব সংগ্রামের সাথে সাথে বন্ধুদের কাছ থেকে বইপত্র সংগ্রহ করে তিনি পড়াশোনা করার চেষ্টা চালালেন। এই সময় তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা

টিপ্পনী

করতে শুরু করেন। কিছুদিন অত্যন্ত দারিদ্রতা ও অভাব ভোগ করে ১৮৪০ সালে তত্ত্ববোধনী সভা স্থাপিত ত্ত্ববোধিনী পাশালা ও ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষকতার কাজ লাভ করেন। ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হলে ইনি এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। তত্ত্ববোধিনীর সাথে এই যোগাযোগই তাঁর যাবতীয় উন্নতির মূলকারণ। আয় ও জ্ঞান দুয়ের পথেই খুলে গেল। এসময় তিনি কিছুদিন মেডিকেল কলেজের অতিরিক্ত ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা করে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি পদোন্নতি ও অর্থের বাসনা ত্যাগ করে নিজের ও দেশীয়দের জ্ঞানের উন্নতির সাধনায় ব্রতী হন। তত্ত্ববোধিনী বাঙলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হয়ে ওঠে। এর আগে দেশীয় সংবদপত্রের মান ও রুচি সেভাবে বিকাশ লাভ করেনি কিন্তু তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত বাঙলা ভাষায় গভীরভাবের রচনা দেশীয় সংবাদপত্রের মান বৃদ্ধির সহায়তা করল। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন। আগে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম ছিল বেদান্তধর্ম। ব্রাহ্মরা বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করতেন। অক্ষয় দত্ত মশাই এই দুইয়ের প্রতিবাদ করে বিচার করেন। বলা যায়, তাঁরই প্ররোচনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দুই বিষয়ে গভীর চিন্তা ও শাস্ত্র অনুসন্ধানে রত হন।

১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু অণুসন্ধান ও চিন্তার পরে অক্ষয়বাবু মতকে যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করেন বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদকে ত্যাগ করেন। তাঁর সাহায্যে 'ব্রাহমধর্ম' নামে একটি বই সংকলিত হোল; এটি মহর্ষির ধর্ম জীবনের পরিণত চিন্তার ফসল। এর মধ্যে নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি কিছুদিন সেখানে শিক্ষকতা করেন। ১৮৫৫ সালের আষাঢ় মাসের এক সন্ধে বেলা ব্রাহমসমাজে উপাসনার সময় হঠাৎই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। অনেক যতনে তাঁর জ্ঞান ফেরে এর দিন দুই পরে তত্ত্ববোধিনীর জন্য একটা প্রবন্ধ লেখার সময় হঠাৎ মাথায় এক ভয়ানক জ্বালা অনুভব করে তিনি লেখা থামাতে বাধ্য হলেন; সেই থেকে তিনি আর কখনো লিখতে পারেননি। আশ্চর্য ছিল তাঁর কাজের ক্ষমতা, আশ্চর্য ছিল জ্ঞানের তেষ্টা। প্রায় জীবন্মৃত অবস্থায় থেকেও মুখে মুখে নির্দেশ দিয়ে তাঁর সুবিখ্যাত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইটি সংকলন করেন। জীবনের শেষ সময় তিনি বালি গ্রামের গঙ্গার তীরবর্তি একটি বাগানবাড়িতে থেকে এই ভাবে মুখে মুখে নির্দেশ দিয়ে নানা বই রচনায় ব্যাস্ত ছিলেন। ১৮৮৬ সালের ১৪ই জৈষ্ঠ্য তাঁর দেহান্ত হয়।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

38

রাজেন্দ্র দত্ত :

সুপ্রসিদ্ধ অক্রূর দত্তএর পরিবারে ১৮১৮ সালে এঁর জন্ম। অল্পবয়সে তাঁর বাবা পার্বতীচরণ দত্ত এর মৃত্যু হলে তাঁর বড় জ্যাঠামশাই দূর্গাচরণ দত্ত তাঁর অভিভাবক হন।

হিন্দু কলেজে পড়ার সময় রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যদের সাথে তাঁর পরিচয় ও সুসম্পর্ক হয়। হিন্দু কলেজ থেকে পাশ করে তিনি কিছুদিন মেডিকেল কলেজের অতিরিক্ত ছাত্র হিসাবে সেখানকার উপদেশ শোনেন এবং সেই সময় থেকেই চিকিৎসা বিদ্যার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ তৈরী হয়। চিকিৎসার মাধ্যমে মানুষের উপকার করবেন এমন সংকল্প ওনেন মনে মনে। বিষয় কাজে যুক্ত থেকেও তিনি তাঁর সংকল্পকে ভোলেননি। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়ের সাথে মিলে নিজের বাড়িতে একটি এলোপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করে দীনজনের চিকিৎসা ও ওষুধ দিতে থাকেন। একাজ করতে করতেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দিকে তাঁর মন আকৃষ্ট হোল। সেই সময় কিছু সুবিখ্যাত ইউরোপীয় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এদেশে এলেন ও তাঁদের মধ্যে Dr. Tronere এর তত্ত্বাবধানে রাজেন্দ্র দত্ত একটি হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল স্থাপন করে হোমিওপ্যাথির প্রচারে রত হলেন। এছাড়াও অনেক আর্থিক ক্ষতি মেনে নিয়েও তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপন করেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিকে Dr. Berighy কে নির্ভর করে হোমিওপ্যাথির প্রচার ও পরোপকার ব্রতী হন। এই ব্রতে রত থেকে ১৮৮৯ সালে জুন মাসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৮৫৪ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টাররা শিক্ষাবিষয়ক একটি আদেশে ডাইরেক্টাররা ভরতীয়দের শিক্ষা দেওয়া একটি পালনীয় কাজ বলে নির্দেশ দেন, এবং শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে সমস্ত উপায়গুলিকে মানতে নির্দেশ দেন তা হোল -

(১) শিক্ষা বিভাগ নামে রাজকার্যের একটি আলাদা বিভাগ তৈরী করা।

(২) প্রাদেশিক রাজধানীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

(৩) নানা স্থানে নর্মাল স্কুল স্থাপন।

(৪) সে সময়ের গভর্ণমেন্ট স্থাপিত স্কুল ও কলেজগুলোকে সংরক্ষণ ও তাদের সংখ্যা বাড়ানো।

(৫) মিডলস্কুল নামে কিছু নতুন শ্রেনীর স্কুল স্থাপন।

(৬) বাঙলা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও বাঙলা শিক্ষার উন্নতি ঘটানো।

(৭) প্রজাদের স্থাপিত বিদ্যালয়ে সাহায্য - দান প্রথা চালু করা।

১৮৫৮ সালে ভারত মহারাণীর শাসনে এলে যখন স্টেট সেক্রেটারির পদ সৃষ্টি করা হোল, তখন ডিরেক্টরদের এই প্রণালীকে আবার প্রতিষ্ঠিত করা হোল। এই আদেশপত্রকে এদেশীয় শিক্ষাক্ষেত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি বলে নির্দিষ্ট করা যায়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

নবম পরিচ্ছেদ : বিদ্যাসাগর যুগ - সিপাহী বিদ্রোহেদর সংক্ষিওপ্ত ইতিবৃত্ত; বঙ্গে নীলের হাঙ্গামা। রঙ্গালয়ের সূচনা।

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর :

রাজা রামমোহন রায় যেমন শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যাক্তিদের আদর্শ রূপে বিবেচিত হতেন, তেমনি একসময় বিদ্যাসাগর সেই জায়গা অধিকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রের তেজ ও দৃঢ়তার দিয়ে তিনি বাঙলাদেশের ভেতরকার ইতিহাস তৈরীতে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সবচেয়ে প্রধান পুরুষ হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে, ১৮২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র এঁদের প্রথম সন্তান। তাঁর পিতা প্রায় ১৫ বছর বয়স থেকেই ভীষণ দারিদ্র্যে বাস করে জীবন সংগ্রাম আরম্ভ করেন, ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনেও এর খুব একটা হেরফের হয়নি। ছোটবেলায় গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন পড়াশোনা করে তিনি কলকাতায় আসেন বাবার সাথে বাস করতে থাকেন। কলকাতায় আসার পরে কিউ মাস পাঠশালায় পড়াশোনা করার পর তাঁর বাবা তাঁকে ভর্তি করে দেন সংস্কৃত কলেজে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভা সকলের চোখে পড়ল ও ছয়মাসের মধ্যেই তিনি মাসিক ৫ টাকা বৃত্তি পেলেন। সেই বৃত্তির সাহায্যেই তিনি তাঁর পড়াশোনা চালাতে লাগলেন। ১৮৪১ সালে তিনি কলেজ থেকে পাশ করে বিদ্যাসাগর উপাধি পেয়ে ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের প্রধান পন্ডিতের পদ পেলেন। এই পদ পাওয়ার পর তিনি বাড়ীতে বসে ইংরাজী শিখতে আরম্ভ করেন এবং অচিরেই এই ভাষাতেও অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। বিদ্যাসারগর মশায়ের মনের মধ্যে আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছে ছিল প্রবল। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় মশাই অবসরকালে বিদ্যাসগরের কাছে সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেন। তাঁকে সংস্কৃত শেখাতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের মনে নতুন প্রণালীকে সংস্কৃত পড়ানোর চিন্তা আসে, সেই চিন্তা থেকেই পরবর্তীকালে উপক্রমণীকা ও ব্যকরণ - কৌমুদীর সুত্রপাত হয়েছিল। ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজে তিনি এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদ পান। কিন্তু অধ্যক্ষ রসময় দত্তের সাথে মতবিরোধে তিনি সেই পদ ত্যাগ করেন। ১৮৫০ এ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ৮০ টাকা বেতনের কেরাণীর কাজ গ্রহণ করেন এবং ঐ সলেই সংস্কৃত কলেজে তিনি সাহিত্যাধ্যাপকের পদ পান ও সেই পদ থেকে ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসে কলেজের অধ্যক্ষের পদ পান। এই পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েই তিনি যে সমস্ত সংস্কার কাজে হাত দেন তা হোল -

(১) প্রাচীন সংস্কৃত বইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও মুদ্রণ।

(২) সমস্ত জাতির ছাত্রদের জন্য কলেজে অবাধ পাঠাধিকার প্রদান।

(৩) ছাত্রদের থেকে বেতন নেওয়ার রীতি চালু করা।

(৪) উপক্রমিকা, ঋজুপাঠ প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী বই চালু করা।

(৫) ২ মাস গ্রীষ্মের ছুটির ঘোষণা।

(৬) সংস্কৃতের সাথে ইংরাজী শিক্ষা চালু করা।

টিপ্পনী

এরপর দিনের পর দিন তাঁর খ্যাতি - প্রতিপত্তই পোদ এই তিনই বাড়তে লাগলো। ১৮৪৭ এর তাঁর বেতাল পঞ্চবিংশতি ছাপা ও প্রচারিত হোল; যার সাহায্যে বাংলা গদ্য সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হোল। ১৮৪৮ এ 'বাঙ্গলার ইতিহাস', ১৮৫০ - এ জীবনচরিত; ১৮৫১ - য় 'বোথোদয়', 'উপক্রমণিকা', 'শকুন্তলা', ও বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব প্রকাশ পেল। ১৮৫৬ সাল ছিল তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। এই সময় বিধবা বিবাহের প্রতিপক্ষদের আপত্তি খন্ডন করার জন্য বই প্রকাশ, বিধবাবিবাহ চালু করার জন্য সরকারি বিধি চালুর চেষ্টা, বিধবাবিবাহের আয়োজন সব কিছুতেই তাঁকে যুক্ত থাকতে হোল। অণ্যদিকে, শিক্ষাবিভাগে স্কুল পরিদর্শকের পদ পাওয়ার পর তিনি কয়েকটি জেলায় বালকদের সাথে সাথেই বালিকাদের জন্যও বিচ্যালয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হলে তাঁর সাথে ডিরেক্টর মিষ্টার গর্ডন ইয়ংয়ের ঘোর সমস্যা তৈরী হয়। কিন্তু স্ত্রী শিক্ষার চালু করার কাজে কায়মন সমর্পন করা বিদ্যাসাগর কোনভাবেই পিছু হটলেন না। ১৮৫৬ সালে তাঁর অণ্যতম বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মশাই বিধবাবিবাহ করলে বাঙলা উত্তেজনা উঠল চরমে। বিদ্যাসাগরের প্রাণনাশের চেষ্টা হতে থাকল। এই সব পরিশ্রম ও সংগ্রামের দিনগুলোতে যে কয়েকজন বন্ধু তাঁকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়েছিলেন রামতনু লাহিড়ী তার মধ্যে একজন। উত্তরপাড়া থেকে বদলী হয়ে তিনি তখন বারাসাত স্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন। কলকাতায় যাতাযাত ও বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ ছিল নিয়মিত। বারাসাতের স্কুলেও তিনি তাঁর কর্তব্য পরায়ণতার ছাপ রেখেছিলেন। তিনি যখন বারাসতে আছেন, তখন অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে মিউটনি বা বিদ্রোহের পরিবেশ তৈরী হয় সমস্ত দেশ জুড়ে। ঐ সালের শুরুতে গভর্ণমেন্ট সৈণ্যবিভাগে এক ধরণের নতুন বন্দুকের প্রচলন করবেন বলে ঠিক করেন। সেই বন্দুকের গুলিপূর্ণ টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে পুরতে হয়। প্রচারিত হয়ে গেল, ঐ টোটা গো চামড়া ও শূকর চামড়া দিয়ে তৈরী হয়েছে, হিন্দু ও মুসলিম সেপাইদের ধর্মনাশ করার চামড়া দিয়ে তৈরী হয়েছে, হিন্দু ও মুসলিম সেপাইদের ধর্মনাশ করার জন্য। এই গুজবে ক্ষেপে উঠল সৈণ্য দল ও তারা সরাসরি বিদ্রোহ করল। সেই বিদ্রোহ আগুনের মতো ছড়াতে লাগলো এবং বাঙলা ছাড়িয়ে দিল্লী, মিরাট, ফৈজাবাদ, বিঠুর, জাসী, নানান সর্বত্র ছড়ীয়ে পড়তে লাগল। নানা সাহেব, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া টোপী প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সিপাহী বিদ্রোহের আগুণে দেশীয় সৈণ্যের হাতে ইংরেজ পুরুষ - স্ত্রী - বালক - বালিকা খুন হোল এবং অপরদিকে প্রতিশোধে শত শত দেশীয় হতাহত হোল

টিপ্পনী

ইংরেজ সৈণ্যদের হাতে। সমগ্রদেশ এমন টালমাটাল অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি আগে কখনো দেখেনি। সমস্ত শ্রেনীর মধ্যেই ভয় আর আতঙ্ক বাসা করল। সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে সমস্ত দেশে আবার শান্তি ফিওরে এল। ১৮৮৫ তে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্যকে নিজের হাতে নিলেন; স্টেট সেক্রেটারির পদ সৃষ্টি হোল, শহর কলকাতা আলোয় সাজলো ও চারদিকে আনন্দধ্বনি হোল। তবে এই সবকিছুর মাঝে সিপাই বিদ্রোহের উত্তেজনা বাঙলার সমাজে এক নতুন শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল; একথা স্বীকার করতেই হয়।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়:

১৮৪২ সালে কলকাতার দক্ষিণে ভবানীপুরে তাঁর মায়ের বাড়িতে জন্মনেন হরিশচন্দ্র। পিতা রামধন মুখোপাধ্যায় ও মাতা রুক্মিণী দেবী। ছোটবেলায় কিছুদিন পাঠ শালে পড়াশোনা করার পরে অবৈতনিক ছাত্ররূপে তাঁকে পাঠানো হয় ইন্ডিয়ান স্কুলে। সেখানে ছ'বছর পড়াশোনা করার পোর, ১৪ - ১৫ বছর বয়সে, ভীষণ অর্থাভাবের কারণে তাঁকে পড়াশোনা ছেড়ে অর্থ উপার্জনেদর চেষ্টায় বেরোতে হয়। অনেক চেষ্টায় একটা ১০ টাকা বেতনের চাকরী জুটলেও তা বেশী দিন করা সম্ভব হোলল না, তারপর আরকিছু কষ্টের সময় যাওয়ার পর অবশেষে মিলিটারি অডিটর জেনারেলের অফিসে ২৫ টাকা বেতনের একটি কাজ পেলেন, যে কাজটি তাঁর সব দিক থেকে উন্নতির মূল কারণ হোল। ভাতকাপড়ের অভাব মিটতেই তিনি নিজের জ্ঞানের উন্নতির দিকে মন দিলেন। বই পড়তে শুরু করলেন। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর চাঁদাদায়ী সদস্য হয়ে সেখানে গিয়ে রাশি রাশি বই ইংরেজী সংবাদপত্র, পত্রিকা পড়তে লাগলেন। একদিকে যেমন পড়াশোনা চলছিল তেমনি অণ্যদিকে হিন্দুকলেজের প্রাক্তন ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত ইংরাজী কাগজ "Hindu Intelligencer' এ হরিশের প্রবন্ধ ছাপা হোত এবং এই লেখা তাঁকে শিক্ষিত দলে সুপরিচিত করে তুলেছিল। ১৮৫২ সালে অন্যান্য সদস্যদের আগ্রহে তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভার সভ্যপদে ঢোকেন। ধীরে ধীরে তাঁর নিজস্ব ক্ষমতায় তিনি এসোসিয়েশনের পরামর্শদাতাদের মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠেন। এই সময় তিনি ভবানীপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথম ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য ইংরাজী বক্তৃতার প্রথা চালু করেন। এমন সময়েই তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত য়। মনের মত একটা কাজ পেয়ে ঐ পত্রিকার সম্পাদনা তিনি দেহ মন নিয়োগ করেন। যেহেতু তখন ইংরাজী সংবাদপত্র পড়ার লোক বেশি ছিল না; তাই অনেক চেষ্টাতেও পত্রিকার গ্রাহক শতেক ছাড়ালো না। এ অবস্থায় কিছুদিন 'পেট্রিয়েট' চালিয়ে মালিক মধুসূদন রায় প্রেস অন্যজনকে বিক্রি করে 'পেট্রিয়েট' হরিশচন্দ্রকে দিয়ে পশ্চিমে চলে যান। হরিশ এই কাগজ ভবানীপুরে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর ভাই হারাণচন্দ্রকে নামে প্রেস ও কাগজের সত্ত্বাধিকারীকরে উৎসাহ নিয়ে কাগজটি চালাতে লাগলেন এবং তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি

বিচক্ষণতায় এই কাগজ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও বড়লাট পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। হরিশের যে লেখা লর্ড ডালহৌসির অযোধ্যা অধিকারের সময়ে কলম দিয়ে আগুন ঢেলেছিল, তাই -ই আবার মিউটিনীয় সময় ক্যানিং এর পৃষ্ঠপোষতা করেছিল, সেই লেখাই আবার নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল। নীলকরদের ভয়ানক অত্যাচারে গ্রামে গ্রামে যখন ধনে প্রাণে শেষ হয়ে যাচ্ছিল তখন হরিশচন্দ্র অত্যাচারিত প্রজাদেদর তরফ নিয়ে লেখালিখি শুরু করলেন। বলা যায় তাঁর চেষ্টাতেই গভর্ণমেন্ট ১৮৬০ সালে নিযুক্ত করলেন 'ইন্ডিগো কমিশন'। তার সদস্যরা জেলায় জেলায় ঘুরে নীলকরদের অত্যাচর বিষয়ে খবর জোগাড় করতে লাগল। চারদিক থেকে নীলকরদের উপর ছি. ছি. নেমে এল। এই রাগে আর্কিবল্ড হিলস নামে একজন নীলকর পোট্রিয়টের নামে ফৌজদারি মামলা করল; যে মামলার রোষে থেকে হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নীও রেহাই পাননি। সারা দিন রাতের অমানুষিক পরিশ্রম গিরিশকে ধীরে ধীরে শরীরে ও মনে ক্লান্ত করে তুলল এবং ১৮৬১ সালের জুন মাসে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটল। একদিকে যখন হরিশচন্দ্র প্রজাদের হয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে সেই সময় দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন' নাটক প্রকাশ পেল ও বাঙলার সমাজে ঝড় তুলল। নীলদর্পনের সংলাপ ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। মাইকেল মধুসূদন নাটকটিকে ইংরাজীতে অণুবাদ করলে পাদরী জেমস্ লং সাহেব তা নিজের নামে প্রকাশ করলেন। ইংল্যান্ডেও আন্দোলন তৈরী হোল। নীলকররা আসল নাট্যকারকে না পেয়ে ইংলিশমান পত্রিকার সম্পাদককে মুখপাত্র করে লং এর নামে আদালতে অভিযোগ করল। ইংরেজ পক্ষপাতী জজ স্যার মর্ডান্ট ওয়েলস্ বিচারে একমাসের কারাবাস ও এক হাজার টাকা জরিমান করলেন। নীলকর বিদ্বেষ এদেশীয়দের মনে এত বেশী ছিল যে জরিমানার নির্দেশ দেওয়া মাত্র শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ সেই টাকা দিয়ে দিলেন। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬১; এই সময়টা বাঙলার সমাজের কাছে চরম সময় বলা যায়। এই সময়ের মাঝেই বিধবা বিবাহ আন্দোলন, সিপাই বিদ্রোহ, নীলকরদেদর বিরুদ্ধে লড়াই, হরিশচন্দ্রের সময়কাল, সোলপ্রকাশেদর প্রকাশ, দেশীয় নাট্যালয়েদর প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ইত্যাদি নানা ঘটনা ঘটেছিল। সে সময় শিক্ষিত ব্যাক্তিরা অনে সময় ইংরেজদের স্থাপন করা রঙ্গালয়ে গিয়ে অভিনয় দেখত। দেশীয় ভদ্রলোকেদের ইংরাজী অভিনয় দেখার আগ্রহ দেখে ১৮৫৪ সালে ইংরেজী রঙ্গালয়ের লোকেরা উদ্যোগী হে 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার' নামে একটি শাখা রঙ্গালয় স্থাপন করে সেক্সপীয়রের নাটকের অভিণয় আরম্ভ করলেন। এর ফলে দেশীয় শিক্ষিত সমাজে ইংরেজী অভিণয়ের ধুম লেগে গেল। কি্তু ক্রমশ ধনীরা দেশীয় নাটকের প্রবৌজন অনুভব করল। এই সময় সংস্কৃত কলেজের অণ্যতম অথ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ন মশাই 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নামে একটি নাটক রচনা করলেন। সুপ্রসিদ্ধ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে ওরিয়েন্টাল থিয়েটার একবার তার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অভিণয় হলে দেশীয় নাটকের অভিনয়ের দরজা খুলে গেল। এর কিছু পরেই, ১৮৫৭ তে সিমুলিয়ার বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেব উদ্যোগী হয়ে শকুন্তলাকে বাঙলা নাটকে পরিণত করে অভিনয় করান, এরপরে মহাভারত অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেদর বাড়ীতে বেণীসংহার নাটকের অভিনয় করালেন এবং কিছুদিন পরে মহাসমারোহে তাঁর নিজের অনুবাদিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অভিনয় হোল। দেখতে দেখতে শহরে বাংলা নাটকের অভিণয়ের প্রথা চালু হয়ে গেল। এসমস্ত অভিনয় দেখে পাইকপাড়ার রজপরিবারের রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মনে একটা দেশীয় রঙ্গালয় স্থাপনের চিন্তা এলো এবং তাঁরা তিনজনে মিলে বেলগাছিয়া নাট্যশালা স্থাপন করেলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত :

কাঁচড়াপাড়ার বৈদ্যবংশীয় হরিনারায়ন গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র ঈশ্বরগুপ্তের জন্ম বাঙলার ১২১৮ সালের ফাল্গুন মাসে। তাঁর যখন ১০ বছর বয়স তখন তাঁর মা মারা যান। যৌবনের শুরুতে পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয়পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের বড় ছেলে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাথে তাঁর আত্মীয়তা তৈরী হলে তাঁদের আশহরয় ও উৎসাহে তাঁর মধ্যে কবিত্বশক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে। তিনি মুখে মুখে কবিতা তৈরী করতেন, সখের কবির দলে গান বাঁধতেন। যোগেন ঠাকুরেদর উৎসাহ ও সাহায্যে বাঙলা ১২৩৭ বা ইংরাজী ১৮৩০ সালে 'সাবংদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক আকারে বের হতে থাকে। ঈশ্বরগুপ্ত এই পত্রিকা সম্পাদনার ভার নিলেন। পদ্যময় প্রবন্ধের গুণে খুব তাড়াতাড়ি এই পত্রিকাটি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পত্রিকার গ্রাহক আর লেখক সংখ্যা বাড়তে লাগল। ধীরে ধীরে ঈশ্বরগুপ্ত দেশের অগ্রগণ্য ব্যাক্তিদের মধ্যে একজন হয়ে উঠলে নানা সভাসমিতির সঙ্গে সংযুক্ত থেকে বক্তৃতার মাধ্যমে সকলকে উৎসাহিত করতেন। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রয়ানে 'সংবাদপ্রভাকর' কিছুদিনের জন্য উঠে যায়। সেই সসময় অণ্যান্য কাজে যুক্ত থেকে নানাককারণে শরীর খারাপ হওয়ায় গুপ্ত মশাই কটকে তাঁর কাকার বাড়ি গিয়ে কিছুদিন কাটান। বাংলার ১২৪৩ সালের বৈশাখখ মাসে কটক থেকে ফিরে তিনি আবার 'প্রভাকর' কে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলেন। তখন পত্রিকাটি সপ্তাহে তিনবার করে প্রকাশ হতে লাগল।

দশম পরিচ্ছেদ : ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ পর্যন্ত।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়, হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনা, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার মধুসূদনের আবির্ভাব - ইত্যাদি ঘটনা বাংলার সমাজে যে আবেগ উচ্ছাসের জন্ম দিয়েছিল তার মাধ্যমের এই সমাজ নিজের মতো করে এগিয়ে যাওয়ার পথ

তৈরী করছিল। ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ ; এই দশ বছরে সেই আবেগ আরো বেশী করে ঘনিয়ে উঠল। এই সময়ের মধ্যে বঙ্গে কয়েকজন নতুন নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা বাংলার মানুষের মন ও চিন্তাকে নতুন পথ চালিত করেছিল। এঁদের মধ্যে অণ্যতম হলেন কেশবচন্দ্র সেন। তিনি নতুন সূর্যের মত ধীরে ধীরে বাংলার আকাশে উঠতে লাগলেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজ সাধারণের সামনে আরো বেশি বিকশিত হতে লাগল ১৮৫৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধ্যানধারণাতে বিশেষভাবে কিছুটা সময় নিবিষ্ট হয়ে থাকবে আশার শহর ছেড়ে হিমালয়ে যান। ১৮৫৮ সালের শেষে কলকাতা ফিরে দেখেন তাঁর বন্ধু প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয়পুত্র কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহমসমাজে যোগ দিয়েছেন। মহানন্দিত দেবেন্দ্রনাথ সাদরে গ্রহণ করেন কেশবকে এবং দুজনে মিলে নতুন নতুন কাজে হাত দেন। ১৮৫৯ সাল থেকে ব্রাহ্মসমাজে যেন এক নতুন শক্তির প্রকাশ ঘটল। একদিকে, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর হিমালয় বসবাসকালের সাধনায় চরম ফল তাঁর চিরস্মরণীয় উপদেশ গুলোর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে লাগলেন অপরদিকে যুবক কেশবচন্দ্রের ্ৎসাহ সকলের চোখে পড়ল। তিনি তাঁর কিছু বন্ধু, বান্ধবদের সাথে, একসাথে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করায় ব্রাহ্মসমাজে এক নতুন শক্তির জোয়ার এল। দেবেন্দ্র ও কেশব একসাথে হয়ে যুবকদের ধর্ম শিক্ষা করার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় নামে একতি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন যেখানে প্রতি রবিবার সকালে অধিবেশন হোত এবং তাতে মহর্ষি বাংলায় ও কেশব সেন ইংরাজীতে উপদেশ দিতেন। শিক্ষিত যুবসনাজ ক্রমশ ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলেন এবং আগেই যাঁরা কেশবচন্দ্রকে অণূসরণ ককরেছিলেন; এই সবাইকে কেশব একটি সুহৃদগোপষ্ঠী তৈরী করলেন। সপ্তাহের মধ্যে একদিন তাঁদের সঙ্গে নিজের বাড়ীতে বসে সবরকমের ধর্মও সামাজিক বিষয়ে আলোচনা করতেন। দেবেন্দ্রনাথ এর নাম দেন 'সঙ্গত সভা'। এই সভাচর সদস্যরা যে নতুনভাবে দীক্ষীত হলেন তা হোল হৃদয়ের বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করতে হবে, তাছাড়া ধর্ম হয় না। এই ভাব মনের মধ্যে প্রবল আকার নেওয়ায় ১৮৬১ সাল থেকে ব্রাহ্মধর্মকে অনুষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ব্যাগ্রতা দেখা গেল। নবীন ব্রাহ্মরা তাঁদের কাজের ক্ষেত্রকে দিন দিন বিস্তৃত করে তুলতে লাগলেন। মনোমোহন ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থ সাহায্যে 'ইন্ডিয়ান মিরার' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হোল, কলিকাতা কলেজ নামে একটি উচ্চশ্রেনীর বিদ্যালয় স্থাপিত হোল, সমালোচনার জন্য ব্রাহ্মবন্ধু নামে একটা সভা স্থাপিত হোল। ব্রাহ্মরা স্ত্রী শিক্ষার বিষয়েও মন দিয়েছিল নিজের বাড়িতে স্ত্রী-বোন - মেয়ে প্রভৃতিদের শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও ব্রাহ্মবন্ধু সভার সংযোগে একটা স্ত্রী শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করলেন, কয়েকজন মিলে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' নামে মেয়েদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা বের করতে শুরু করেন। ১৮৬৪ সালে ব্রাহমিকা সমাজ নামে মেয়েদের জন্য একটি আলাদা উপাসনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কেশবচন্দ্র সেখানে আচার্য্যের দায়িত্ব পালন করেন । খুব বেশীদিন দেবেন্দ্রনাথ কেশবসেনের চিন্তাভাবনা ও কাজের ধরণ এক থাকলো না। নবীন ব্রাহ্মরা বিভিন্ন নারী - পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে চাইলে রক্ষণশীল প্রকৃতির দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মতান্তর ঘটেও যার ফলে নবীন ও প্রবীন ব্রাহ্মদলের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। অগ্রসহ ব্রাহমদল নিজেদের আলাদা কাজের জায়গা করলেন, ধর্মতত্ত্ব নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করল এবং দেবেন্দ্রনাথের সমাজ ছেড়ে দিয়ে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি আলাদা সমাজের স্থাপনা করলেন। সেই সময় থেকেই দেবেন্দ্রনাথের সমাজের নাম হোল 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'। ১৮৬৮ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে এগিয়ে থাকা ব্রাহ্মদল ভীষণ উৎসাহের সাথে ব্রাহ্মধর্মের কথা ভারতের নানা প্রদেশে প্রচার করতে লাগলেন। দেখতে দেকতে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, মাদ্রাজ সব জায়গায় ব্রাহ্মসমাজে স্থাপন হোল। এভাবে ব্রাহ্মসমাজের নতুন করে জেগে ওঠা বাংলার সমাজে যখন আন্দোলনের তরঙ্গ তুলেছিল তখন সাহিত্যের আঙিনাতেও নতুন শক্তির আর্বিভাব ঘটল। ১৮৬০ সালের শেষের দিকে 'নীলদর্পণ' - এর প্রকাশ সমাজ ও সাহিত্যে ঘটালো উল্কাপাত। দীনবন্ধুর তাঁর নাটকগুলো দ্বারা বাঙলা সাহিত্যে যেমন নতুনভাব ও বাঙালীর মনে নতুন শক্তির সঞ্চার করলেন তেমনি বাঙলা সাহিত্য জগতে অন্য আরেক প্রতিভাবান শক্তিশালী লেখকের আগমন হটল; - তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন বাঙলা পদ্য সাহিত্যকে চিরাচরিত রীতি নীতির পাশ থেকে মুক্তি দিয়ে এক নতুন আকাশ দেখিয়েছিলেন গদ্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রও সেই একই ভভূমিকা নিয়েছিলেন।

ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার পর প্রথমে সংবাদপত্র ইংরেজদের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে বের হতে শুরু করে। তারপরে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা 'দর্পণ' নামে একটি কাগজ তৈরী করে বাঙলা সংবাদপত্রের রাস্তা খুলে দেয়। কিন্তু একথাও মনে রাখা জরুরী যে, 'দর্পণ' ও ইংরেজদের হাতেই সম্পাদিত হোত ও কাগজের ভাষা ছিল ইংরেজের লেখা বাঙলা ভাষা। রাজা রামমোহন রায়ই এদেশীয়দের লেখা বাঙলা খবরের কাগজকে প্রথম সামনে আনেন; - 'সংবাদ কৌমুদী'র মাধ্যমে; সময়টা ১৮২১। সতীদাহ প্রথা রদ করার দাবীর পক্ষে আন্দোলন করা কালীন রামমোহনের সাথে হিন্দু সমাজের বিবাদ তৈরী হলে, হিন্দু ধর্মকে রক্ষা ও সংস্কারপন্থীদের সাথে তর্কযুদ্ধ করার জন্য হিন্দুধর্মের তরফ থেকে এই ধর্মের ব্যাক্তিরা প্রকাশ ককরলেন 'চন্দ্রিকা' । ১৮৪৩ এ ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে প্রকাশিত হোল 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা। যদিও এটিকে ঠিক সংবাদপত্র বলা যায় না। ধর্মতত্ত্বের আলোচনাই ছিল এই পত্রিকার মূল কাজ। প্রতিদিনের খবর যোগানের ভার নিয়েছিল 'সংবাদপ্রভাকর', 'ভাস্কর' এই সমস্ত কাগজগুলো । সেসময় আরো অনেকগুলো খবরের কাগজ বের হয়েছিল। ১৮৫০ সালের একটি তালিকা থেকে যে সমস্ত নামগুলো পাওয়া যায় তা হোল - মহাজনদর্পন, চন্দ্রোদয়, রসরাজ, জগনদর্পণ, বঙ্গদূত, সাধুরঞ্জন,

জগনসঞ্চারিনী, রসসাগর, রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, ইত্যাদি। এই সমস্ত কাগজগুলো একে অণ্যের নামে অভদ্র ভাষায় কথা বলত। এমন একটা সময় এল যখন শিক্ষিত ব্যাক্তিরা বাঙলা খবরের কাগজ পড়তে ঘৃণা বোধ করতেন। কেউ কাগজ বের ককরতে চাইলে ইংরাজী কাগজ বের করতেন। এই সময় ইংরেজী কাগজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল - হরিশের Hindoo Patriot, রামগোপাল ঘোষের Bengal Spectator, কালীপ্রসাদ ঘোষের Hindu Intellligencer, কিশোরী চাঁদ মিত্রের India Field ১৮৫৮ তে সোমপ্রকাশের জন্মের সময়েও এই ছিছি রবটা ছিল এবং একথা বলা যায় এই রবটা বন্ধ করাই হয়ত সোমপ্রকাশের জন্মের এক মূল কারণ ছিল। বাঙলা খবরের কাগের সম্পর্কে এই না বাচক আচরণ কে সরানোর জন্য নানাগুণী জন নানারকম ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। বিখ্যাত চিকিৎসক রাজেন্দ্রলাল মিত্র মশাই সম্পাদনা করেন 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'। এছাড়াও সোমপ্রকাশ প্রকাশের কিছুটা সময় আগেই প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার 'আলালী ভাষাকে' আশ্রয় করে প্রকাশ করেছিলেন 'মাসিক পত্রিকা' নামের একটি পত্রিকা। এ সময়ে 'সোমপ্রকসাশ' এর আবির্ভাব সংবাদপত্রের ধারায় একটা নতুন পথ দেখাল বলা যাব। দ্বারকানাথ বিদ্যাভুষণের সম্পাদিত এই কাগজটির ভাষার লালিত্য, বিষয়েদর গম্ভীরতা সমস্ত বাঙলাদেশর মনকে ছুঁতে পেরেছিল। কাগজ ছিল সাপ্তাহিক এবং বিনিময় ছিল বছরে ১০ টাকা; তাও অগ্রিম কিছু তাও মানুষের মধ্যে সোমপ্রকাশের চাহিদায় কোন ভাটা পড়েনি। এরপরে পরেই যে উল্লেখযোগ্য সামাজিক ঘটনা ঘটে তা হোল রাজ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের আসা এবং সে কারণে গড়ে ওঠা একটি অণ্যরকম আন্দোলন। কলকাতা শহরে হোমিওপ্যাথির আবির্ভাব ঘটেছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ত পরিবারের প্রসিদ্ধ রাজেন্দ্র দত্ত্ ওরফে রাজা বাবুর হাত ধরে। ১৮৬৩ সালে কলিকাতা মেড়িকেল কলেজ থেকে এম ডি পাশ করা ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কিছু সময়ের মধ্যেই শহরের নামকরা চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। ঐ সালেই ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের বঙ্গ দেশীয় শাখা নামে একটি শাখা সভা স্থাপন করা হয়। সেই সভার প্রতিষ্ঠার দিনে মহেন্দ্রলাল তাঁর বক্তৃতায় হোমিওপ্যাথির নিন্দা করলে রাজাবাবু বিষয়টি নিয়ে মহেন্দ্রলালের সাথে আলোচনা শুরু করেন। এরই মাঝে, মহেন্দ্রলালের এক বন্ধু ইন্ডিয়ান ফিল্ড নামের কাগজের জন্য তাঁকে মর্গাণ সাহেবের লেখা হোমিওপ্যাথি বিষয়ে বইয়ের সমালোচনা লিখতে অনুরোধ করলে তিনি হোমিওপ্যাথি বিষয়ে জানার আগ্রহ অনুভব করলেন। একদিকে রাজাবাবুর সাথে হোমিপ্যাথির সাহায্যে রোগীর চিকিৎসা দেখা এবং অণ্যদিকে মর্গাণ সাহেবের বই - এই দুইয়ের সাহায্যেই ঘটে গেল এক বিস্ময় - সময়টা ১৮৬৬; মহেন্দ্রলাল সরকার মত বদলালেন এবং হোমিওপ্যাথিকক চিকিৎসা প্রণালীকেই বেশীপযোগ্য প্রণালী বলে তাঁর মনে হোল। ১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের চতুর্থ বাৎসরিক সভার অধিবেশন হলে সেকানে ডাক্তার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সরকার যে বক্তৃতা পাঠ করলেন তাতে প্রচলিত চিকিৎসা প্রণালীর অনির্দিষ্টতা দোষ দেখিয়ে হানিম্যানের দেখানো প্রণালীকে সেরা বললে শহরের এলোপ্যাথি চিকিৎসক দল খেঁপে উঠে তাকে একঘরে করলেন। কিন্তু এই কোন কিছুকেই গ্রাহ্য না করে সাহসী ও তেজী এই ডাক্তারটি তাঁর হোমিপ্যাথির চর্চা ও চিকিৎসা চালতে লাগলেন ও সেকালে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকে পরিণত হলেন।

কেশবচন্দ্রেদর বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি - এইসব সে সময়ের শিক্ষিত দলের মনে যেমন নতুন ভাবকে আনছিল তেমনি আরেকটি কাজের আয়োজন নতুন আশঙ্কার উদয় ঘটালো। তা হোল, 'ন্যাসনাল পেপার' নামের সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মশায়ের প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় মেলা' নামের মেলা ও প্রদর্শনী এবং দেশের সমস্ত বিভাগের সবশ্রেণীর নেতাদের এর সাথে সংযুক্ত হওয়া। জাতীয় স্ববিলম্বী মনোভাবকে সমস্ত জাতির মনে জাগিয়ে তোলাই ছিল এই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র সংক্রান্তিতে হিন্দু মেলার অধিবেশন হোল। গগনেনন্দ্র ঠাকুর সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র হলেন সহকারী সম্পাদক। মেলার অধ্যক্ষরা দেশের উন্নতি, দেশীয় সাহিত্যের বিকাশ, দেশীয় গানের চর্চা, দেশীয় কুস্তীর বিকাশ ইত্যাদিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য শপথ নিলেন। উৎসাহ দাতাদের মধ্যে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু কাশীশ্বর মিত্র, বাবু দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতিরা ছিলেন। ১৮৬৮ সালে বেলগাছিয়ার সাতপুকুরের বাগানে খুব সমারোহে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেখানে মেলার প্রথম সম্পাদক গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার উদ্দেশ্যকে যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন, তা হোল - "ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্যেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্যে যাচঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয় !" দেখতে দেখতে স্বদেশ প্রেম সব জায়গায় ছড়ীয়ে পড়ল। ১৮৬৮ সালেদর পরেও হিন্দুমেলার কাজ অনেকদিন চলেছিল। নবগোপাল বাবু এটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও ধীরে ধীরে তা উঠেই যায়।

কলকাতার আন্দোলনের জোয়ারে পূর্ববাঙ্গলাও ভেসেছিল। ঢাকা শহরে নতুন নতুন কাজ শূরু হতে লাগল। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, মেয়েদেদর স্কুধল তৈরী, বিধবাবিবাহের আন্দোলন - এই সবই ঢাকা শহরেও ঘটতে থাকলো। পূর্ববাংলায় ধর্ম ও সমা সংস্কার বিষয়ে সবথেকে উল্লেখযোগ্য দুই ব্যক্তি হলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজসুন্দর মিত্র ও কৌলীন্যপ্রথার সংস্কারক করতে চাওয়া রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

48

একাদশ পরিচ্ছেদ : নব্যবঙ্গের দ্বিতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ।

লাহিড়ী মশাই যখন রসাপাগলা থেকে বরিশাল ও বরিশাল থেকে কৃষ্ণনগরে

বদলী হয়ে শারীরিক অসুস্থতার কারণে শিক্ষকতার কাজ থেকে অবসর নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই সময়েদর মধ্যে বাংলার সমাজে ৫ টি ভীষণ শক্তি দেখা দিল -

(১) কেশবচন্দ্র সেনের অভ্যুদয়।

(২) দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যকানব্যর অভ্যুদয়।

(৩) সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব।

(৪) সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়।

(৫) চিকিৎসা জগতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের অভ্যুদয়।

টিপ্পনী

কেশবচন্দ্র সেন :

হুগলী জেলার গঙ্গাতীরের গৌরভা নিবাসী কলকাতার কলুটোলা প্রবাসী রামমল সেনের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৩৮ সালের ৫ই অঘ্রান কলুটোলার বাড়িতে। খুব ছোটবয়সে ইনি পরপর পিতামহ ও পিতাকে হারাণ। এরপরে বড় জ্যাঠামশাই হরিমোহন সেনই তাঁর অভিভাবক হন। ১৮৪৫ সালে সাত বছর বয়সে কেশব ভর্তি হলেন হিন্দু কলেজে। ১৮৫২ তে হিন্দু কলেজে বারাঙ্গানা হারা বুলবুলের সন্তান কে ভর্তির সূত্রে তখনকার এডুকেশন কাউন্সিল ও হিন্দুকলেজের ম্যানেজিং কমিটির মতভেদ ঘটলে তার ফল হিসাবে ১৮৫৩ তে রাজেন্দ্র দত্তকে সমর্থন করায় কেশবচন্দ্রকে হিন্দু কলেজ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয় মেট্রোপলিটনে এবং ১৮৫৪ তে মেট্রোপলিটন উঠে গেলে কেশবচন্দ্র আবার ফিরে আসেন হিন্দু কলেজে। অনুমাণ, ১৮৫৮ সাল নাগাদ আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান মিশনারি ড্যাল সাহেব ও পাদরী লং সাহেএর সাথে মিলে, কেশবচন্দ্র, কলুটোলার বাড়িতে ছেলেদের পড়াশোনার জন্য একটি সন্ধেকালীন বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। ১৮৫৬ তে বালীগ্রামের কুলীন পরিবারের চন্দ্রকুমার মজুমদারের বড়মেয়ের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৫৭ সাল থেকে তাঁর মধ্যে ধর্মভাব ও কাজের প্রতি উৎসাহ বেশি করে প্রকাশ পেতে থাকল। নিজের বাড়িতে তিনি Good Will Fraternity নামে একটা সভা স্থাপন করে সেখানে প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ধর্মাচার্যদের বই থেকে অংশ তুলে পড়তেন, কখনো বা নিজেও প্রবন্ধ লিখে পড়তেন বা মৌলিক বক্তৃতা দিতেন। এই সভার সূত্রে তাঁর সাথে আলাপ হয় ব্রাহ্মসমাজের তখনকার নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। পরবর্তি সমাজে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলে মহর্সি অত্যন্ত খুশি হন। একদিকে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করা এবং অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনেনতুন উদ্দীপনা -এই দুই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এক নতুন শক্তির সঞ্চার করল এবং ব্রাহ্মসমাজ নতুন নতুন কাজ শুরু করল। কেশবচন্দ্র নানা রকমে

টিপ্পনী

নতুন কাজের পরিকল্পনা করতেন এবং দেবেন্দ্রনাথ সানন্দে তাঁকে সমর্থন করতেন।

১৮৫৯ সালে ব্রাহ্মবিদ্যালয় আমে একটি স্কুল স্থাপনা করে তাঁরা কলেজের ছাত্রদের বাংলা ও ইংরাজীতে উপদেশ দিতে লাগলেন। সেই সময় সিন্দুরিয়া পাটীর গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ; নাটকটির অভিনয় হলে কেশবচন্দ্র ছিলেন তার প্রধান উদ্যোগী ও কর্মকর্তা। ১৮৫৯ সালে তাঁর বাড়িতে 'সঙ্গত সভা' নামে একটা ধর্ম আলোচনার সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকমাসের জন্য তিনি সিংহল যান। সেখান থেকে ফেরার পর তাঁর অভিভাবকরা তাঁকে বাধ্য করলেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটি ৩০ টাকা বেতনের চাকরী নিতে। প্রায় প্রচার করতে লাগলেন। Young Bengal, this is for you, নামে তাঁর বইটি প্রকাশ পেল। ধীরে ধীরে Indian Mirror নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ পেল, 'কলিকাতা কলেজ' নামে একটা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্র সবরকমের বিষয়কাজ ছেড়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারেই নিজেকে সঁপে দিলেন। ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি অনুসারে বিয়ে, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে থাকল। ১৮৬২ সালের ১ লা বৈশাখ কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা কলকাতা সমাজের আচার্যের পদে নিযুক্ত হলেন ও ব্রহ্মানন্দ উপাধি পেলেন। খ্রীষ্টীয় সংবাদপত্র ও সভাসমিতিতে ব্রাহ্মদের অনেক হীন কথা বলা হচ্ছিল। ১৮৬৩ সালেদর শুরুতে খ্রীষ্টীয় প্রচারক লালবিহারী দে দ্বারা সম্পাদিত একটি পত্রিকাতে ব্রাহমদের প্রতি অনেক উপহাস ও বিদ্রুপ প্রকাশ পেলে তার উত্তরে কেশবচন্দ্র Brahmo Samaj Vindicated (ব্রাহ্মসমাজের পক্ষসমর্থন) বলে একটা বক্তৃতা দেন; যে বক্তৃতায় তার বাগ্মীতা শ্রোতাদের মনকে ছুঁয়ে যায় এবং কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা বাংলার সমাজে স্থাপিত হয়। এ বছরেই তিনি 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা' স্থাপন করেন ও স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন। ১৮৬৪ তে তিনি মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে যান ধর্ম প্রচারে। ফিরে এসে একটি অণ্যরকম কাজে হাত দেন। ১৮৬৫'র কার্ত্তিক মাসে কেশবচন্দ্র, অঘোরগুপ্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এঁরা তিনজন পূর্ববাঙলায় ধর্মপ্রচারে যান। কলকাচতায় ফিরে কেশবচন্দ্র যুবক দলের নেতা হয়ে সমাজ সংস্কারে নিজেকে সঁপে দেন এবং 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' স্থাপন করেন। ১৮৬৬ সালের জানুয়ারী শেষে যে মাঘোৎসব হোল তাতে ব্রাহ্মিকা সমাজের মহিলা সদস্যরা উপস্থিত থাকলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই প্রথম নারীরা প্রকাশ্যে উপাসনা মন্দিরে পুরুষদের সাথে বসলেন। কলকাতা সমাজের সাথে দূরত্ব ধীরে ধীরে আরো বাড়তে লাগল এবং চারদিক থেকে অনেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা একটা আলাদা সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অণুরোধ করতে থাকায় অবশেষে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' এর প্রতিষ্ঠা হোল এবং সেই সময় থেকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নাম পরিবর্তন করে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' রাখা হোল। ১৮৬৭ সাল থেকে যুবকদের প্রচার উৎসাহ আগুনের মত বাড়তে লাগল। কেশবচন্দ্র নিজের বাড়িতে দৈনিক উপাসনা আরম্ভ করলেন। এই উপাসনা

থেকে নতুনব্যাকুলতা ও নতুনভক্তির সঞ্চার হোল। তাঁরা চৈতন্যের ভক্তিত্ত্ব আলোচনা করতে লাগলেন। ওল, করতাল নিয়ে সংকীর্তণের প্রথা চালু হো। ১৮৬৮ সালের শুরুতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির ছাড়ার জন্য একখন্ড জমি কিনে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হোল। এই উপলক্ষে কেশবচন্দ্র তাঁর দল নিয়ে নগরকীর্তণ করে, ভিত্তিস্থাপন করতে গেলেন। এটাই ছিল ব্রাহ্মদের প্রথম নগর কীর্ত্তন। সেই কীর্তনের মধ্যে দিয়ে জগতের কাছে ঘোষণা করলেন -

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,

যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি,নাহি জাত বিচার।"

১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র ইংল্যান্ড যান ও সেখানেও নানা জায়গায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। দেশে ফিরেই ভারত সংস্কারে সভা নামে একটি সভা স্থাপন করে তার মাধ্যমেই সুলভ সাহিত্য, নৈশ্য বিদ্যালয়, স্ত্রী শীক্ষা,শিক্ষা বিস্তার, সুরাপান নিবারণ প্রভৃতি দেশের হিতের জন্য কাজ শুরু করেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলেই ১৮৭২ সালে তিন আইন নাম দিয়ে একটি সিবিল বিবাহ বিধি প্রচারিত হয়। সেই থেকেই ঐ বিধি অনুসারে উন্নতশীল ব্রাহ্মদের বিবাহ হয়। এসময় কেশবচন্দ্র কিছু ব্রাহ্মপরিবারকে এক সঙ্গে রেখে 'ভারতশ্রম' নামে একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রমের মধ্যে নানা কারণে গোলযোগ তৈরী হলে তা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায় ধীরে ধীরে দলের মধ্যে দল তৈরী হতে থাকে। তারা 'সমদর্শী' নামে একটা মাসিকপত্র এর করল। ১৮৭৭ সালের শুরুতে সমাজের কাজে নিয়মের কাঠামো তৈরী করার উদ্দেশ্যে 'সমদর্শী দল একটা ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা গঠন করতে চাইলে কেশবচন্দ্র বাধা দেন নি বরং সাহায্য করতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টা কাজে পরিণত হতে না হতেই কুচবিহারের বিবাহের ঘটনা ঘটল এবং ঐ বিবাহে ব্রাহ্মদের অবলম্বণ করা কিছু নিয়ম লঙ্ঘণ হওয়ায় উন্নতশীল ব্রাহ্মরা ভেঙে দুভাগ হয়ে গেল। ব্রাহ্মদের বেশিরভাগ তাঁকে ত্যাগ করলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে একটা আলাদা সমাজ স্থাপন করলেন। কিছুদিন পর কেশবচন্দ্র তাঁর নিজের বিভাগীয় সমাজের 'নববিধান' নাম দিয়ে নতুন করে সবকিছু গড়ার চেষ্টা করলেন ও নিজের পুরানো জায়গা ফেদরত পাওয়ার চেষ্টা করলেন। ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৪; এই পাঁচ বছর এই চেষ্টায় তিনি এত অমানুষিক পরিশ্রম করলেন যে তাঁর শরীর তা নিতে পারল না। ১৮৮৩ তে দারুণ বহুমূত্র অসুখ ধরা পড়ল এবং ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারীর সকালে তিনি দেহত্যাগ করলেন।

টিপ্পনী

দীনবন্ধু মিত্র :

যে সময় কেশবচন্দ্র সেন বাঙালি জাতির নতুন শক্তি ও নতুন আকাঙ্খার উন্মেষের মুখপাত্র স্বরূপ হয়ে সমাজে উঠে দাঁড়ালেন, যে সময় বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শণ

টিপ্পনী

বাঙালীর চিন্তা চেতনাকে অধিকার করেছিল, সেই সময় দীনবন্ধু সেই উন্মেষকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর নাটক দিয়ে। দীনবন্ধু বাংলার ১২৩৬ সালে কলকাতার অদূরে চৌবেড়িয়া নামের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেণ। তাঁর পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। ছোটবেলায় তাঁর বাবা তাঁকে গ্রামীণ পাঠশালাতে সামান্য কিছু জমিদারী হিসাব শিখিয়েই ঐ অল্প বয়সেই বিষয় কর্মেই যুক্ত করে দিলেও দীনবন্ধুর মন তাতে সার দেয়নি। আরো বেশী জ্ঞান লাভ ও ইংরাজী শেখার ইচ্ছে তে তিনি একদিন বাবাকে কিছু না জানিয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসেন ও একজন আত্মীয়ের আশ্রয়ে থেকে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। পড়াশোনার বিষয়ে একটু এগিয়েই তিনি গুপ্ত কবির প্রভাবের মধ্যে পড়ে প্রভাকরে। লিখতে আরম্ভ করলেন। তিনি কবিতা লিখতে শুরু করলেন ও তাঁর কবিতা খ্যাতি লাভ করল। ১৮৫৬ সালে কলেজ থেকে বেরিয়ে গভর্ণমেন্টের ডাক বিভাগের কাজে যোগ দেওয়ার সূত্রে তিনি উড়িষ্যা, নদীয়া, ঢাকা, কুমিল্লা, লুকাই পাহাড় ইত্যাদি জায়গায় ভ্রমণ করেন। ১৮৭১ সালে লুসাই যুদ্ধ বাঁধলে ডাকের বন্দোবস্ত করার ভার তাঁর উপরেই পড়ে। এই সব কাজ কর্ম ঠিকভাবে করার জন্য তিনি সরকারের কাছ থেকে রায়বাহাদুর উপাধি পান। ১৮৫৯ সালে নদীয়া, যশোর ইত্যাদি জেলায় প্রজাদের সাথে নীলকরদের ঘোর বিবাদে যখন প্রজারা ধর্মঘট করছে তখন দীনবন্ধু ছিলেন ঢাকাতে। নীলকরদের অত্যাচারের চিহ্ন কোথাও কোথাও তিনি নিজে চোখে দেখেছিলেন। সাধারণ প্রজাদের দুঃখ দেখে তাঁর মধ্যে যে আগুণ জ্বলে উঠেছিল তারই প্রকাশ ১৮৬০ এর 'নীলদর্পণ'। মাইকেল মধুসূদন তা ইংরাজীতে আনুবাদ করলে পাদরী লং সাহেব তা নিজের নামে প্রকাশ করেন। প্রতিহিংসায় উদ্যত নীলকর সাহেবরা তখন দীনবন্ধুকে ধরতে না পেরে লং কে কারাগারে দিল এবং হিন্দু পোট্রিয়টের হরিশচন্দ্রকে ধনেপ্রাণে সারা করে দিল। দীনবন্ধু তাঁর নিজের পথে এগিয়ে গেলেন। অসুস্থ অবস্থায় ১৮৭৩ সালের নভেম্বর মাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কাজের কারণে কৃষ্ণনগরে গিয়ে তাঁর সাথে লাহিড়ী মশায়ের আলাপ ও আত্মীয়তা তৈরী হয় এবং তিনি যে লাহিড়ী মশাইকে কিভাবে দেখতে তা তাঁর 'সুরধুনী কাব্য' থেকে জানা ও বোঝা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় :

১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের নৈহাটির কাঁলপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডেপুটী কালেক্টর। ছোটবেলায় হুগলী কলেজে পড়াশোনা করা কালীন তাঁর চোখ পড়ে বাঙলা সাহিত্যের দিকে। সেকালের প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি প্রথমে 'প্রভাকরে' কাব্যরচনা করেন। হুগলী কলেজ থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি ও সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেও বি. এ উপাধি পেয়ে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ পান ।১৮৬৫ তে প্রকাশ পেল তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী'। উপন্যাস প্রকাশের সাথে সাথে চমকে উঠল

সমস্ত সমাজ,সাহিত্য মহলল। এমন অপূর্ব ভাষা - অদ্ভুত চিত্রণ শক্তি বর্ণনার গুণ আগে কখনো কেউ দেখেনি। ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে লাগল কপালকুন্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষকবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ প্রভৃতি উপন্যাস। এই সমস্ত লেখনী তাঁকে সে কালের শ্রেষ্ঠ লেখকে পরিণত করল। তিনি একটি নতুন আঙলা গদ্য লেখার পদ্ধতিকে অবলম্বণ করলেন। ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হোল তার বঙ্গদর্শন। বঙ্কিমের প্রতিভা আরেক ভাবে সেখানে দেখা দিল। তিনি এমন এক মাসিক পত্রিকাকে আনলেন যা প্রতিটা শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে নিজের স্থান অধিকার করে নিল। বঙ্কিম যখন বঙ্গদেশের সম্পাদক তখন তিনি রুশোর সাম্যবাদের উদার নীতির পক্ষে, বেন্থাম ও মিন্দের হিতবাদের পক্ষে কথা বলতেন। তিনি তাঁর অমৃতময়ী ভাষাতে সাম্য,নীতি এভাবে ব্যাখ্যা করতেন যে যুবকদল মুগ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু বঙ্গদর্শণ বেশী দিন থাকল না, তা অণ্য হাতে গেলে তার আকর্ষণও কমে গেল। শেষ কয়েকবছর তিনি ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণই ছিল তাঁর আদর্শ পুরুষ। তিনি কৃষ্ণচরিত ও ধর্মতত্ত্ব - এই দুই গ্রন্থ রচনা করেন। শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রে য় তাঁর প্রতিভা বিকাশ লাভ করে তাঁর কাজের জগতেও। তিনি গভর্ণরমেন্টের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দলের মধ্যে সবার প্রথম শ্রেণীতে উঠে রাজপ্রসাদের চিহ্ন হিসাবে 'রায়বাহাদুর' ও 'সি. আই. আই' উপাধি পেয়েছিলেন। এমন মহান সাহিত্যিক ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল দেহত্যাগ করেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ :

বাঙলার সমাজে সোমপ্রকাশের আবির্ভাব এক ধরণের বিপ্লবই বটে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। কলকাতার দক্ষিণ পূর্ব পাঁচ ক্রোশ দূরে, চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ স্কুলে দ্বারকানাথের জন্ম। সময় ১৮২৭ সাল। পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। দ্বারকানাথ তখনকার প্রচলিত পদ্ধতি অণুযায়ী কিছুদিন পাঠশালায় পড়ার পরে এক আত্মীয়ের চতুষ্পাঠিতে সংস্কৃত পড়তে শুরু করেন। তারপর ভর্তি হ সংস্কৃত কলেজে। কলেজ পাশ করে প্রথমে ঐ কলেজের লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হন তারপর ১৮৫৪ সালে নিযুক্ত হন ব্যাকরণের অধ্যাপক পদে। ধীরে ধীরে তাঁর পদ ও বেতনের উন্নতি ঘটতে থাকে। সোমপ্রকাশ -ই এঁর প্রধান কীর্তি এবং এই কীর্তীই তাঁকে বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। ১৮৫৬ সালে হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মশাই তাঁর পুত্র দ্বারকানাথের সাথে একসাথে একটি ছাপার যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এরপরই তিনি অসুস্থ হন ও মারা যাণ। ঐ যন্ত্র থেকেই দ্বারকা নাথেদর লেখা রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামে দুটি বাংলা বই প্রকাশ পায়। বই দুটি -ই বাঙলার শিক্ষিত মহলকেআইকৃষ্ট করে। ১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ পচরথম প্রকাশ হোল। দ্বারকানাথ সম্পাদকতার দায়িত্ব ও যন্ত্র মুদ্রাঙ্কনের খরচ নিজেই দিলেন। বিদ্যাসাগর মশাই ও কিছু বন্ধু লেখকদের মধ্যে জায়গা পেলেন। সে সময়

টিপ্পনী

টিপ্পনী

‘প্রভাকর’ ও ভাস্কর’ - এর পারস্পরিক কটুক্তি বাংলার সমাজের নীতির উপর যে প্রশ্নচিহ্ন তুলেছিলেন সোমপ্রকাশ তা মুছে দিলেন। এই পত্রিকার প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পত্রিকার ভাষা লালিত্য - মতের উদারতা - যুক্তি সোমপ্রকাশকে স্বতন্ত্র করে দিল। কাগজের বার্ষিক মূল্য ছিল ১০ টাকা এবং তাও অগ্রিম কিন্তু এর পরেও পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ছিল অনেক। প্রথমে বিদ্যাভূষণ মশাই কলকাতার চাঁপাতলার একটি গলি থেকে, তারপর মাতলার রেলওয়ে খোল থেকে এবং সবশেষে তাঁর বাসভূমি চাঙ্গড়িপোতা থেকে কাগজ বের করতে থাকেন। নিজের গ্রামে গিয়েই তিনি নিজের ব্যায় ও চেষ্টায় একটা ইংরাজী স্কুল খোলেন ও চালাতে থাকেন। তাঁর বার্দ্ধক্যবস্থায় উদ্বিগ্ন হতেন ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুধর্মের শাসন ও উপদেশ বাধা পাচ্ছে এমন মনে করে। সাধারণ মানুষের ধর্ম উপদেশ শোনার সুবিধারন জন্য তিনি নিজের বাইতে হরিসভা করতে দিয়ে কথকতা পাঠ, শাস্ত্র্যব্যাখ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থের অবণতি হওয়ার জন্য তিনি শরীর সারাতে কাশীতে গিয়ে বাস করেন; তীর্থ স্থানের ধর্ম ও নীতির দুরাবস্থা দেখে আহত হয়ে তিনি ‘বিশ্বেশ্বর বিলাপ’ নামে একটি কবিতার বইরচনা করেন। ১৮৮৬ সালের ২২ শে আগষ্ট খুব অসুস্থ হয়ে মারা যান।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের হ্রাস ও হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনা ১৮৭০ সাল হইতে ১৮৭৯ সল পর্যন্ত।

১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন ইংল্যান্ড থেকে ফিরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। ভারত সংস্কার নামে একটি সভা স্থাপন করে ৫ টি কাজের আয়োজন করলেন - (১) সুলভ সাহিত্য (২) সুরাপান নিবারণ (৩) শ্রমজীবী বিদ্যালয় (৪) স্ত্রী শিক্ষা এবং (৫) দাতব্য বিতরণ।

সুলভ সাহিত্য বিভাগে ‘সুলভ সমাচার’ নামে এক পয়সা দামের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বের হোল; সুরাপান নিবারণ বিভাগে ‘মদ না গরল’ নামে মাসিক পত্রিকার প্রকাশ শ্রমজীবী বিদ্যালয় বিভাগে শ্রমজীবীদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন এবং তার যাবতীয় দায়িত্বভার তাঁর অনুগত কাজে দক্ষ এক প্রচারককে অর্পণ; স্ত্রী শিক্ষা বিভাগে বয়স্কা মহিলাদের জন্য এক বিদ্যালয় খোলা হোল; দাতব্য বিভাগে একটা বড় কাজের আয়োজন হোল । তখন কলকাতার নানা জায়গায় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ খুব বেড়েছিল; কেশবচন্দ্র একজন অনুগত প্রচারককে সপ্তায় কয়েকদিন গিয়ে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণের জন্য পাঠান। এই প্রচারক ছিলেন বিখ্যা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। এই পাঁচধরনের অনুষ্ঠান ছাড়াও ভারতসংস্কার সভার আহ্বানে কেশব সেন মশাই আরো কিছু কাজে হাত দিয়েছিলেন। হরনাথ বসু নামে ব্রাহ্মসভার একজন উৎসাহী সদস্যের প্রতিষ্ঠিত একটা স্কুল নিজের হাতে নিয়ে অ্যালবার্ট স্কুল নাম দিয়ে চালাতে লাগলেন এবং তারপরে কলেজ

স্কোয়ারের পাশে পুরানো প্রেসিডেন্সী কলেজের ব্যবহার করা একটা বাড়ী কিনে তাএ এলবার্ট স্কুলের স্থাপনা করলেন। এই সময় তিনি ভারত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। ১৮৭২ সালে শুরু হওয়া এই কাজটি কেশব সেন একটি প্রধান কাজ বলা যায়। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে ও তার সাহায্যে বাংলার সমাজে নারী - স্বাধীনতার আন্দোলন ও চর্চা শুরু হয়। ব্রাহ্মসমাজের ভেতরে অনেকদিন ধরেই এই চর্চা চলছিল । এই সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রকাশ্যে নারী পুরুষে পাশাপাশি বসে উপাসনা করার দাবী নিয়ে কেশব সেনের সাথে কিছু নবীন উপাসকদের মহাবিরোধ তৈরী হয়। কেশব সেন এক সময়ে ব্রহ্মমন্দিরে পর্দা প্রথা তুলে দিলেন বটে কিন্তু স্ত্রি জাতির উন্নতি - শিক্ষা বিষয়টিকে নিয়ে প্রাচীন ও নবীনে পার্থক্যটা থেকেই গেল ভিতরে ভিতরে। কেশবচন্দ্র ভারতাশ্রম ভবনে বয়স্কা বিদ্যালয় স্থাপন করে নারী শিক্ষার যে আদর্শ অনুসরন করলেন তা অগ্রসর দলের পছন্দসই হোল না। তারা নিজের পরিবারের মহিলাদের সেই বিদ্যালয়ে পাঠালেন না। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মশায়ের উদ্যোগে ১৮৭৩ সালে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপিত হোল। ১৮৭২ সালের শেষ দিকে একজন শিক্ষিতা ইংরেজ রমণী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কুমারী এক্রয়েড। ভারতের মহিলাদের শিক্ষার দুর্দশার কথা শুনে তাঁর আসা আগের পরিচয়ের সূত্র ধরে তিনি ব্যারিষ্টার মনোমোহন বসুর বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন এবং নতুন প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুমহিলা বিদভালয়ের' দেখাশোনার ভার নিলেন । আনন্দমোহন বসু ব্যারিষ্টারি পাশ করে দেশে এসে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির পাশেই দাঁড়ালেন। কয়েক বছর পর এক্রয়েড পরিণীতা হয়ে শহর ত্যাগ করলে সেই বিদ্যালয়টি 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' নাম ধারন করল এবং আরো কিছু বছর পরে এই বিদ্যালয় বেথুন কলেজের সাথে মিশে গেল ।এই সময় ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে আরেক কাজের মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন করতে চাইলে মতবিরোধ ও আন্দোলন তৈরী হোল। কেশবচন্দ্র নিয়মতন্ত্র - প্রণালীর পক্ষে ছিলেন না । সভাসমিতি ও প্রকাশ্য কাগজে আন্দোলন চলল । অবশেষে নিয়মতন্ত্র পক্ষীগণ 'সমদর্শী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করল ও তাঁর 'সমদর্শী' নামে পরিচিত হোল। স্ত্রী স্বাধীনতা পক্ষের অণেকে এখানে ঢুকে গেল। এর চরম ফলাফলে অবশেষে ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় গৃহবিচ্ছেদ ঘটল। বিবাহ পদ্ধতি নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের দুটি ভাগের মধ্যে সমস্যা তৈরী হোল। কেশবচন্দ্রের প্রবল আকর্ষণ কমতে থাকলো। এসময় যখন ব্রাহ্মসমাজ আগের শক্তি ও গৌরব হারাচ্ছে এমন সময় দুজন প্রতিভাশালী নেতার আবির্ভাব ঘটে। আনন্দ মোহন বসু ও সুরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। দুজনেই ছাত্রদলের মধ্যে কাজ করতে আরম্ভ করলেন ।হাজার হাজার যুবক তাদের টানে ছুটে আসতে লাগল। যুবদল যেন ব্রাহ্মসমাজের দিকে পিঠ ফিরিয়ে রাজনীতি ও জাতীয় উন্নতর দিকে মুখ ফেরাল। এই সময় ভারতসভার স্থাপনা হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের রাজনীতির শিক্ষা ও আন্দোলনের উপযোগী একটি সভার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই ১৮৭৬ সালে এই সভার স্থাপনা । আনন্দমোহন ও

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতসভা কয়েকজন ভ্রমণকারী বক্তা নিযুক্ত করে নানা স্থানে সভা করে বক্তৃতা করাতে লাগলেন।এঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চোখকে আকর্ষণ করা, অর্থ সংগ্রহ, রাজনীতির চর্চার অভ্যাস তৈরী এসব কাজ করতে লাগলেন। ১৮৭৮ সালে কোচবিহারের নাবালক রাজার সাথে কেশবচন্দ্রের অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মদের মধ্যে মতভেদ ঘটায় উন্নতিশীল ব্রাহ্মরা দুভাগে ভাগ হয়ে যান। প্রদিবাদকারিরা তেরী করেন 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। এদরা নতুন উৎসাহ ও উদ্যোগে খোলেন সিটিস্কুল। ১৮৭৯ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যরা ছাত্রদের জন্য স্থাপন করেন 'ছাত্রসমাজ'। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলম্বন করা শিক্ষা প্রণালী ধর্মশিক্ষা ছাড়া এই অভাবকে কিছুটা দূর করা ছিল ঐ সমাজের উদ্দেশ্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ

রাজনারায়ন বসু :

১৮২৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর কলকাতার পাঁচ ক্রোয়া দক্ষিণ পূর্বের বোড়াল গ্রামে, প্রসিদ্ধ বসু বংশে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন রামমোহন রায়ের অনুগত শিষ্য নন্দকুমার বসু। ছোটবেলায় বোড়াল গ্রামের পাঠশালাতে প্রথম তাঁর পড়াশোনা শুরু হয়। সাত বছর বয়সে তাঁর বাবা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন ও আরেক গুরুর পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। সেখান ধেকে শম্ভু মাষ্টারের বৌ বাজারের স্কুলে কিছুদিন ইংরাজী পড়ে সোজা হেয়ার স্কুল। একানে ত২আর প্রতিভার লক্ষণ প্রকাশ পেল। স্কুলের ছেলেদের সাথে মিলে স্থাপন করলেন একটা সমালোচনা সভা এবং সভার এক অধিবেশনে পাঠ করলে 'Wherher Science is Preferable to Literature' বিষয়ে বক্তৃতা। হেয়ার তাঁকে কৃতী বালক হিসাবে হিন্দু কলেজে পাঠালে সেখানে গিয়ে প্রতিভাশালী শিক্ষক ও কৃতিত্ব সম্পন্ন সহপাঠী বন্ধুদের সাথে যুক্ত হয়ে তাঁর জ্ঞানের তেষ্টা বেড়ে গেল। শিক্ষকদের মধ্যে সুবিখ্যাত ডি. এল. রিচার্ডসন, রীজ সাহেব ও সহপাঠিদের মধ্যে মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৪ সালে তিনি কলেজ পাশ করলেন। ১৮৪৬ সালে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষন থেকে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন; এবং উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করে তত্ত্ববোধনী পত্রিকা সম্পাদনের ব্যাপারে অক্ষয়কুমার দদত্ত মশাইকে সাহায্যকরেন। ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত সে কাজ করেন। ১৮৪৯ সালে সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০; ব্রাহ্মসমাজে বেদের অভ্রান্ততাবাদের মতকে ত্যাগ করার বিষয়ে রাজনারায়নের ভূমিকা উল্লেখ্য। ১৮৫১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার হিসেবে যোগ দিয়ে তিনি নানা দেশহিতকর কাজে যুক্ত হয়ে পড়লেন - (১) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতি সাধন। (২) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃস্থাপন। (৩) জাতীয় গৌরব সম্পাদনী

সভা স্থাপন। (৪) সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন (৫) বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। (৬) ধর্মতত্ত্ব দীপিকা বই চালুকরা। (৭) Defence of Bhrahmoism and of the Brahmo Samaj নামে বই প্রকাশ।

১৮৬৬ সালের মার্চ মাস থেকে বেশ অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় তিনি কাজ থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন এবং কলকাতা ফেরেন। কিছুটা সুস্থহয়ে আবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

টিপ্পনী

আনন্দমোহন বসু :

নব্য বঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতাদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান পুরুষ। পূর্ববাঙ্গলার ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি গ্রামে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। পিতা পদ্মলোচন বসু ময়মনসিংহ নগরে শেরেস্তাদারী ককাজ করতেন। ছোটবেলাতেই তিনি বাবাকে হারালে তাঁর মা সন্তানদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি ও শাসনশক্তি দিয়ে তাঁদের পালন করতে লাগলেন। ধর্ম পরায়ণা ছিল সেই রমণীর প্রধান চরিত্র বৈশিষ্ট্য। আনন্দমোহনের চরিত্রেও ধর্মনিষ্ঠা ও সাধুভক্তির লক্ষণ মেলে। তাঁর নয় বছর বয়সে ছাত্র বৃত্তির পরীক্ষায় পাশ করে চারটাকা বৃত্তি পেয়ে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ইংরেজী পড়তে আরম্ভ করেন। ১৮৬২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আসেন এবং সেখানে এল. এ, বি.এ, এম. এ সব পরীক্ষাতেই প্রথমস্থান অধিকার করেন। কলকাতা এসে অন্যান্য যুবকদের মতো তিনি কেশব চন্দ্রের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন; ১৮৬৯ সালে যখন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা হয় তখন অন্যান্য কিছু বন্ধুর সাথে তিনিও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষীত হন। কলেজ থেকে পাঠ করেই তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অঙ্কশাস্ত্রের প্রফেসারের কাজ পান। এই কাজ করতে করতে তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তই পান। ১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র যখন বিলেত যান তখন আনন্দ মোহন ও তাঁর সাথে যান। ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত সেখানে থেকে কেম্ব্রিজে পড়াশোনা করেন এবং তখনকার সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্গলার উপাধি লাভ করেন। সেখানে থাকাকালীন ভলান্টিয়ার দলে ঢুকে যুদ্ধবিদ্যা শিখতেন, ভারতীয় রাজনিতি আলোচনা করতেন, সভা সমিতিতে রাজনীতি বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। ১৮৭৪ সালে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় পাশ করে যখন দেশে ফিরলেন তখন ব্রাহ্মসমাজের যুদ্ধ - স্ত্রী স্বাধীনতার আন্দোলন ও সমাজের কাজে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী স্থাপনের আন্দোলন উঠেছে, যুবক সমাজের ওপর ব্রাহ্মসমাজের শক্তি কমেছে, কেশবসেন যোগ - ভক্তি বৈরাগ্য নিয়ে সরে গেছেন। তিনি ছাত্রদের নিয়ে কাজ শুরু করলেন। তাদের জন্য সভা স্থাপন করে নানা উন্নতির চেষ্টা ও অণ্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের স্ত্রী স্বাধীনতা পক্ষের ও নিয়মতন্ত্র ব্যাক্তিদের সাথে এক হয়ে দুই - ই বিষয়ে সাহায্য করতে লাগলেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, ভারত সভা স্থাপন, পরে ব্রাহ্ম সমাজ ভেস্তে গেলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সাথে যুক্ত হয়ে কাজকর্ম

টিপ্পনী

করা এই সব কাজ করতে করতে শিক্ষাবিভাগে তাঁর কাজ শুরু হোল। ১৮৭৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সেনেটের একজন ফেলোরূপে বরণ করেন ; ১৮৭৮ সালে সেনেট থেকে সিন্ডিকেটে গিয়ে দেশের শিক্ষানীতি গঠনে সহায়তা করেন। সিটী স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৮৪ সালে লর্ড রিপনের বিশেষ অনুরোধ এডুকেশন কমিশনের সদস্য হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে নজেদের প্রতিনিধি হিসাবে লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের সভাতে পাঠালে তিনি মনোনীত হন। এছাড়াও কলকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনরও মনোনীত হন। ন্যাশানাল কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। এই ভাবে দিনরাত কাজের সাথে যুক্ত এই মানুষটি ১৯০৭ সালের ২০ শে আগষ্ট রুগ্ন - ভগ্ন দেহে প্রাণ ত্যাগ করেন।

দুর্গামোহন দাস :

বিক্রমপুর জেলার তেলিরবাগ গ্রামে বাঙলার ১২৪৮ সালে দুর্গামোহন দাসের জন্ম। কিছুদিন গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা করে বরিশালে আসেন ; সেখানে ইংরাজী স্কুলে পড়ে জুনিয়র ফেলোশিপ পেয়ে কলকাতার হিন্দু কলেজে আসেন। এখানে পড়াকালীন ইতিহাসের অধ্যাপক এডওয়ার্ড কাউএলের সংশ্রবে এসে খ্রীষ্টীয় ধর্মের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হন। এই পথে এগিয়ে তিনি আরো বেশী আনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। ঘটনাক্রমে তাঁর হাতে মার্কিন সাধু থিওজের পার্কারের বই এলে তাঁর মত পরিবর্তিত হয় এবং পার্কার দেখানো উদার আধ্যাত্মিক ও সার্ব ভৌমিক একেশ্বরবাদ অবলম্বন করেন। একারণেরই তাঁর মন ব্রাহ্মসমাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বরিশালে গিয়ে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও এই ধর্ম প্রচারে উৎসাহী হন। কলকাতা থেকে কয়েকজন প্রচারককে নিয়ে যান ও তাঁদের সাহায্যে ব্রাহ্মদের পত্নীদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করেন। তাঁর পত্নী ব্রহ্মময়ী সব কাজে তাঁর সহায় ও উৎসাহ দায়িনী হয়ে উঠলেন। দেখতে দেখতে বরিশাল ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের কেন্দ্র হয়ে উঠল। বিধবা বিবাহ চালু করার ক্ষেত্র তাঁর ভূমিকা কল্পনাতীত। তিনি বিদ্যাসাগর মশায়ের সাহায্যে নিজের বিমাতার বিধবা বিবাহ দেন। এই ঘটনায় সমাজ পুরোপুরি ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল, এরপর দীর্ঘদিন ধরে নানারকম সামাজিক নির্যাতন তাঁকে সইতে হয়েছিল। এই সমস্ত কাজে তাঁর স্ত্রী ছিলেন তাঁর সঙ্গিনী। তাঁর দৃষ্টান্ত তখন বরিশালের যুবকদের সাহসী করছিল। লাঘুটিয়ার জমিদার রাজচন্দ্ররায়ের ছেলেরা এই সময় ব্রাহ্মসমাজে যোগদিল। বরিশালে দিন দিন বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হোল। ১৮৭০ / ৭১ সালে তিই কলকাতার হাইকোর্টে ওকালতি করার কাজে এলে কলকাতার সমাজ সংস্কার করতে চাওয়া নব্য ব্রাহ্মদলের কেন্দ্র হয়ে উঠলেন। তখন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নারী জাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে আন্দোলন প্রবৃত্ত ছিলেন। এমন উদারচেতা, স্বজন প্রিয় কর্তব্য পরায়ন মানুষটি ১৮৯৭ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় :

বাঙলার ১২৫১ ও ইংরাজীর ১৮৪৫ সলের ৯ই বৈশাখ বিক্রমপুরের মাগুরখন্ড গ্রমাএ জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের বংশ ছিল সুপ্রসিদ্ধ কুলীন বংশ। ছোটবেলায় গ্রামের পাঠশালায় তিনি পড়াশোনা শুরু করলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে ইংরাজী শেখানোর উদ্দেশ্যে ফরিদপুর নিয়ে গিয়েও ফিরিয়ে আনতে হোল। নানা অসুবিধার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া হোল না, এ অবস্থাতেই তিনি পরপর তিনটি জায়গায় শিক্ষকতার কাজ চালিয়ে গেছেন। এসময়ই তাঁর জীবনে একটা বড় পরিবর্তন ঘটে গেল। ১৭ বছর বয়সে তিনি শুনলেন কোন এক বিপথগামিনী কুলীন মেয়েকে তাঁর আত্মীয়রাই বিষ দিয়ে হত্যা করেছে। এযে বহু বিবাহের ফলাফল তা বুঝতে তাঁর দেরী হোলনা। তিনি বহুবিবাহের প্রতি ক্ষিপ্ত হলেন ও ভারতীয় নারী কুলের দুঃখ দুর্দশার কথা ভেবে ব্যাথ্যা পেলেন। এই মনোভাব নিয়েই তিনি 'অবলাবান্ধব' নামে সাপ্তাহিক কাগজ বের করেন। ১৮৭০ সালে দ্বারকানাথ 'অবলাবান্ধব' সাথে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। ক্রমে তাঁকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যেই অবলাবান্ধব নারী হিতৈষী দল দেখা দিল। ব্রাহ্ম সমাজের অন্যান্য আলোচনা ও আন্দোলনের মধ্যে নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনা ও আন্দোলন চলল। ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র ভারতাশ্রমে বায়স্থ বিদ্যালয় স্থাপন করলেও অবলাবান্ধব দল তাতে যোগ দিলেন না। ১৮৭৩ সালে গাঙ্গুলি মশাই এক্রয়েড নামে ইংরেজ মহিলাকে তত্ত্বাবধায়িকা করে 'হিন্দমহিলা বিদ্যালয়' নামে বালিকাদের জন্য উচ্চশ্রেণীর বোডিং স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুল বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় রূপে বেথুন কলেজের সাথে মিশে গেল। অপরদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের রাজনীতি চর্চার জন্য ভারতসভা স্থাপন হলে কয়েকবছরের মধ্যে তিনি এর সহকারি সম্পাদক হয়ে নানারকম রাজনৈতিক কাজের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়লেন। আসামের কুলীদের জন্য কাজে হাত দিলেন ও আসাম গেলেন। সেখানে গিয়ে তাদের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখে 'সঞ্জীবনী' সংবাদপত্রে প্রকাশ করলেন যার ফল স্বরূপ কুলী সংক্রান্ত অসংখ্য মোকদ্দমা ও পরিণতিতে সরকার কুলী আইন সংশোধন করতে বাধ্য হলেন। ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি হলেন তার অণ্যতম প্রধান সারথি। প্রতিষ্ঠার আগে এর উদ্যোগকারী ব্রাহ্মরা 'সমালোচক' নামে একটা সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করলে তিনি এর সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। তিনি কয়েকবছর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকও ছিলেন। তাঁর প্রথম পত্নীর মৃত্যুর অনেকদিন পর সে সময়ের উচ্চশিক্ষিতা কাদম্বিনী বসুর পাণিগ্রহণ ককরেন। কুমারী কাদম্বিনী ১৮৮৩ তে বি. এ পাশ করেন। গঙ্গোপাধ্যায় মশাই কিছুদিন পরে তাঁকে বিবাহ করে মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য উৎসাহিত করে তোলেন। তারই প্রেরণায় কাদম্বিনী মেডিকেল কলেজে ভর্তি ও সেখান থেকে বেরিয়ে চিকিৎসা বিদ্যার পড়াশোনা শেষ করতে ইংল্যান্ডে যান ও ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা ডাক্তার হয়ে দেশে ফিরে চিকিৎসার

টিপ্পনী

কাজ শুরু করেন। বলা বাহুল্য, এসবই কাদম্বিনীর পরিশ্রম অধ্যাবসায় আর দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সর্বক্ষণ প্রেরণদাতা হওয়ার ফলাফল।

মনমোহন ঘোষ :

টিপ্পনী

১৮৭০ থেকে ৮০ এই সময়ের মধ্যে যে সব পুরুষের শক্তি বাঙ্গালার সমাজে বিশে অনুভূত হয়েছিল তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনোমোহন ঘোষ ১৮৪৫ সালের ২৩ শে মার্চ, পূর্ববাঙ্গলার বিক্রমপুরের একটি গ্রামে তাঁর জন্ম। ছোটবেলায় নদীয়ার কৃষ্ণনগর থেকে কৃষ্ণনগর কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন। নীলের হাঙ্গমা ও আন্দোলনে সমস্ত তথা নদীয়া যখন ভীষন উত্তেজিত তখন কৃষ্ণনগরে থাকতে থাকতে ১৮৬০ সালে নীলকরদের বরুদ্ধে তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন ; হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুতে সেলেখাটি ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে পারেনি। এ ঘটনাই তাঁকে 'ইন্ডিয়ান মিরর' প্রকাশে উৎসাহিত করেছিল। ১৮৬১ তে হিন্দু কলেজে পড়াশোনা করতে আসা মনোমোহনেদর সাথে কেশবচন্দ্রের বন্ধুত্ব হ এবং এই দুই বন্ধু মিলেই 'ইন্ডিয়ন মিরর' নামে পাক্ষিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৬৭ সালে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় পাশ করে দেশে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে কাজ শুরু করেন। খুব অল্পদিনেই তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। দেশে ফিরেই তিনি স্ত্রী শিক্ষার উন্নতির দিকে মনোযোগী হন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বেথুন কলেজের সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কোন লোক রাজকর্মচারীর অবিচারে যন্ত্রণা পাবে দেখলে তাদের পক্ষে তিনি মোকদ্দমা চালাতেন। ১৮৭২ সালে নারীদের উচ্চশিক্ষা নিয়ে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদেদর মধ্যে আন্দোলন তৈরী হলে তিনি উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতিদের সমর্থন জানালেন। বঙ্গমহিলা ইদ্যালয়ের তত্ত্বাবায়িকা কুমারি এক্রয়েড এদেশে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে কাজ চলিয়েছেন। তিনি ছিলেন 'ভারতসভা'র প্রধান পরামর্শদাতা। জাতীয় কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হে আলোচনার বিষয়ে তিনি বিচার ও শাসন বিভাগকে আলাদা করার প্রস্তাব দেন। ১৮৬৯ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে দেশবাসীর মনে স্বজাতি প্রেম জাগানোর জন্য নানা স্থানে গিয়ে বক্তৃতা করেন। ১৮৮৫ তে স্বদেশীয় প্তিনিধি রূপে ইংল্যান্ডে গিয়ে ভারতের দুঃখ দুর্দশা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতার ফলে অনেকের দৃষ্টি এদেশের দিকে আকৃষ্ট হয়। ১৮৬৯ সালে দারুণ পক্ষাঘাতে রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : লাহিড়ী মহাশয়ের শেষজীবন, কৃষ্ণনগর বাস; পারিবারিক দুর্ঘটনা, পুত্রকন্যার অকালমৃত্যু; ধৈর্য্য ও ভগদ্ভক্তি।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

60

কাজ থেকে অবসর নিয়ে কৃষ্ণনগরে ফেরার পর ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রামতনু লাহিড়ী মশায়ের কন্যা লীলাবতীর বিবাহ হয়, ডাক্তার তারিণীচরণ ভাদুড়ীর সাথে। পচরচলিত রীতি অনুসারে এই বিয়ে হয়নি। লাহিড়ী মশাই নিজে ঈশ্বরকে সাক্ষী করে কন্যা

সম্পাদন করেছিলেন। এই বিয়েতে নদীয়াধিপতি মহারাজ সতীশচন্দ্র সহ কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশেষ ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। রায়বাহাদুর যদুনাথ রায়, কুমারনাথ রায়, কৃষ্ণনাথ রায় ও দেবেন্দ্রনাথ রায় এই কয় ভাই লীলাবতীর বিয়েকে নিজের বাড়ির বিয়ে মনে করে সবসময় সবদিকে নজর রাখছিলেন। কৃষ্ণ নগরের সাধারণ মানুষ থেকে সম্ভ্রান্ত ভদ্রজন আর তাঁর ছাত্রগণের; লাহিড়ী মশায়ের প্রতি ছিল এক অসীম শ্রদ্ধা। সুপ্রসিদ্ধ রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নাম এক্ষেত্রে সবার প্রথমে আসে। ১৮৬১ তে লীলাবতীর পুত্র হলে তার নসাম রাখা হয় চারুচন্দ্র। তাঁর অন্নপ্রাশনেও কৃষ্ণনগরের সকল শ্রেণীর মানুষেরা নিমন্ত্রণ পেয়েছিল লাহিড়ী মশায়ের কাছ থেকে। সে সময় কিছুদিনের জন্য তিনি গোবর ডাঙ্গার প্রসিদ্ধ ধনী পরিবার, মুখুয্যে বাবুদের বাড়ীতে নাবালক পুত্রদের অভিভাবক রূপে কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রের খ্যাতির দেশে এতটাই ছড়িয়ে ছিল যে অভিভাবক কাকে করা যাবে এই প্রশ্ন উঠলে গভর্ণমেন্টের পরামর্শে তাঁকেই নিযুক্ত করা হয়। ১৮৬৯ সালে কলকাতা শহরে লাহিড়ী মশায়ের ভাইঝি অন্নদায়িনীর বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি অণুসারে হলে তিনি কন্যাকর্তা হয়ে এই বিবাহের কাজ সম্পন্ন করেন। কলকাতা নিবাসী সুপরিচিত ব্রাহ্ম হরগোপাল সরকারের সাথে এই বিয়ে হয় এবং এর ফল স্বরূপো ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সাথে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁর ঈশ্বরভক্তি ছিল অসীম। ১৮৭২ সালে যখন উন্নতশীল ব্রাহ্মদলের স্ত্রী স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হোল তখন তিনি স্ত্রী স্বাধীনতা পক্ষীয়দের প্রতি সমর্থন জানালেন। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন হলে তিনি তাঁর কন্যা ইন্দুমতীকে সেখানে ভর্তি করালেন। ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র 'ভারতাশ্রম' গড়লে লাহিড়ী মশাই তাঁর পরিবারের সাথে সেখানে গিয়ে থাকতে শুরু করেন। তাঁর সাধু তা, পান্ডিত্য, সত্যকথা বলা, বন্ধুপ্রীতি ছিল দেখার মত। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়তে পড়তে অসুসথ হলেন, যক্ষার লক্ষণ দেখা গেল। তাঁর সেবার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন ইন্দুমতী। ক্রমে সেই অসুখ বাসা বাঁধল তাঁরও শরীরে। মৃত্যশয্যায় শুয়েও ইন্দুমতী বলতেন - "তোমরা দাদাকে দেখ, তোমরা দাদাকে দেখ ....."। ইন্দুমতীর মৃত্যু হলে রামতনু বাবুর মধ্যে যেন সেই সাধু মনোভাব দেখখা গেল যিনি তীব্র শোকেও অবিচলিত থাকেন। তিনি তাঁর পুত্রকে বাঁচানোর জন্য তার সেবায় নিযুক্ত হলেন। ইন্দুমতীর মৃত্যু নবকুমারকে আহত করল ভীষণ ভাবে। কারণ তিনি জানতেন তাঁরই সেবা করতে গিয়ে ইন্দু অকালে চলে গেলে। এই তীব্র শোকে তিনি একদম মৌন হয়ে গেলেন। অবশেষে অনেক সেবা শুশ্রুষাতেও তাঁকে ফেরানো গেল না ; রামতনু লাহিড়ী হারালের নবকুমারকেও। এসময়েও লাহিড়ী মহাশয় তীব্র শোকে অসম্ভব ধীর রইলেন।

নবকুমার ও ইন্দু চলে গেলে কৃষ্ণনগরের বাড়ী তাঁদের কাছে শ্মশানসম হোল। কৃষ্ণনগরের প্রতি বিমুখ হলেন। লাহিড়ী মশাই ১৮৬৯ সাল থেকে কৃষ্ণনগরের যুবরাজের

টিপ্পনী

যে অভিভাবকতা করছিলেন তা ছেড়ে দিয়ে ১৮৭৯ সালে তাঁরা সপরিবারে কলকাতায় চলে এলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : কলকাতায় আগমন; বন্ধুগণ মধ্যে যাপন; স্বর্গারোহন।।

টিপ্পনী

শোকে ভগ্ন ও রোগে জীর্ণ পরিবারকে নিয়ে ১৮৭৯ সালে লাহিড়ী মশাই কৃষ্ণনগর থেকে এলেন কলকাতায়। তখন তাঁর আর্থিক অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়; এসময়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য কালীচরণ ঘোষ মশাই তাঁর পাসে সবসময় থেকেছেন।

কালীচরণ ঘোষ :

১৮৩৫ সালের মে মাসে যশোরের চৌগাথা গ্রামে এঁর জন্ম। ছোটবেলাতেই বাবা - মা কে হারিয়ে কাকা শ্রীধর ঘোষের অভিভাবকত্বে তিনি বড় হতে থাকেন। ৮ বছর বয়সে কৃষ্ণনগরে আসেন ও কৃষ্ণনগর কলেজের ভালো ছাত্র হয়ে ওঠেন। ১৮৭৫ সালে সিনিয়র বৃত্তি পেয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে আসেন। ১৮৬০ সালে বি. এল পরীক্ষায় প্রশংসার সঙ্গে উত্তর্ণ হয়ে কৃষ্ণনগরে ওকালতীর কাজ শুরু করেন। ১৮৬১ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ নেন এবং ধীরে ধীরে উন্নতি করে আলিপুরে এসে প্রতিষ্ঠিত হন। সম্মানে সাথে এখানে কয়েক বছর ধেকে সরকারের তরফ ধেকে নড়াইলের জমিদারীর বিশৃঙ্খলা মেটাতে পাঠানো হয়। ১৮৮২ তে কলকাতার হ্যারিসন রোড় ও খিদিরপুরের ডকের জমি কেনার ভার পড়ে তাঁর ওপর। বিষয়কাজে সবার প্রীতি ও শ্রদ্ধার মানুষ হয়ে ১৮৯২ সালের এপ্রিল মাসে পেনশন নিয়ে কাজ থেকে অবসর নেন এবং কলকাতায় বাস করেন। লাহিড়ী মশায়ের অসময়ে ইনি ত২আদের সবদিক থেকে সহায়তা করেছেন। তাঁকা কলকাতায় এলে ঘোষ মশাই নিজের খরচে বাড়ী ভাড়া করে সেখানে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। ১৮৯৪ সালের ৩ রা মেকলকাতায় নিজের বাড়ীতে কালীচরণ ঘোষের জীবনাবসান হয়।

রামতনু লাহিড়ী কলকাতায় এসে সবার প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় দিনকাটাছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শরৎ বাবা - মায়ের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল। কিন্তু জীবনে যেন আঘাত দিতে কসুর করে না। ওলাহিড়ী মশায়ের ছোট ছেলের অকাল মৃতভু হোল ম্যালেরিয়ায়, তাঁর পত্নী বিষম জ্বর রোগে ভবধাম পরিত্যাগ করলেন, ১৮৯১ এর ২৮ শে জুলাই সুখ দুঃখের বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তারপরে ককালীচরণ ঘোষ - একে একে আপণজনেরা চলে গেল। ধীরে ধীরে লাহিড়ী মশায়েদর শরীর মও ভেঙে যেতে লাগল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা - ভক্তি ছিল। মৃত্যুর আগে তাকে একবার দেখতে চাইলে, দেবেন্দ্রনাথ একথা শুনে বাহকের পিঠে চেপে এলেন। বৃদ্ধে বৃদ্ধে সমাগমে প্রাচীন ভাবের প্রাচীন আনন্দ জেগে উঠল। মহর্ষি বললেন - "স্বর্গে দেবগণ

তোমার জন্য অপেক্ষা ককরিতেছেন; তোমাকে তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করিবেন।" এরপর ১৮৯৮ সালের ১৩ই আগষ্ট রামতনু লাহিড়ী ইহলোকের মায়া ত্যাগ করলে বহু ব্যাক্তি খালি পায়ে মৃতদেহ বহন করে শ্মশানের দিকে যাত্রা করলেন। শ্মশান ঘাটে পৌঁছে তাঁর নশ্বর দেহ চিতানলে অর্পণ করা হোল ; অবিনশ্বর যা; তা অমৃতের ক্রোড়ে আগেই আশ্রয় নিয়েছিল।

টিপ্পনী

৩. রামতনুর জন্মকথা, সমকাল ও কলকাতার অবস্থা :

উর্বেই উল্লেখ হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই কৃষ্ণনগর ছিল দক্ষিণবঙ্গের রাজধানী। এই কৃষ্ণনগরে লাহিড়ী পরিবারের সন্তান রামতনু লাহিড়ী। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র মাসে বারুইহুদা গ্রামে মাতুলালয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম। তাঁর সর্বজৈষ্ঠ কেশবচন্দ্র লাহিড়ী শিবনিবাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সর্বকণিষ্ঠ কালীচরণ লাহিড়ী কৃষ্ণনগরের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া বাকি সকলেই বারুইহুদাতে ভূমিষ্ঠ হন। রামতনুর পিতা রামকৃষ্ণ লাহিড়ী বারুইহুদা গ্রামবাসী। তিনি ছিলেন রাজবাড়ির দেওয়ান। রাধাকান্ত রায় মহাশয়ের কণ্যা জগদ্ধাত্রী দেবীর পাণিগ্রহণ তিনি করেছিলেন। জগদ্ধাত্রীঔ দেবী যে রায় বংশেদর কণ্যা তাঁরা কৃষ্ণনগরের দেওয়ান চক্রবর্তীর বংশ বলে বিখ্যাত। এ২দেদর পূর্বপুরুষ ষষ্ঠীদাস চক্তবর্তীর খাঁ, ভাদুড়ী, সান্যাল, লাহিড়ী, মৈত্রেয় প্রভৃতি ছয় - ঘর প্রসিদ্ধ কুলীণব্দে স্থাপন করেছিলেন বলে ছয় ঘরের প্রতিষ্ঠা কর্তা হিসেবে তিনি বিখ্যাত। তখন থেকেই এই দেওয়ান বংশের অনেকেই রাজবাড়ির কাজ করে আসছেন। এঁরা ইচ্ছে করলেই রাজবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ করে নিজেরাই রাজসম্পত্তির অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। বরং তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে রাজাদের বিষয় রক্ষা করেছেন। এখনও কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির অনেক বিষয় তাঁদের নামে বানামী হয়ে রয়েছে।

যাইহোক এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে উক্ত রায় পরবারের সঙ্গে লাহিড়ী পরিবারের একটি প্রীতির সম্পর্ক ছিল। লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম কালে তাঁর পিতা রামকৃষ্ণ লাহিড়ী সামান্য পৈতৃক বিষয়ের আয়ের দ্বারা ও তৎকালীন প্রসিদ্ধ লালা বাবুদের ম্যানেজারী রে যা উপার্জন করতেন তা দিয়ে কষ্টে সংসার যাত্রা নবির্বাহ করেও সন্তানদের সর্বদায়ই কুসঙ্গ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন। প্রতিদিন সকালে বিষয় কর্ম থেকে অবসৃত হয়ে কিছুসময় ধর্মালোচনা করতেন। কখনো বা স্থানীয় আদালতে কাজ করতেন। দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারোমাসে তেরো পার্বন, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুককে দা, স্বীয় ভবনে শাস্ত্র পাঠ, কথকতা প্রভৃতি নানা বিষয়ের জন্য নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবার সমুদয় কাজের জন্য তিনি কৃষ্ণনগরে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ লাহিড়ী নিজে যেমন সাধু ছিলেন, তেমনি সদাশয় ব্যাক্তিদের সঙ্গে মিশতেন। যাইওক এরকম পিতা, পাতা এবং জৈষ্ঠের কোলে শিশু

টিপ্পনী

রামতনু জন্মগ্রহন করেছিলেন। শিশু রামতনু ভূমিষ্ঠ হলে স্বল্পকালের মধ্যেই বারুইহুদা ও কৃষ্ণনগরের লোক জানতে পারলেন দেওয়ানজীর দৌহিত্র জন্মেছে। সূতিকাগৃহের দ্বারে পল্লীবাসিদের মাঙ্গল্য শঙ্খধ্বনিতে ক্ষুদর গ্রামখানি কেঁপে উঠল। বারুইহুদার এই সুসংবাদ কৃষ্ণগরের লাহিড়ী বাড়িতে পৌছে গেল। পথে - ঘাটে - সরোবরের স্নানের কালে মেয়েরা বলতে শুরু ককরলো - "লাহিড়ীদের ছেলে হয়েছে; আহা বেঁচে থাকলে হয় !" কারণ ইতিপূর্বে ছয়টি সন্তানের পর কয়েকটি গত হওয়ার পরে লাহিড়ী পরিবারে এই সন্তানের জন্ম। পঞ্চমবর্ষ অতিক্রান্ত হতেই রামতনুর হাতে খড়ি হলো। শুরু হলো বিদ্যাচর্চা। তৎকালে দেবী চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে পাঠশালা ছিল। সেখানেই রামতনুর পাঠারম্ভ হ। পাঠশালায় রীতি ছিল এই যে বালকেরা প্রথম মাটিতে খড়ি দিয়ে বর্ণপরিচয় করবে। এরপর তালপাতায় স্বরবর্ণ, ব্যাঞ্জনবর্ণ, যুক্তর্ণ, ইত্যাদি লিখতো। এরপর তালপাতা থেকে কলাতায় লেখা শুরু। সবশেষে কাগজে লেখা চিঠি পত্র ইত্যাদি এখানে লেখা শেখানো হতো। এই প্রথানুসারে রামতনু বিদ্যাচর্চা শুরু করলো। ইতিমধ্যে ১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক, মিষ্টার উইলিয়াম অ্যাডমকে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শন করতে নিয়োগ করছেন। অ্যাডাম সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেন এবং তাতে প্রায় চোদ্দ প্রকার কঠিন সাজা দেওয়ার প্রণালীর উল্লেখ রয়েছে। এই সমস্ত কঠিন শাস্তির ভয়ে আনেকসময় বালকেরা পাঠশালা থেকে পালিয়ে চলে যেত। লাহিড়ী মশাই তাঁর দৈণিক লিপিতে একস্থানে উল্লেখ করেছেন তিনিও এক একসময় প্রহারের ভয়ে পাঠশালা থেকে পালাতেন। সেজন্য তাঁর পিতা গভীর মনঃকষ্ট পেতেন। এছাড়া বালক রামতনু লাহিড়ীর ঘোড়া চড়িবার একটা শখ ছিল। বালক রামতনু ঘোড়া চড়ার প্রবণতায় সমবয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গে মিশে কখনো কখনো রাজপথের পাশে বা মাঠে ঘোড়া চড়ে বেড়াতো। এমনকি ঘোড়া চড়বার শখ এতই প্রবল ছিল যে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজনবালক ঘোড়া কেনার জন্য টাকা চুরি করেছিল। তাতে ও রামতনুর উৎসাহ ছিল। এসমস্ত নানা ঘটনা এবং সামাজিক পরিবেশের জটিলতা দেখে রামতনুর পিতা রামকৃষ্ণ লাহিড়ী ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। রাজবাড়ীর সূক্ষম সূক্ষম নানাবিধ ঘটনা ও সমকালের সংস্কৃতিগত সামাজিক জটিলতা ইত্যাদি থেকে সন্তানদিগকে মুক্ত রাখার প্রয়াসে রামতনুর পিতা - মাতা সর্বদায়ই সজাগ ছিলেন। কাজেই এই অল্প বয়স্ক বালকদের আচার ব্যবহার আলাপ পরিচয়ে দূষিত নীতি প্রবেশ করতে পারে এমন সন্দেহে রামতনুর বয়স দ্বাদশ হতে না হতেই তাঁর পিতা রামকৃষ্ণ ও মাতা জগদ্ধাত্রী রামতণুকে কৃষ্ণনগরের বালকদের সঙ্গ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করলেন। রামতনুর পিতা মাতা এতদ্বসত্ত্বেও দেখলেন যে তাঁদের সহস্র সতর্কতার মধ্যেও রামতনু পল্লীর বালকদের সঙ্গে মিশত এবং অনেক বিষয় শিখে যেত যা রামতনুর বয়সের জন্য উচিৎ নয়। ধার্মিক পিতা রামকৃষ্ণ ও মাতা জগদ্ধাত্রী উভয়ই রামতনুকে কৃষ্ণনগর থেকে স্থানান্তরিত করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।এই সময় কেশবচন্দ্র আলিপুরে কাজ করতেন এবং কালিঘাটের

কাছে চেতলায় বসবাস করতেন । পিতা - মাতার উদ্বেগ দেখে কেশবচন্দ্র বালক রামতনুকে কলকাতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ১৮২৬ সালে রামতনু লাহিড়ীর বারো বছর বয়সে কেশবচন্দ্র তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রামতনু লাহিড়ী কালীঘাটের কাছে চেতলায় তাঁর জৈষ্ঠ্য ভ্রাতা কেশবচন্দ্র লাহিড়ীর বাড়িতে এসে উঠলেন এবং এরপর থেকে কলকাতায় রামতনু লাহিড়ীর বিদ্যারম্ভ। কলকাতায় ইতিপূর্বে গৌড়মোহন বিদ্যালঙ্কার, যিনি ডেভিড হেয়ারের প্রিয়পাত্র ছিলেন, তিনি বসবাস করছিলেন। এছাড়া জয়গোপাল তর্কালঙ্কার অর্থাৎ সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ পন্ডিত শ্রীরামপুরের মিশনারীর বেরী সাহেবেদর শিক্ষকরূপে ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রকাশক রূপে বাংলায় পচরিচিত হয়েছেন । এছাড়া ১৮২৪ এ সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। যেখানে প্রেমচাঁদ তর্কবাসীকা, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষালাভ করেছিলেন। এরকম এক শিক্ষামূলক পরিবেশে ও সৎসঙ্গ মেশার সুযোগ পেলেন রামতনু লাহিড়ী মহাশয় । একদিন গৌড়মোহন বিদ্যালঙ্কার রামতনুকে চেতলা থেকে এনে গ্রে-সাহেবের গঙ্গা তীরবর্তি ভবনে হেয়ার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন । হেয়ার সাহেবের ভবনে প্রতিদিন বালকেরা আসলে শুধু মুখে ফেরৎ দিতেন না পরিতোষক পূর্বই একটু মিষ্টি খাইয়ে ছাড়তেন। হেয়ার সাহেবের বাড়ির কাছে একটা মিঠাই ওয়ালার দোকান দিল সেই দোকানেই বন্দোবস্ত করা থাকতো। হেয়ার সাহেবের কাছে ইংরেজি শেখার জন্য মানুষের এত ব্যগ্রতা জন্মেছিল যে তিনি বাড়ির বাইরেই বেরোতে পারতেন না। বাড়ির বাইরে বেরোলেই দলে দলে বালকেরা হেয়ারের পালকি ধরে ছুটতোও । হেয়ার - এর কাছে ইংরেজি শেখানোর জন্য গৌড়মোহন বিদ্যালঙ্কার বালক রামতণুকে নিয়ে উপস্থিত হয় এবং হেয়ারের কাছে ফ্রি-জায়গা নেই বলে প্রত্যাহার করে । গৌড়মোহন বিদ্যালঙ্কার বুঝতে পারেন, বেশকিছুদিন হেয়ারের পালকির পেছনে ছুটতে হবে। অবশেষে হেয়ার সাহেব বুঝলেন এই বালক ছাড়বার পাত্র নয়। বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে এর অধিক আগ্রহ আছে। তখন তাঁকে ফ্রী বালকদের দলে ভর্তি নিতে স্বীকার করে। অবশেষে নানা বিঘ্নতা অতিক্রম করে হেয়ার সাহেব রামতণুকে ভর্তি নিলেন। ইতিপূর্বে ১৮১৭ সালে ২০ জানুয়ারী প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। রামমোহন রায় ও তাঁর বন্ধু হেয়ারের সহযোগে নতুন ধরণের ইস্কুল পাঠভ গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগ নিলেন। ১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হেয়ারের উদোগে 'স্কুল সোসাইটি' নামে আরেকটি সভা স্থাপিত হলো। হেয়ার ও রাধাকান্তদেব তার সম্পাদকের পদ গ্রহণ ককরলেন। কলকাতার নানা স্থানে নতুন প্রণালীতে ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন হলিও । ঠনঠনিয়া কালীতলা, আড়পুলী প্রভৃতি স্থান বিদ্যালয় স্থাপিত হলো । যাইহোক রামতনু লাহিড়ী মহাশয় এমনই এক সামাজিক প্রেক্ষিতে হেয়ারের স্কুলে ভর্তি হলেন । তিনি যে দিন হেয়ারের স্কুলে ভর্তি হলেন, সেদিন ঐ স্কুলে ভর্তি হয়েছলে রাজা দিগম্বর মিত্র। এবং আর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

একজন উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তি ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল। ইনি পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হয়েছিলেন। যাইহোক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে রামতণুর পড়ার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু থাকবার স্থায়ী ব্যবস্থা হলো না। প্রথমে কেশবচন্দ্রের অনুরোধে গৌড়মোহন বিদ্যালঙ্কার তাঁর নিজ বাসায় রাকতে সম্মত হলেন এবং সেখান থেকে স্কুলে পড়তে শুরু করলেন। বালক রামতনু বিদ্যালঙ্কারের হাতিবাগানের বাসাতে বসবাস করতে থাকেন। অল্পবয়স্ক বালকেরা স্থান অভাবে এইরকম বাসাতে বসবাসের সুযোগ নিত। যদিও সেই সমস্ত বাসার পরিবেশ ভালো ছিল না। দেখা যায় এই সমস্ত বাসায় যে সমস্ত বালকেরা বসবাস করতেন তারা অনেকে ফিনফিনে কালো পেড়ে ধুতি পরে বুট পায়ে দিয়ে দাঁতে মিশি লাগিয়ে বাঁকা সিতে কেটে শ্রের বাবুদের অনুকরণ করতো। চরস, গাঁজা প্রভৃতি খেতে শিখতো এবং অনেকেই এর চেয়ে গুরুতর পাপে লিপ্ত হতো। এই সমস্ত বাসায় কচেউ বা কর্মের আশায় নিষ্কর্মা বসে খেতেন। কেউ বা কাজকর্ম করে সামাণ্য উপার্জন করতেন। ভদ্র গৃহস্থরা এই সমস্ত ব্যাক্তিদের অন্ন দান করা কর্তব্যের মধ্যে মনে করতেন। বালক রামতনূ এই রকম একটা ভয়ংকর জায়গায় পড়ে গেলেন। বাসার লোকে বালক রামতণুকে সর্বদাই রাঁধিয়ে নিত। এবং নান প্রকারে খাটিয়ে নিত। ফলত, রামতনুর পাঠের অত্যন্ত ব্যাঘাত হতো। ক্রমশই একথা কেশবচন্দ্রের কর্ণগোচর হওয়াতে কণিষ্ঠকে নিয়ে শ্যামপুকুরে তাঁর পিতার মাতুল পুত্র রামকান্ত খা মহাশয়ের ভবনে রেখে দিলেন। এখানে রামতনু একটু স্নেহ যত্ন পেলেন। রামতু এখানে এসে তাঁর সহপাঠী দিগম্বর মিত্রের সাক্ষাৎ পেলেন এবংদিগম্বরের মকায়ের কাছে তিনি যথেষ্ট আদর যত্ন পেলেন। বলাবাহুল্য রামতনু যেন বিদেশে মাতৃ সমতুল্য একজন মাসি পেয়ে গেলেন। স্নেহ ভালোবাসার কথা চিরদিন লাহিড়ী মহাশয়ের স্মৃতিতে জাগরিত ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই বাবু সংস্কৃতির উন্মত্ততায় আবদ্ধ কলকাতা শহরে রামতনু লাহিড়ী তখন নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে বিদ্যাচর্চায় ও পরবর্তীকালে সমাজ সংস্কারের কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়লেন। কলকাতা শহরের কদর্যতাকে তিনি দেখেছেন, দেখেছেন কলকাতার অন্ধকারের চিত্র, দেখেছেন কলকাতার শিক্ষা সংস্কৃতির চিত্র, ইংরেজ সাহেবদের চালচিত্র, আরও দেখেছেন নব্যশিক্ষিত জানা যুবকদের বাবু কালচার। সমকালের বালক কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত কলকাতার চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন -

"রেতে মশা দিনে মাছি

দুই নিয়ে কল্‌কেতায় আছি

তৎকালীন শহরের স্বাস্থের অবস্থা উন্নত ছিল না। মিথ্যা প্রবঞ্চনা উৎকোচ, জাল জুয়াচুরি প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করে ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। ধনী লোকেরা পিতা - মাতার শ্রাদ্ধে, পুত্র কণ্যার বিবাহে, পূজাপার্বণে প্রচুর অর্থব্যায় করে

পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। সিন্দুরপটির প্রসিদ্ধ মল্লিক পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন। ধনী লোকেরা প্রকাশ্যে বারবিলাসিনীগণের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করতে লজ্জা করতেন না। কোন কোন ধনী প্রসিদ্ধ বাঈজীর জন্য হাজার হাজার থটাকা ব্যায় করতেন। এই সময় শহর ধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা বাবু হতে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী আলোচ্য গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন -

টিপ্পনী

> "এই সময়ে শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে "বাবু" নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছীল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীণ ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। ইহাদের বহিরাকৃতি কি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব? সুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোলে 'নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরস্পায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি,, পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগল্‌স সম্বম্বিত চিনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার এসরাজ বীনা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলোয় আলোয় গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং খড়দহের মেলা ও মহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।"

এই সময়ে শহরে গাঁজার প্রচলন বেশী হয়েছিল। শহরের বিভিন্ন স্থানে গাঁজার আড্ডা বসত। বাগবাজার বটতলা, বউবাজার ইত্যাদি জায়গায় এই আড্ডা ছিল। এছাড়া শহরে সাংস্কৃতিক অণুষ্ঠান হিসেবে কবিগাণ পাঁচালি গাণ চলত। হরঠাকুর, ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব ইত্যাদি কবিয়ালগণ প্রসিদ্ধ হয়েছিলচে। বাংলার প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বর গুপ্ত কিছুদিন কবিগাণের দলে বাঁধনারের কাজ করেছিলেন। পাঁচালি গায়কদের মধ্যে লক্ষীকান্ত বিশ্বাস, গংগানারায়ণ নস্কর বেশ খ্যাতি অর্জণ করেন। এছাড়া শহরের বাবুরা বুলবুলির লড়াই ও ঘুড়ি ওড়ানোতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ ককরতেন। ঢাউস ঘুড়ি, মানুষ ঘুড়ি প্রভৃতি ঘুড়ির প্রচলিত ছিল। শহরের ভদ্র পরিবারের নিষ্কর্মা ব্যাক্তিগণ গড়ের মাঠে গিয়ে ঘুড়ির খেলা দেখতেন।

উনিশ শতকের এইরকম এক সামাজিক প্রেক্ষাপটের আবির্ভূত হন সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়। তিনি বৌদ্ধ মতাবলম্বীদিগের কুসংস্কার ও পৌত্তইলকতার প্রতিবাদ করেছিলেন। গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। সতীদাহ পচরথা রদ করেছেন। অর্থাৎ হিন্দু বিবাহদের সহমরণ প্রথার নিবারণ করতে তিনি তুমুল আন্দোলন করেন। বলাবাহুল্য উইশ শতকের সমাজ সংস্কার

টিপ্পনী

আন্দোলন তিনি প্রথম সারির উদ্যোক্তা। কলোকাতা তথা বাংলার সমাজ ব্যবস্থার মান উন্নয়নে বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ শুরু করেছিলেন সেই প্রতিবাদে রামমোহন রায়ের দলের প্রধান ব্যাক্তিরা হলেন কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এছাড়া তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব ইত্যাদি কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষিত ব্যাক্তিও তাঁর অনুচর ছিলেন। প্রাচীন হিন্দু দলে রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, রামকমল সেন প্রভৃতি শহরের প্রায় সমগ্র বড়লোক রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ছিলেন।

৪. উনিশ শতক : বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার ও হিন্দুকলেজ

১৮২৮ সালে লাহিড়ী মহাশয় স্কুল সোসাইটির স্কুল থেকে বৃত্তই পেয়ে হিন্দু কলচেজে প্রবেশ করেন। রামতনুর হিন্দু কলেজের শিক্ষার বিবরণ দেওবার পূর্বে বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তার ও ইংরেজি শিক্ষার উত্থান এবং হিন্দু কলেজের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে জানা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতাতে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেন এবং সেই বিষয়ে সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা উৎসাহ দেন। তাদের উদ্যোগে ১৭৮১ খ্রীষ্টব্দে কলকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হল। এই কলেজ স্থাপন বিষয়ে গভর্ণর জেনারেল এতই উৎসাহিত ছিলেন যে এই নির্ঞাণের জন্য নিজের তহবিল থেকে ষাট আজার টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন। শোনা যায়, ওর্ট অব ডিরেক্টরসের সদস্যরা নাকি পরে ওই অর্থ তাকে প্রত্যার্পণ করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ে প্রাচীন আরবি ও পারসী রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হতো। এবং একজন প্রাচীন মৌলবী তার তত্ত্বাবধান করতেন। এরপর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কালীধামে রেসিডেনট জোনাথ ডানকান বাহাদুরের প্রযত্নে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। এই জোনাথন ডানকান তৎকালে প্রসিদ্ধ ভারত হিতৈষী ইংরেজদের মধ্যে একজন। এদেশীয়দের সঙ্গে মিশতে, বন্ধুত্ব করতে, তাদের হিত চিন্তা করতে জোনাথন ডানকান বড়ই ভালো বাসতেন। একারণে ভারতবাসী ইংরেরা তাঁকে আধা-হিন্দু বলে মনে রতেন। ডানকান সাহেব কাশীতে বসবাসকাললে বহুসংখ্যক রাজপুত পরিবারকে কণ্যা হত্যা থেকে বিরত হওয়ার জন্য শপথ বদ্ধ করেছিলেন। যাইহোক এদেশে যখন রাজপুরুষদের অনেকে এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাগ্র হচ্ছিলেন তখন যে ইংলন্ডের লোক একেবারে সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন এমনটা বলা যায় না। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ পত্র পুণগ্রহণের সময় উপস্থিত হয়। পার্লামেন্ট মহাসভায় সেই প্রশ্ন উঠলে চার্লস গ্রান্ট নামক একজন ভারতহিতৈষী সাহেব এদেশীয়দেরমধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও ধর্মপ্রচার এবং এদেশে প্রবাসী ইংরেজগণের ধর্মনীতির উন্নতি বিধান একান্ত কর্তব্য বলে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এবং এ বিষয় নিয়ে তিনি একটি ছোট পুস্তিকা রচনা করে বোর্ড অব কন্ট্রোলের

সদস্যষদের কাছে উপস্থিত করেন। এই পুস্তিকা পাঠ করে ক্রীতদাস প্রথা নিবারণকারী সুবিখ্যাত উইলবারফোর্স সাহেব চার্লস গ্রান্টের সাআয্য করতে প্রতিশ্রুত হন। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি ডন্ডাস বাহাদুর প্রথমে তাঁকে সাহায্য করার আশা দেন কিন্তু পরে তা করেননি। ফলত চার্লস গ্রান্তের প্রস্তাবের বিশেষ ফল ফললো না।

বাংলাদেশে বসবাসকারী এদেশীয়দেদর শিক্ষা দেওয়ার প্রয়াস চললেও তা বিশেষ গলপ্রস্থ হল না। হ্যামিল্টন সাহেব বেশ কিছু জেলা পরিদর্শণ করে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সেখান থেকে শিক্ষার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামিল্টনের গণনা অউসাচরে প্রজা সংখ্যা ছিল ৯২৬৭২৩ কিন্তু এদের মধ্যে একটি পাঠশালা দেখতে পাননি। কোথাও কোথাও সংস্কৃত চর্চা ছিল বটে। কিন্তু তা ব্যাকরণ স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রের শিক্ষা সম্বন্ধীয়। যে জ্ঞানের দ্বারা হৃদয় মন সমুন্নত হয়, জগৎ ও ঞানবকে বোঝাবার সাহায্য করে, তেমন কোন জ্ঞান এদেশে ছিল না। এমনকি বেদ বেদান্ত গীতা পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সম্পর্কে পন্ডিতদের কোন জ্ঞান ছিল না।

যাইহোক শিকআ সম্বন্ধে যখন এদেশেদর এমনি দুরাবস্থা তখন নানা কারণের সমাবেশ হয়ে দেশের মানুষের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি বৃদ্ধি হল, বিশেষত ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হল বেশি। বলাবাহুল্য এই সময় বহির্দেশ ধেকে বহু বাণিজ্যগোষ্ঠী এবং ইংরেজ বণিকরা দলে দলে এসে কলকাতা শহরে বাণীজ্যনগর স্থাপন করলেন এবং এই সময়য় বীশেষত কলকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের মধ্যে নিজ নিজ সন্তানগণকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার আকাঙ্খা বাড়তে থাকল। এই সময়ে কলাতার কবেক ক্রোশ উত্তরবর্তি শ্রীরামপুর নগরে কেরী, মার্শালম্যান ও ওয়ার্ড গমক তিনজন ইউরোপীয় খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারক বাস করছিলেন। শ্রীরামপুর তখন দিনেমার কজাতির অধীনে ছিল। সেময় ইংরেজ সরকাত নতুন রাজ্য পেয়ে একপ্রকার ভয়ে ভয়ে বাস করছিলেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে পীতাম্বর সিং নামক কায়ধ জাতির এক ব্যাক্তিকে তারা সর্বপ্রথম খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তারপর ক্রমশ খ্রীষ্ট ধর্মের দীক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়তে ধাকে। ক্রমশ ইংরেজি শিক্ষার স্কুল - কলেজের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৮০১ সালে কলকাতাব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নামে এটি প্রতিষ্ঠান হল। এখানে বাংলা চর্চা ছাড়া অন্যান্য ভাষা ও অঙ্ক - বিজ্ঞান - ভূগোল চর্চা হতো। লর্ড উইলিয়াম কেরী এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছিলেন পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়াম কেরী, রামরাম বসু, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখ। এবং সেইসময় তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' নামক গ্রন্থ রচনার সংকল্প হয় এবং ১৮৪৭ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহায্যে পরোক্ষভাবে দেশের বাংলাভাষা চর্চা শুরু হয়ে গল। সেই সাথে সাথে কলকাতা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সম্ভ্রান্তপরিবারেদর সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার প্রবৃত্তই প্রবল হয়ে উঠল। সুবিধে বুঝে কয়েকজন ফিরিঙ্গি কলকাতার স্থানে স্থানে ইংরেজি স্কুল স্থাপন করলেন। সার্বারণ নামক একজন ফিরিঙ্গি চিৎপুরে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। মার্টীন বাউল নামক আর একজন ফিরিষ্টি আমড়াতলায় এক স্কুল স্থাপন করেন, সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীল সেই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। আরটুন পিট্রাস নামক আর এক ফিরিঙ্গি আরও একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর যাবতীয় ছাত্রের মধ্যে কলটোলার কানা নিতাই সেন ও খোঁড়া অদ্বৈত সেন প্রসিদ্ধ। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ শ্রীরামপুর থেকে পারস্যভাষায় লেখা একটি পুস্তিকা প্রকাশ হয় এবং ঐ পুজস্তিকায় মক্ষদীয় ধর্মের উপরে খ্রীষ্টীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হয়েছিল। পরবর্তিকালে ডেনমার্কের গভর্ণমেন্টের কাছে পুস্তিকা প্রচার বন্ধের জন্য চিঠি লেখা হয়। এইভাবে ধর্মমূলক দ্বন্দ্ব কৌশলে বন্ধ করা হয়ষ। কলকাতার শিক্ষা বিস্তারে প্রথম পর্বে অবশ্যই হিন্দু কলেজের ভূমিকা আছে। ১৮২৪ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী কলেজের গৃহদ্বারের ভিত্তই প্রস্তার হয়। হিন্দু কলেজের জন্য মূলধন রূপে সংগৃহীত ১১৩১৭৯ টাকা। এবং সে তাকা যোশেফ বেরোটো নামক এক ইতালী দেশীয় সওদাগরের হাতে ন্যাস্ত ছিল। যাইহোক এরপর ১৮২৮ সালে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় স্কুল সোসাইটির স্কুল থেকে হিন্দু কলেজে আসলেন। হিন্দু কলেজে আসলেন। হিন্দু কলেজে লাহিড়ী মহাশয় অবৈতনিক ছাত্র রূপে আগ্রগণ্য ছিলেন। সঙ্গে সহপাঠী দিগম্বর মিত্র এসেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত সহপাঠীর সঙ্গে মিলিত হলেন তাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ পরে বিখ্যাত হয়েছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পরবর্তি সময়ে তাঁর বন্ধু সম হয়ে ওঠেন। হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও নামক এক ফিরিঙ্গি যুবক এই সময় তাঁদের শিক্ষক ছিলেন। বঙ্গের নবযুগ প্রবর্তনে এই অসাধারণ প্রতিভাশালী শিক্ষকের অনেকখানি ভূমিকা আছে।

৫. বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন ও বিস্তার

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে 'বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন' নামক অংশে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৪৫ থেকে ১৮৫৩ সাল পর্র্ন্ত সময়ের কথা তুলে ধরেছেন। ১৮৪৬ এর ১লা জানুয়ারি মহাসমারোহে কৃষ্ণনগর কলেজ খোলা হল। এসময় শ্রীশচন্দ্র ছিলেন নদীয়ার রাজা এবং এই নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজের উৎসাহদাতা। ইতিপূর্বে রাজপরিবারের কেউ সাধারণের সঙ্গে শিক্ষালাভ ককরেননি, শ্রীশচন্দ্র প্রথম ব্যাতিক্রম, তাঁর নিজপুত্র সতীশচন্দ্রকে এই কলেজে পড়তে দেবার সংকল্প করলেন এবং তিনি কলেজ কমিটির একজন সভ্য হলেন। সুপ্রসিদ্ধ ডি.এস রিচার্ডসন সাহেব কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হয়েচিলেন এবং লাহিড়ী মহাশয় একশত টাকা বেতনে দ্বিওতীয় শিক্ষক নিয়োজিত

হয়েছিলেন এবং লাহীড়ী মহাশয় ক্রমশ কলেজে জনপ্রিয় শিক্ষক হয়ে ওঠেন এবং তাঁর গুরু ডিরোজিওর মতন তিনি ছাত্রদের সঙ্গে আচরণ করতেন। এমনকি কলেজে ছুটির পর ডিরোজিওর মতো ছাত্রদের সঙ্গে অনেক্ষণ বাক্যালাপে লিপ্ত থাকতেন। কখনো কখনো কলেজের মাঠে ছাত্রদের সঙ্গে খেললা করতেন। এভাবেই কৃষ্ণনগর কলেজে লাহিড়ী মহাশয়ের শিক্ষকতার সূত্রপাত।

কৃষ্ণনগরে লাহিড়ী মহাশয় ক্রমশ সমাজকল্যাণ কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। দেখা যায় কলকাতার অনুকরণে কৃষ্ণনগরেও ব্রহ্মধর্মের আন্দোলন শুরু হয়েছিল, ধর্মসভা স্থাপিত হয়েছিল এবং মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এই সমাজ কল্যাণ কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। লাহিড়ী মহাশয় এই সময় ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বেদান্ত ধর্মাবলম্বী সংস্কার দলের অগ্রণী হলেন। এবং এই সময় ধর্মান্দোলনের যে গোলযোগ কৃ°নগরে শুরু হল মূলত বেদান্ত ধর্ম বনাম খ্রীষ্টধর্মের মত বিরোধের লড়াই - সেই লড়াই মূলত ডিরোজিও শিষ্যদলের চোখে নিন্দনীয় বোধ হয়েছিল। রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীগণের মুখে বেদের অভ্রান্ততাবাদ কপটতা বলে অণুভব করলেন। তিই খ্রীষ্টীয় ধর্মের নিন্দা অনুদারতা বলে ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন। কাজেই লাহিড়ী মহাশয় নবোদিত ব্রাহ্ম ধর্মের সঙ্গে সেখানে যোগ দিলেন না বটে কিন্তু তাঁর আবির্ভাবে কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে এক নবভাবের আবির্ভাব হল। তিনি শিক্ষাগুরু ডিরোজিওর কাছ থেকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন তার একটি অণ্যতম মন্ত্র মানুষের চিন্তা ও কাজকে স্বাধীন রাখতে হবে। এবং সেই মতকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করলেন। ছাত্রদের মধ্যেও সেই ভাবধারা ছড়িয়ে দিলেন।

অনুমান করা হয় কৃষ্ণনগরে গো-হত্যার আন্দোলন এবং বিধবা বিবাহের সভা ১৮৫০ সালের শেষে বা ১৮৫১ সালের শুরুতে ঘটে থাকবে এবং সেই আন্দোলনেই লাহিড়ী মহাশয়ের কৃষ্ণনগরে বসবাস বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে। একদিকে সামাজিক নিষর্যাতন অপরদিকে বৃদ্ধ পিতা ও আত্মীয় স্বজনের মানসিক অশান্তি এই উভয় কারণে তাঁর মন উদ্বিগ্ন হয়ে গেল। ১৮৪৮ কিম্বা ১৮৪৯ সালে তাঁর প্রথম পুত্র জন্মেছিল এবং ঘুমন্ত অবস্থায় খাট থেকে পড়ে মাথায় আঘাত হয়ে মারা যায়। তিন চারদিন নানাপ্রকার চিকিৎসাতেও জ্ঞান হয়নি। অবশেষে সন্তানটি মারা যায়। তাঁর আত্মীয় স্বজন বিধাতার অভিশাপ বলে লাহিড়ী মহাশয়ের বালিকা পত্নীকে অস্থির করে তুললেন - এসকল নান কারণে ১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর চাকরি বদলি করে বর্ধমানে চলে যান দেড়শত টাকা বেতনের হেড়মাস্টার হয়ে। এই সময়ে কলকাতাতে এক নতুন কাজের সূত্রপাত হয়েছিল। এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি ও গভর্ণর জেনারেল মন্ত্রীসভার অণ্যতম সদস্য ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব। এদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য চেষ্টা করছিলেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব ছিলেন ইংল্যান্ডের স্যালফোওর্ড নামক স্থানের কর্ণেল জন ড্রিঙ্কওয়াটারের প্রথম পুত্র। বেথুন যৌবনে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ণ করে র‍্যাংলারের সম্মানিত পোদ অধিকার করেন। তারপর আই ইয়ে পড়াশোনা করে পার্লামেন্টের কাউন্সিলের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ থেকে তিনি গভর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থা সচিব রূপে এদেশে আসেন। তিনি বড়ই মাতৃভক্ত মানুষ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এরূপ কথিত আছে যে মাতৃভক্ত মানুষ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এরূপ কথিত আছে যে মাতৃভক্তি তাঁর স্ত্রী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভারতীয় নারীগণের উন্নতি সাধনের ইচ্ছা সমুৎপন্ন করেছিল।

বেথুন সহেব এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি এদেশে সমাজ কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। এই সময় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ পন্ডিতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। এই পন্ডিতদ্বয়ের সাহায্যে ও দেশের ভদ্রলোকদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তিনি স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি বিধানে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৯ সালের ৭ই মে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বেথুন এই কাজে মনপ্রাণ নিয়োগ করেছিলেন। হেয়ার সাহেব যেমন বঙ্গে বালকদের শিক্ষা নিয়ে মেতেছিলেন। বেথুন সাহেব তেমনি বালিকাদের শিক্ষা নিয়ে মেতে উঠলেন।

১৮৪৯ সালে মহাত্মা বেথুন কলকাতায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেও এটি বাংলাদেশে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় নয়। বহুকাল পুর্ব থেকে এদেশে মেয়েদের লেখা পড়া শেখানোর প্রচেষ্টা চলেছে। সে বিষয়ে আলোচয় গ্রন্থ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা যায়-

> "১৮১৭ সালে স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হওয়া অবধি এই প্রশ্ন উঠে যে বালদিগের ন্যায় বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে কিনা ? এই বিষয় লওয়া সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। রাধাকান্ত দেব উক্ত সোসাইটির অণ্যতম সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন; এবং স্কুল সোসাইটির অধীনস্থ কোন কোনও পাঠশালাতে বালকদিগের সহিত বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার রীতি প্রবর্তিত করেন। সম্বৎসর পরে তাঁহার ভবনে স্কুল সোসাইটির পাঠশালা সকলের বালকদিগের যখন পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ হইত, তখন বালকদিগের সহিত বালিকারাও আসিয়া পুরস্কার লইয়া যাইত।"

এরকমভাবে কয়েকবছর গেল কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে অনেক সদস্যই সহমত পোষণ করলেন না। ফলত ১৮১৯ সালে ব্যাপ্টিস্ট মিশ সোসাইটির একজন সদস্য ভারতিয় নারীগণের দুর্দশা ও শিক্ষার আবশ্যকতা প্রদর্শন করে একটি নিবেদনপত্র প্রকাশ করলেন। সেই নিবেদ পত্রের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে Mr.

Louson and Pearce's Seminary নামক তৎকাল প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের মেয়েরা একত্র হয়ে ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলণের জন্য এক সভায় স্থাপন করলেন, তার নাম - "Female Juvenile Society"। এই সভায় মহিলা সদস্যরা কলকাতার নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করতে উদ্যোগ নেন। রাধাকান্ত দেব এদের উৎসাহদাতা হলেন এবং নিজেই "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে তাদের হাতে অর্পণ করলেন। এভাবে কয়েকবছর চলল। এরপর ১৮২১ সালে স্কুল সোসাইটির কয়েকজন মহিলা সদস্যের প্ররোচনায় ইংল্যান্ডের British and Foreign School Society-র সদস্যগণ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে মিস কুক্ নামে এক শিক্ষিতা মহিলাকে এদেশে পাঠালেন। মিস কুক্ ১৮২১ সালের নভেম্বর মাসে এদেশে এসে দেখলেন যে স্কুলসোসাইটির সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে উক্ত সভা তাঁর ভরণপোষণে গ্রহণে অসম্মত হয়। এই বিপদে চার্চ মিশনারী সোসাইটির সদস্যরা এগিয়ে এসে মিস কুকের ভার গ্রহণ করলেন। উক্ত মিশনের অধীনে থেকে তিনি সোৎসাহে নিজ কার্যসাধনে প্রবৃত্ হলেন।

মিস কুক্ বাংলা ভাষাতে নিজেই শিক্ষালাভ করেন। তিনি যখন নিজে বাংলা শিখছেন তখন তিনি বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য উৎসাইত হন। মিস কুক পাড়ার বালিকাদিগের পিতামাতাদের সঙ্গে কথা বলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দশটি বালিকা বিদ্যালয় খুলে কমপক্ষে ২২৭ টি বালিকা শিক্ষা দিতে থাকেন। মিস কুক্ এভাবে দুবছরের বেশি কাজ করেচিলেন। এরপর উইলসন নামক এক সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তিনি যুক্ত থাকলেও পূর্বে মত সময় দিতে পারতেন না। এই অভাব দূর করবার জন্য কলকাতার কয়েকজন ভদ্র ইংরেজ মহিলা সমবেত হয়ে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আর্মাহাষ্টের পত্নী লেডি আর্মহাষ্ট্রকে নিজেদের অধিনেতৃ হিসেবে নির্বাচন করে স্ত্রীশিক্ষায় উন্নতির জন্য Bengal Ladies Society নামে একটি সভা স্থাপন করলেন। এই সভার মহিলা সদস্যদের উৎসাহে ও যত্নে নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হল। অল্পকালের মধ্যে এই শহরের মধ্যস্থলে একটি প্রশস্থ স্কুল গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং কিছুকাল পরে মেয়েদের উদ্যোগে গৃহের ভিত্তি স্থাপন হয়। ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ কার্যের সাহায্যার্থে রাজা বৈদ্যনাথ বিশ হাজার মুদ্রা দান করেছিলেন। সুতরাং এ থেকে প্রমাণ হয়, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন বিষয়ে মেয়েরা এদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের উৎসাহ ও আনুকুল্য প্রাপ্ত হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষা বিহীন শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন বেথুন সাহেব। পূর্বে বলেছিল সে বালিকা বিদ্যালয় ১৮৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বেথুনের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও পরপর মফস্বলের অণেকস্থানে যেমন বারাসাত, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। বলাবাহুল্য এই স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন নিয়ে কলকাতার হিন্দু সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হল। মদনমোহন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তর্কালঙ্কার শুধু স্ত্রী শিক্ষার বৈধতা প্রমাণ করার জন্য বই লিখলেন না, নিজের কণ্যাকে নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ভর্তি করে ছিলেন। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন সুহৃদগণ নিজ নিজ বাড়ির মেয়েদেদর বিদ্যালয়ে পাঠাতে শুরু করলেন। এই সময় স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে সমাজে নানা আলোচনা শুরু হয়ে গেল। লোকে বলতে শুরু করল -

"এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল !

মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না।।"

শুধু তআই নয় নাটুকে রামনারায়ন রসিকতা করে বাবুদের মজলিসে বলতে শুরু করলেন -

"বাপ্ রে বাপ্ মেয়েছেলে কে লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে ! এ আন শিখাইয়াই রক্ষা নাই ! চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন করিয়া অসচ্ছির করে, অণ্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে।"

এসব কথা তৎকালীন কুসংস্আরচ্ছন্ন লোকজন শুনে হাহা করে হাসতে শুরু করল। এমনকি বঙ্গের রসিক কবি ঈশ্বর গুপত এই স্ত্রী শিক্ষার ভবিষ্যৎবাণী করে লিখলেন -

"যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব নিচ্চে যবে,

এ বি শিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে ;

আর কিছুদিন থাকরে ভাই ! পাবেই পাবে দেখতে পাবে,

আপন হাতে হাঁকীয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

বেথুনের বালিকা বিদ্যালয়ে স্থাপিত হওয়ার পরে যেমন সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হল তেমনি বেথুন সাহেব দেশীয় শিক্ষিত মানুষজনের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলেন। উল্টোদিকে রাজনীতি বিষয়ে এক মহা আন্দোলন সমকালে উত্থিত হল যেখানে তিনি তাঁর স্বদেশী বন্ধুগণের কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়লেন।

যাইহোক ১৭৬৫ থেকে বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যা দেওয়ানী কার্যের ভার ইংরেজদের প্রতি অর্পিত হল। ইতিপূর্বে মুসলিমদের কাছে এই কার্যভার ন্যাস্ত ছিল। ক্রমশ প্রশাসন পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় পশ্চিমী শাসকগণের উদ্যোগে এবং এদেশীয় শিক্ষিত যুবকগণের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হল। বলাবাহুল্য এই স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারেরে ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য হিসাবে পন্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর নিজের প্রচেষ্টা্য় প্রায় ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় বাংলাদেশের নানা গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন।

বিধবা বিবাহের ন্যায় স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কাজেই বাংলার সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পরবর্তি পর্যায় শুরু হল বিদ্যাসাগর যুগ।

৬. বিদ্যাসাগর যুগ :

টিপ্পনী

রামতনু ললাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবাথ শাস্ত্রি মহাশয় 'বিদ্যাসাগর যুগ' নামে নবম পরিচ্ছেদের নামাঙ্কণ করেছেন। বিদ্যাসাগর বাংলার সমাজ সংস্কার আন্দোলনে এক অণ্যতম প্রতিভাধর ব্যাক্তি। এই যুগে যে সমস্ত পন্ডিত সমাজ সংস্কারকরা ছিলেন তারা হলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যাক্তি। শিবনাথ শাস্ত্রী মনে করেন রামতনুন লাহিড়ীকে জানতে গেলে সমকালে এই সমস্ত গুণগ্রাহী মানুষজন সম্পর্কে অল্পবিস্তর জানা প্রয়োজন। সেই যুগের অণ্যতম ব্যাক্তি পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শিবনাথ শাস্ত্রী সংক্ষেপে এই ওগ্রন্থে তাঁর জীবনকথা তুলে ধরেছেন। ১৮২০ সালে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ কোন পারিবারিক বিবাদে উত্যক্ত হয়ে নিজ পত্নী দূর্গাদেবীকে পরিত্যাগ করে কিছুকালের জন্য দেশান্তর হন। দূর্গাদেবী নিরাশ্রয় হয়ে বীরসিংহ গ্রামে তাঁর পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। জৈষ্ঠ্যপুত্র ঠাকুরদাস সে সময় থেকে ঘোর দারিদ্র্যে বসবাস করছিলেন। তাঁর বয়স যখন প্রায় পনেরো বছর হবে তখন জননীর দুঃখ নিবারণের জন্য কলকাতায় চলে সেন। সেসময় থেকে ঠাকুরদাস চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে দিনাতিপাত করেচিলেন। দিনের পর দিন কষ্টে ভুগে অবশেষে ৮ টাকা বেতনের একটি কর্মসংস্থান হয়। এ অবস্থাতে গোঘাট নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কণ্যা ভগবতী দেবীর সঙ্গে ঠাকুরাসের বিবাহ হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র তাঁদের প্রথম সন্তান।

ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবের কিছুদিন গ্রামের পাঠশালাতে পড়াশুনা করে বাবার সঙ্গে কলকাতাতে আসেন। কলকাতাতে এসে তাঁর পিতার মনিব বড়বাজারের ভাগবত চরণ সিংহের বাড়িতে পিতাপুত্র দুজনে মিলে বসবাস করেন। পিতাপুত্র রান্না করে খেতেন। অতিকষ্টে তাঁদের দিন অতিবাহিত হল। এখানে ভাগবত চরণ সিংহের কনিষ্ঠা কন্যা রাইমনি বিদ্যাসাগরকে পুত্রাধিক যত্ন করতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোমল হৃদয় আমৃত্যু কাল রাইমণি দেবীর সেই উপকারের কথা মনে রেখেছিলেন। যাইহোক, কলকাতায় এসে কয়েকমাস পাঠশালায় পড়ার পড় বিদ্যাসাগরের পিতা তাঁকে কলকাতায়সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেন। সংস্কৃত কলেজে কিছুদিনের মধ্যে তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলনে শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলেন। ১৮৯২ সালের জুন মাসে তিনি ভর্তি হলেন এবং

ছয়মাসের মধ্যেই মাসিক পাঁচটাকা বৃত্তই পেতে শুরু করলেন। ক্রমশ কলেজের সমুদয় উচ্চবত্তি ও পুরস্কার লাভ করতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বয়স যখন প্রায় ১৭ বছর। তখন তিনি ল'কমিটির পরীক্ষাতে পাশ করে ত্রিপুরার জজ পন্ডিতের কাজ পান। কিন্তু পিতা ঠাকুরদাস তাঁকে এত দূরে যেতে দেননি।

টিপ্পনী

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কত কলেজ উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর উপাধি পান। এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পন্ডিতের পদে চাকরি পান। এই পদ পাওয়ার পর বিদ্যাসাগর বাড়িতে বসে ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সকলেই সংস্কৃত পন্ডিত বলেই জানে। অথচ তিনি ভীষণ ভালো ইংরেজি লিখতে ও পড়তে জানতেন। বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রতিষ্ঠিত তখন সেখানে কেরাণীর পদ খালি হলে বন্ধুবর দূর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই পদের চাকরি দেন। এরপর বিদ্যাসাগর ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী পদে যোগদান করেন। তার কিছুদিনের পরে বন্ধুবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ পন্ডিত হয়ে চলে যাওয়ায় সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য অধ্যাপকের পদ শূণ্য হয় এবং ঐ পদে বিদ্যাসাগর মহাশয় এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি বেথুনের পরামর্শে যোগদান করেন। এরপর ১৮৫১ সালে ঐ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে বিদ্যাসাগর মহাশয় উন্নীত হন।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে নানাপ্রকার সংস্কারমূলক কাজে হাত দেন, প্রথমত প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকগুলি রক্ষণ ও মুদ্রণ করেন। দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অণ্যজাতির ছাত্রদের জন্য কলেজের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। তৃতীয়ত, ছাত্রদের বেতন গ্রহণের রীতি প্রবর্তন। চতুর্থত, উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি প্রনয়ন। পঞ্চমত, দুমাস গ্রীষ্মাবকাশ প্রথা প্রবর্তন। ষষ্ঠত, সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজি ইস্কার প্রচলণ। এই সমস্ত কর্ম প্রতিনষ্ঠা করতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে শ্রম দিতে হয়েছিল তা বর্ণনা করা যায় না। এরপর তাঁর দিনে দিনে পদবৃদ্ধি, খ্যাতি ও প্রতিপত্তই বাড়তে লাগলো।তাঁর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' মুদ্রিত হওয়ার পর বাংলার সাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত হল। ১৮৪৮ এ প্রকাশিত হল 'বাঙ্গালার ইতিহাস', ১৮৫০ এ 'জীবনচরিত' ১৮৫১ এ 'বোধোদয়', 'উপক্রমণিকা', 'শকুন্তলা', বিধবাবিবা্ বিষয়ক 'প্রস্তাব' ইত্যাদি।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

এরপর শিক্ষাবিভাগের ইস্পেক্টরের পদ সৃষ্টি হলে তাঁর উপরে নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একদিকে যখন পদ ও শ্রম বাড়ল তেমনি অপরদিকে তিনি এক মহাব্রতে আত্মসমর্পণ করলেন। একই বছর বিধবা বিবাহ হিদু শাস্ত্র অনুমোদিত একথা প্রমাণ করার জন্য গ্রন্থ রচনা করলেন। বাংলাদেশে আগুন জ্বলে উঠল। আবার ১৮৪৯ এ যখন বেথুন সাহেব বালিকা বিদ্যাল প্রতিষ্ঠা করলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়

তার প্রথম সম্পাদক হলেন। বিদ্যাসাগর ও তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুনের পৃষ্ঠপোষক হয়ে দেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের জন্য নিজেদের দেহ-মনকে সঁপে দিলেন।

১৮৫৬ সাল বিদ্যাসাগরের জীবনেদর সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। একদিকে বিধবাবিবাহের পক্ষে গ্রন্থরচনা, বিধবা বিবাহ দেওয়ার আয়োজন করা, অপরদিকে শিক্ষাবিভাগের নবনিযুক্ত ডাইরেক্টর মিষ্টার গর্ডণ ইয়ংয়ের সঙ্গে তাঁর ঘোরতর বিবাদ শুরু হল। এই বিবাদ প্রথমে জেলায় জেলায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে ঘটে। বিদ্যাসাগর যখন নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার ইন্‌সপেক্টর পদে ছিলেন তখন তিনি নানা স্থানে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার স্কুল খোলার সাথে সাথে মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল খুলে দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের জন্য তাঁর যে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তা পূরণের সময় এসেছে। কিন্তু ইয়ং সাহেব বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য সরকারি অর্থ ব্যায় করতে চাইলেন না। এমনকি বিদ্যাসাগরের প্রেরিত বিল স্বাক্ষর করলেন না। এই সংকটের দিনে বিদ্যাসাগর লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণরের শরনাপন্ন হলেন এবং সে যাত্রার মত সমস্যার সমাধান হল বটে। কিন্তু এডুকেশন বিভাগের ডাইরেক্টরের সঙ্গে এরপর থেকে বিবাদ শুরু হয়ে গেল। এই বিবাদ ক্রমশ চরম পর্যায়ে পৌঁছায় এবং কর্তৃপক্ষের বিবিধ চেষ্টায় তা মীমাংসা না হওয়ায় অবশেষে ১৮৫৮ সালে তিনি এই বিভাগের কর্ম পরিত্যাগ করেন।

সমাজে যখন বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষা পরচলন নিয়ে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়েছে সেইসময় বিদ্যাসাগরের অণ্যতম বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এক বিধবার পাণীগ্রহণ করলেন। বাংলাদেশের সংস্কারপন্থী মানুষের আরও উত্তেজিত হয়ে গেল। হিন্দু শাস্ত্রে অনুসারে বিধবা বিবাহের বৈধতা নিয়ে যে বিচার চলছিল তা পন্ডিত ও শিক্ষিত ব্যাক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর রাজবিধি প্রণয়নের চেষ্টা হল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বিচারে সন্তুষ্ট না থাকায় তিনি কার্যত বিধবা বিবাহ প্রচলণে প্রবৃত্ত হলেন এবং আপামর সাধারণ সকল লোকমুখে এই বিষয়টি আলোচিত হতে শুরু হল। পথে ঘাটে হাটে বাজারে মহিলা গোষ্ঠীতে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে শুধু একটি কথা - বিধবা বিবাহ এবং বিদ্যাসাগরের কথা এমনকি শান্তিপুরের তাঁতিরা বিদ্যাসাগরের এই কর্মকে কেন্দ্র করে - 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে' - এই গানাঙ্কিত কাপড় বার করলেন। বিদ্যাসাগর যুগে এমনই কর্মকান্ডে সহযোগী হিসেবে এগিয়ে এসেছিলেন যে বন্ধুরা তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'হিন্দু পেস্ট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক সমকালের আর্থ-সামাজিক - রাজনৈতিক প্রেক্ষিত অবলম্বন বাস্তব খবরের দর্পণ নিয়ে সমাজের মূল সমস্যা গুলো তুলে ধরেছিলেন তাঁর পত্রিকায়। 'হিন্দু পেস্ট্রিয়ট' এর কর্মসংস্কৃতি দেখে পুলকিত হয়েছিলেন তৎকালীন দেশের শিক্ষিত ব্যাক্তিরা। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশনের প্রধান প্রধান ব্যাক্তিগণ এবং রামগোপাল ঘোষ এবং রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি নব্যবঙ্গের নেতৃগণ হরিশচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক হয়ে তাঁকে উৎসাহ দিতে শুরু

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ককরলেন। এই সময় গুপ্ত কবি ঈশ্বরগুপ্ত 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজ চিত্রকে তুলে ধরলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হরিমোহ সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন বসু এই যুগের তরুণ ব্যাক্তিত্ব তাঁদের রচিত কবিতা একসময় বাংলাদেশের পঠকদের আনন্দ প্রদান করেছিল। এছাড়া ১৮৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র 'পাষান্ড পীড়ন' নামক একটি পত্র প্রকাশ করেন। সেই পত্রর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমকালের সংস্কৃতির মূলস্রোত উঠে এসেছিল। 'পাষন্ডপীড়ন' বাংলা সাহিত্য জগতে অভদ্র অশ্লীল ব্রীড়াজনক উক্তি প্রত্যুক্তির বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যাইহোক বাংলা ১২৫৪ সালের মধ্যে 'পাষণ্ডপীড়ন' উঠে যায়। কারণ ঐ বছরই ঈশ্বরচন্দ্র 'সাধুরঞ্জন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকার প্রতি মানুষের দৃষ্টি ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। যাইহোক এমনি করে বিদ্যাসাগরের যুগে গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এঁরাও সমাকালের ভালমন্দ সমাজ সংস্কৃতিকে সাহিত্যের আঙ্গনে তুলে ধরেছেন। রামতনু লাহিড়ী এই সময়ের মানুষ। কৃষ্ণনগরের সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতির মূল ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। প্রাবন্ধিক শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু চরিত ধর্মি' গ্রন্থে বিবিধ ব্যাক্তিত্বের জীবনকথাকে এমনি করে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় এনেছেন।

৭. ব্রাহ্মসমাজের নব উত্থান ও প্রভাব :

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে ব্রসাহ্মসমাজের নব উত্থান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সময়কাল ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত। এই সময়ের মথ্যে যে যে বিশেষ যমাজ আন্দোলন উদ্ভূত হয়েছিল তার বিশেষ কিছু নিদর্শন হল রামমোহন রায়ের আগমণ, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্ম সমাজের স্থাপন, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তএর আবির্ভাব, মধুসূদন দত্তএর অবদান ইত্যাদি। বলাবাহুল্য উক্ত প্রতিষ্ঠানকের ভূমিকা তৎকালীন সমাজে যথেষ্ট ছিল। ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ এরমধভে তা আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। এই সময়ের মধ্যে নরবঙ্গে কয়েকজন নতুন নেতা আবির্ভূত হয়ে বঙহগবাসীর চিত্ত ও চিন্তাকে নতুন পথ দেখায়। বিশেষত এই সময়কার উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্ম সমাজ আবেষ্টিত হয়েছিল। ১৮৫৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিনের জন্য কলকাতা শহর ত্যাগ করে হিমালয় শিখরে যান। ১৮৫৮ সালের শেষেরদিকে তিনি শহরে ফিরে এসে দেখেন তাঁর প্রিয় বন্ধু প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ মহাআনন্দে কেশবচন্দ্রকে গ্রহণ করেন এবং মনিকাঞ্চণ যোগের মত উভয়ে মিলিত হয়ে সমাজে নতুন নতুন কাজে হাত দেন।

১৮৫৯ থেকে ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার দেখা গেল। একদিকে দেবেন্দ্রনাথ

এবং অণ্যদিকে কেশবচন্দ্র এদেরই যৌথ প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হল। প্রতি রবিবার সকালে ঐ বিদ্যালয়ের অধিবেশন হল। দেবেন্দ্রনাথ বাংলাতে ও কেশবচন্দ্র ইংরেজিতে উপদেশ দিতেন।এই সকল উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দ্বারা যারা আকৃষ্ট হলেন এবং কেশবচন্দ্রকে যাঁরা অনুসরণ করলেন তাঁদের নিয়ে কেশবচন্দ্র একটি সুহৃদ গোষ্ঠী স্থাপন করলেন এবং নিজের বাসভবনে তাঁদের সঙ্গে সবরকম ধর্ম ও সামাজিক বিষয় নিবে আলাপ আলোচনা করতেন। দেবেন্দ্রনাথ পাঞ্জাবিদের সুহৃদ গোষ্ঠির সঙ্গত সভার নাম রেখে এইসভার নাম সঙ্গত সভা রাখলেন। এই সঙ্গত সভা ব্রাহ্মসমাজের নবশক্তির উৎস বলে মনে করা হয়। ১৮৬২১ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র বিষয় ক্রম থেকে অবসৃত হয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হলে এই সভার অনেক মানুষ তাঁকে অনুসরণ করে চিরদারিদ্র্যে ঝাঁপ দিয়েছিলেন এবং এখনও এঁদের অনেকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কার্যে নিজেদের নিযুক্ত রেখে ব্রাহ্মসমাজের শক্তির উৎস স্বরূপ হয়ে আছে।

সংস্কৃত সভার সভ্যগণ নতুনভাবে দীক্ষিত হয়ে তাঁদের হৃদয়ের বিশ্বাসকে কার্যে পরিত করার জন্য ১৮৬১ সাল থেকে ব্রাহ্ম ধর্মকে অনুষ্ঠানে পরিণত করবার জন্য উদ্যোগ ইলেন। এই সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দ্বিতীয় কণ্যার বিবাহ ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি অনুসরণ করে দিলেন এবং একদল যুবক ব্রাহ্মণ সন্তানেরা ব্রাহ্ম দলে যোগ দিয়ে তাদের জাতিভেদের চিহ্ন স্বরূপ উপণীত পরিত্যাগ করে নানাবিধ সামাজিক নিগ্রহ ও নির্যাতন সহ্য করতে লাগলেন। বলাবাহুল্য এমন পরিষস্থিতিতে দেশে মহা আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। নবীন ব্রাহ্ম ছেলেরা তাদের কার্যক্ষেত্রকে দিনে দিনে বিস্তৃত করে তুলল। বীশেষত মনমোহন ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে এবং দেবেন্দ্রনাথের অর্থ সাহায্যে 'ইন্ডিয়ান মিরর' নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশিত হল। কলকাতা কলেজ নামে একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হল। সেখানে নবীন ব্রাহ্মদলের প্রধান আড্ডাস্থল হয়ে উঠল। সর্ববিধ সমালোচনার জন্য ব্রাহ্মবন্ধু সভা নামে একটি সভা স্থাপিত হল। এই সময়ে ব্রাহ্ম ছেলেরা স্ত্রী শীক্ষা বিস্তারের জন্য তথা নারীজাতির উন্নতি সাধনের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মবন্ধু সভার সংশ্রবে তাদের কিছু সদস্যদের সহযোগিতায় 'বামাবোধিনী পত্রিকা' নামে স্ত্রী পাঠ্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হতে শুরু করে।

১৮৬৪ সালে ব্রাহ্মিকা সমাজ নামে নারীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রকাশনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্র তাঁর মোচার্যের দায়ভার নেন। ক্রমশ নবীন ব্রাহ্মদের মধ্যে একদল নারী জাতির উন্নতির জন্য নিজ স্ত্রীকে নববেশে সজ্জিত করে প্রকাশ্য সমাজে যাতাযাত করতে শুরু করলেন। তা নিয়ে চারিদিকে মহাসমালোচনা শুরু হল। এই সময়ের শেষের দিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের স্ত্রীকে নিয়ে গভর্ণর জেনারেলের বাড়িতে বন্ধু সম্মেলনে যান। তাতে স্ত্রীর স্বাধীনতা বিষয়ক আন্দোলন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দেশ মধ্যে আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল। যাইহোক প্রবীণ দেবেন্দ্রনাথ ও নবীন কেশবচন্দ্রের যৌথ পরামর্শে ব্রাহ্মসমাজের কার্যপ্রণালী এক হয়ে আর বেশি দিন রইল না। নবীন ব্রাহ্মরা বেশিদিন আর মুখে জাতিভেদের নিন্দা করে কিংবা সকল জাতি মিলে একসঙ্গে পান ভোজন করেও সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। ১৮৬৪ সাল থেকে তারা বিভিন্ন জাতি ও নরনারির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করতে প্রবৃত্ত্ হলেন এবং তারা ধুয়া ধরলেন যে উপবীত ধারী ব্রাহ্ম আচার্যরা বেদীতে বসলে তারা উপাসনাতে যোগ দেবেন না। নবীন ব্রাহ্মগণের এই চরম গোঁড়ামি প্রথমত দেবেন্দ্রনাথ আশা করেননি। কিন্তু নবীন ব্রাহ্মদের বাধা দেওয়া দেবেন্দ্রনাথের কোন ইচ্ছে ছিল না। অথচ সব বিষয়ে প্রবনী ব্রাহ্মদের সঙ্গে নবীন ব্রাহ্মদের মতের মিল হল না। বীশেষত বিবাহ নিয়ে মত বৈষম্য হল। নবীন ব্রাহমগণ যখন বিভিন্ন জাতির ব্যাসক্তিদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করতে এগিয়ে এলেন, তখন এপথে তারা কতদূষর যেতে পারে সেকথা ভেবে প্রবীণ ব্রাহ্মদল চমকে ওঠে। প্রবীণরে রক্ষণশীল প্রকৃতির তাই আর বিশেষ অগ্রসর হতে চাইল না। শুরু হল প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মদলের বিচ্ছেদ। নবীন অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্বতন্ত্র কার্যক্ষেত্র গঠন করে 'ধর্মতত্ত্ব' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন এবং ১৮৬০ সালের নভেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে তারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করলেন। তখন থেকে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজের নাম হল আদি ব্রাহ্মসমাজ। ১৮৬৮ থেকে ৭০ সালের মধ্যে অগ্রসর ব্রাহ্মদল মহোৎসাহে ব্রাহ্মধর্মের বার্তা ভারতের নানা প্রদেশে পৌছে দিলেন। দেখতে দেখতে পাঞ্জাব সিন্ধু বোম্বাই মাদ্রাজ সর্বত্র ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হল। কেশবচন্দ্র সেন শিক্ষিত ব্যাক্তিদের চিন্তার ও চর্চার অনেক অংশ অধিকার করে ফেললেন। এভাবে ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান দ্বারা বাংলার সমাজে যখন আন্দোলনের তরঙ্গ উঠেছিল তখন সাহিত্য ক্ষেত্রে নবশক্তির আবির্ভাব হল। বলাবাহুল্য এই সময়কালের কিছু আগে নীলের হাঙ্গামা, নীলকরদের অত্যাচার হিন্দু পেস্ট্রিয়ট এবং অন্যান্য পত্রের দ্বারা আমাদের অবগাহিত করেছে। কাজেই এই সময়কার কবি সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর প্রহসনের মধ্যে কিংবা তাঁর কাব্যচর্চায় পশ্চিমী ভাবধারা, নারী স্বাধীনতা অথবা উনিশ শতকের সমাজ সমস্যা যচেমন তুলে ধরলেন, দীনবন্ধু মিত্র সেই পথের যোগ্য উত্তরসূরী। উনিশ শতকের নকশ্আ গুলোর মধ্যে তথা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' কিংবা কাঈপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' অথবা রাধাকান্ত শিকদারের 'মাসিক পত্রিকা' অথবা সমকালের অন্যান্য সংবাদপত্রে বা বঙ্কিমের প্রবন্ধে, উপন্যাসে উঠে এসেছে উনিশ শতকের সমাজ সমস্যা, বাবু কালচার, সুরাপান,বৈধব্য সমস্যা, স্ত্রীজাতির অবস্থান ইত্যাদি। বলাবাহুল্য এই সময়ে উদ্ভুত ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব বাংলার সমাজ চিত্রের বাস্তব চালচিত্র।

৮. রামতনু লাহিড়ীর অন্তিম জীবন পর্ব :

রামতনু লাহিড়ীর জীবনকথার অন্তিমপর্ব আলোচিত হয়েছে গ্রন্থের চতুদর্শ পরিচ্ছেদে। রামতনু লাহিড়ী উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের আর পাঁচজন উদারচেতা মানুষের মতনই মানুষ। কর্মজীবে চাকরিসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় বদলি হয়েছেন। তার জীবনে কলাকাতা কৃষ্ণনগর, বরিশাল, রসাপাগলা ইত্যাদি জায়গায় গভীরভাবে কর্মসূত্রে ও শিক্ষাসূত্রে থাকার ও বড়ো হয়ে ওঠার সুবাদে এক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পেরেছিলেন। সমাজ সংস্কার আন্দোলনে হাতে খড়ি শিক্ষক ডিরোজিওর কাছে। কলকাতা শহরে লাহিড়ী মহাশয় যে মানুষদের সঙ্গে মিশেছিলেন যে তারা শুধু কোন ব্যাক্তি নয়, সমাজের উদারচেতা সমাজ সংস্কারক সুশিক্ষিত প্রজ্ঞাবান মানুষ। কাজেই তাঁর জীবনে প্রতিটা মুহূর্তে সমাজের ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের স্পর্শ আছে। লাহিড়ী মহাশয় চাকরির অবসরে কৃষ্ণনগরে বসবাস কালে ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর জৈষ্ঠ্য কণ্যা লীলাবতীকে বিবাহ দেন। বিবাহ হয়েছিল ডাক্তার তারিণীচরণ ভাদুড়ী নামক একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন এর সাথে। এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের মহারাজ সতীশ চন্দ্র ছাড়া কৃষ্ণনগরের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিগণ। লাহিড়ী মহাশয়কে কৃষ্ণনগরের মানুষ এতটাই ভালোবাসতেন যে কি ইংরেজ কি বাঙালি এই গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে এবং সাহায্য করতে বিন্দুমাত্র একটি করেননি। সৎচরিত্রবান পরোপকারী লাহিড়ী মহাশয়কে কৃষ্ণনগরবাসী তথা তাঁর পরিচিত জন চিরদিন পরমাত্মীয় ও অভিভাবক রূপে ভেবে এসেছেন। কাজেই তাঁর কণ্যার বিবাহকে নিজ কণ্যার বিবাহ হিসাবে সবাই মনে করেছিলেন।কৃষ্ণনগরের জনপ্রিয় স্বংশজাত লাহিড়ী মহাশয়কে শিক্ষক হিসাবে সবাই শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। লাহিড়ী মহাশয়ের ছাত্রদেদর তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। তাঁর পুরাতন ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তাঁর কাছে পুত্রের মতনই ছিল। এদের মধ্যে স্বর্গীয় কালীচরণ ঘোষ মহাশয় সর্বাগ্রগণ্য। সুপ্রসিদ্ধ রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এই শ্রেণীর মধ্যেই পড়েন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাত্র না হয়েও বন্ধুত্ব ও প্রীতি সূত্রে লাহিড়ী মহাশয়কে এমনই প্রীতি ও শ্রদ্ধা করতেন যে তাঁর কোন প্রকার অভাব জানলেই তিনি সাহায্যদানে মুক্ত হস্ত ছিলেন।

জাতপাত ধর্ম সংস্কার বর্জিত উদারচেতা মহৎ হৃদয়ের মানুষ রামতনু লাহিড়ী। সমাজে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে তার অভূতপূর্ব সমর্থন ছিল। ১৮৭২ সালে যখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের স্ত্রী স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হল, তখন লাহিড়ী মহাশয় স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করলেন। ব্যাক্তি হিসেবে তিনি আত্মপ্রত্যয়শীল, দৃড়তা সম্পন্ন মানুষ। এসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনা হল, রামতনু লাহিড়ী স্ত্রী-স্বাধীনতা দলে অগ্রণী হয়ে একবার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের নিয়ে টাউন হলে কেশববাবুর বক্তৃতা শুনতে গেলেন এবং

টিপ্পনী

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীদের প্রকাশ্যে বসালেন। এই ঘটনা দেখে লাহিড়ী মহাশয়ের পুরনো বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁকে তামাশা করে বললেন - "কি হে রামতনু ! বুড়ো বয়সে শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশলে নাকি ?"

লাহিড়ী মহাশয় টাউন হল থেকে ফিরে শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলেছিলেন -

"প্যারীর বোধহয় ইচ্ছে ছিল মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হয়, কিন্তু ওরা হালকা লোক, আমি মেয়েদের ত্রিসীমায় আসতে দিলাম না।"

এ থেকে রামতনু ব্যাক্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি। এরপর স্ত্রী স্বাধীতা তরান্বিত করার জন্য যে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন হয়েছিল সেখানে তিনি তাঁর দ্বিতীয় কণ্যা ইন্দুমতীকে ভর্তি করেছিলেন। নারী জাতির প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল। মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি সর্বদাই ব্যাগ্র ছিলেন। এছাড়া ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন যখন ভারতাশ্রম' নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানেও লাহিড়ী মহাশয় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীদের অপরাপর পরিবারের সঙ্গে সেখানে গিয়ে বাস করতে শুরু করলেন। লাহিড়ী মহাশয় অণ্যায়ের প্রতিবাদ করতে বিন্দুমাত্রপিছপা হতেন না। তিনি ন্যায় ও সত্যের পক্ষ অবলকম্বণ করতেন। মানব সংস্কার ও সমাজ সংস্কার এই পথেই তিনি বিশ্ববাসী কাজেই উন্নতশীল ব্রাহ্মদলকে পেয়ে তিনি অতিশয় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁদের অনেক কাজে যোগ দিয়েছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় ১৮৭০ সাল থেকে মাঝে মাঝে কলকাতা শহরে এসে সবারই সাহচর্য নিতেন। বীশেষত বিদ্যাসাগর, শ্যামাচরণ দেব, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নবরত্নেদর সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ইল। প্যারীচরণ সরকার এই নবরত্নের এক প্রধানরত্ন।

যাইহোক রামতনু লাহিড়ীর জীবন বহুমুখী ধারায় অতিবাহিত হয়েছিল। ব্যাক্তি জীবন, চাকরি জীবন, সমাজ সংস্কার কর্মজীবন মিলে মিশে একাকার হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর প্রগাড় ভক্তি ছিল। লাহিড়ী মহাশয়ের অন্তিম জীবনে তথা মৃত্যুর কিছু পূর্বে দেবেন্দ্রনাথকে একবার দেখতে চেয়েছিলেন। একথা শোনামাত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাহকপৃষ্ঠে এসে উপস্থিত হন। বৃদ্ধে বৃদ্ধে সমাগম হল, প্রাচীন ভাবে প্রাচীন আনন্দ জেগে উঠল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বললেন -

"স্বর্গে দেবগণ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; তোমাকে তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করিবেন।"

এরপর ১৮৯৮ সালের শুরুতে একদিন হঠাৎ তিনি ঘাটে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেললেন। একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। ক্রমশ জীবনের শক্তি দিন দিন কমে আসতে থাকল। দিনে দিনে অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন। স্মৃতিশক্তি কমে আসতে

থাকল। অবশেষে ঐ বছরই ১৩ই আগষ্ট লাহিড়ী মহাশয় পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। 'রামতনু লাহিড়ী চলিয়া গেলেন' - এই সংবাদ যখন শহরের লোকের কাছে গিয়ে পৌছল তখন সকল দলের বিশেষত ব্রাহ্ম সমাজের লোক দ্রুতপদে কাবৎকুমার লাহিড়ীর বাড়ির দিকে ছুটল। দেখতে দেখতে হ্যারিসন রোড়ে শরৎকুমারের বাড়ির সম্মুখে জনতার ভিড় নেমে এল। বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয় চিরনিদ্রায় চলে গেলেন। যেন মনে হল দেবশিশু জগৎজননীর কোলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পন্ডিত শিবনথ শাস্ত্রী তার এই চরিত গ্রন্থে লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যুকে স্মরণ করে লিখেছেন -

> "এ জীবনে কত মানুষ হারাইলাম, মানুষ আসে মানুষ যায়, সকল মানুষ তো মধুর স্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় হৃদয়ে স্মৃতি রাখিয়া যান না ! কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে এ জীবনে কতকগুলি মানুষকে দেখিয়েছি যাহারা যাইবার সময় প্রাণে কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ভবধাম ত্যাগ কররিলেই অন্তরাত্মা বলিয়াছে, হায় কি দেখিলাম, কি সঙ্গই পাইয়াছিলাম, এমন মানুষ আর কি দেখিব!' সেদিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিলাম, আর ভাবিলাম এই সেই দলের একজন মানুষ গেলেন।"

৯. প্রশ্নাবলী ও অনুীলনী :

ক. রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম, শৈশব, বাল্যদশা ও কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে লেখ।

খ. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' অবলম্বনে উনিশ শতকের সমাজ ধর্ম ও শিক্ষা সংস্কারে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা আলোচনা করুন।

গ. বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন (১৮৪৬ - ১৮৫৩) সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ঘ. বিদ্যাসাগরের যুগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

ঙ. রামতনু লাহিড়ীর শেষ জীবন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দ্বিতীয় একক :প্রবন্ধ

শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

টিপ্পনী

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র – বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যধারার শুরু খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতে, মূলত খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। রামমোহন রায় (১৭৭৪ -১৮৩৩) তাঁর প্রবন্ধরচনার মাধ্যমে বাংলা প্রবন্ধকে শক্ত ভিত্তিভূমির উপর দাঁড় করান উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। তবে তাঁর প্রবন্ধ বিবৃতিমুখ্য,সাহিত্যরসপূর্ণ নয়। রামমোহন পরবর্তী বাংলাসাহিত্য জগতের উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিকরা হলেন, অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) প্রমুখ। এঁদের দ্বারা বাংলা প্রবন্ধে বিষয়বৈচিত্র্য ও সাহিত্যর সুষমা দুয়েরই যথোপযুক্ত সমন্বয় ঘটেছে।

এঁদের ঠিক পরেপরেই বাংলা প্রবন্ধের ভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাসমূহে। বঙ্কিমচন্দ্র বিচিত্র বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং তা মূলত 'বঙ্গদর্শন পত্রিকা'র উদরপূর্তির জন্য। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা প্রবন্ধ পুষ্টিলাভ করেছে। তিনি বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই প্রবন্ধ লিখেছেন, যদিও ইংরেজি ভাষার প্রবন্ধ তুলনায় কম। তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ(Formal Essays) এবং মন্ময় বা আত্মগত প্রবন্ধ(Informal Essay) দুই ধরনের প্রবন্ধই তিনি লিখেছেন সাফল্যের সঙ্গেই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালে (১২৪৫ বঙ্গাব্দ) নৈহাটির নিকটবর্তী কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজ গবর্নমেন্টের অধীনে দীর্ঘদিন ডেপুটি কালেক্টরের কাজ করতেন। তাঁর ছোটবেলার শিক্ষা ইংরেজি স্কুলেই শুরু হয়। ১৮৫৭ তে মেধাবী বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ থেকে সসম্মানে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮ তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেন প্রথম হয়ে। এরপরে যশোহরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে যোগ দেন ওই বছরেই। সরকারি চাকরি করার জন্য তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থানে থেকেছেন ও ঘুরেছেন। বিস্তৃত পাঠের ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের সংশ্লেষে লিখেছেন মত চোদ্দটি উপন্যাস,

টিপ্পনী

আটটি প্রবন্ধগ্রন্থ, এছাড়া অগ্রন্থিত অন্য নানান লেখা-ও রয়েছে। তাঁর আর একটি অন্যতম সাহিত্যকীর্তি ১৮৭২ সাল থেকে প্রকাশ শুরু হওয়া 'বঙ্গদর্শন পত্রিকা'। ১৮৭৬-এ বঙ্গদর্শন একবার বন্ধ হয়ে আবার শুরু হয় ১৮৭৭ থেকে। মোটামুটি ১৮৬৯ থেকে তিনি প্রবন্ধ রচনায় হাত দেন। বিবিধ বিষয়ে দক্ষতার সঙ্গে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যের এই ভগীরথ তাঁর মননশীল সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে এ ভাষাকে সমৃদ্ধ করে ১৮৯৪(১৩০০)-এ ইহজগতের মায়া ত্যাগ করেন।

সারসংক্ষেপ–

আলোচ্য প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় (এপ্রিল, ১৮৭৫ খ্রি.) প্রকাশিত হয়। পরে এই প্রবন্ধটি ১৮৮৭ তে 'বিবিধ প্রবন্ধ' – প্রথম ভাগ-এ সংকলিত হয়। প্রবন্ধটি দুটি পৃথক অংশে বিভক্ত করে আলোচিত হয়েছে; প্রথমাংশে – শকুন্তলা ও মিরন্দা, দ্বিতীয় অংশে – শকুন্তলা ও দেস্দিমোনা। 'শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেস্দিমোনা' – এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মূল প্রবন্ধ দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। শকুন্তলা চরিত্রটি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত; মিরন্দা শেক্সপীয়রের কমেডি নাটক 'দি টেম্পেস্ট'-এর চরিত্র; দেস্দিমোনা শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি নাটক 'ওথেলো'-র চরিত্র । বঙ্কিমচন্দ্র তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে কালিদাসের শকুন্তলার সঙ্গে শেক্সপীয়রের দুই নায়িকার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন।

প্রথমভাগে 'শকুন্তলা ও মিরন্দা' অংশে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন এই দুই নায়িকাই ঋষিকন্যা এবং উভয় পিতাই রাজর্ষি। দুজনেই অমানুষী সাহায্যপ্রাপ্তা, একজন এরিয়েল-রক্ষিতা অন্যজন অপ্সরা-রক্ষিতা। দুজনেই ঋষি-পালিতা এবং এই উভয় বনলতার সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা। সে ধারণা একভাবে যেমন শকুন্তলাকে দেখে দুষ্মন্তের হয়েছে অন্যদিকে তেমনি মিরন্দাকে দেখে ফার্দিনান্দেরও হয়েছে। দুজনেই অরণ্যের সারল্যে মাধুর্য্যমণ্ডিতা । মনুষ্যসমাজে বসবাসজনিত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে কম। শকুন্তলার আত্মীয় তপোবনের গাছপালা, হরিণশাবক; কিন্তু তিনি সরলা হলেও অশিক্ষিতা নন। তাঁর শিক্ষার পরিচয় তাঁর লজ্জা, যে লজ্জার জন্য তিনি দুষ্মন্তের সামনে অবনতমুখী এবং নিজের প্রণয় সখীদের সামনেও সহজে বলতে পারেন না। অপরপক্ষে মিরন্দা এতই সরলা যে তাঁর লজ্জাও নেই, তাই সমাজসংস্কারশূন্য মিরন্দা তার পিতার কাছেই ফার্দিনান্দের রূপের প্রশংসা করে। অথচ পিতার দ্বারা ফার্দিনান্দের পীড়নের সম্ভাবনা দেখে

মিরন্দার দুঃখ হয়, ফার্দিনান্দের নিন্দে শুনেও সে তার স্নেহ ব্যক্ত করে। অর্থাৎ লজ্জা না থাকলেও সমবেদনা ও স্নেহে মিরন্দা পবিত্র।

মিরন্দা ও শকুন্তলা উভয়েই তপোবন-আশ্রিতা, মিরন্দা পিতা ও কালিবন এবং শকুন্তলা ঋষিদের ছাড়া অন্য কোনও পুরুষ দেখেননি। উভয়েই যথাক্রমে ফার্দিনান্দ ও দুষ্মন্তকে দেখার আগে পর্যন্ত প্রণয়স্পর্শ শূন্য ও এদের দেখামাত্রই অনুরাগিণী। দুই কবি যুক্তি করে এই দুই নায়িকাকে সৃষ্টি করেননি অথচ একজনের আঁকা দুটি আলাদা ছবির সাদৃশ্যের মতোই হয়েছে এই দুই চরিত্র। সমাজপ্রদত্ত সংস্কার থাকা ও না-থাকায় উভয়ের প্রণয় প্রকাশে যে পার্থক্য এক স্রষ্টা রাখতে পারতেন এই দুই চরিত্রেও দুই স্রষ্টা ঠিক সেই পার্থক্য দেখিয়েছেন; সমাজসংস্কারযুক্তা শকুন্তলার প্রেম বাক্যে অপেক্ষা লক্ষণে স্পষ্ট আর সংস্কারশূন্য মিরন্দার প্রেম বাক্যে অধিকতর স্পষ্ট।

প্রেমের প্রকাশে শকুন্তলার কিছু 'বাহানা' আছে, সে সব মিরন্দার মোটেই নেই। শকুন্তলার প্রণয়ে লুকোচুরি, চাতুরি আছে। দুষ্মন্তের বিশাল ব্যক্তিত্বের কাছে শকুন্তলা প্রায় ঢাকা পড়েছে। কিন্তু তুলনায় ফার্দিনান্দ ক্ষুদ্র ব্যক্তি। ফলত যে প্রয়াসে মিরন্দার প্রেম প্রকাশ পায় সেই প্রয়াসে শকুন্তলার প্রেম একইরকম উন্মুক্ত হয় না। এই পার্থক্য খেয়াল রাখলে তবেই শকুন্তলা চরিত্রসৃষ্টিতে কালিদাসের সাফল্য ঠিকভাবে বোঝা সম্ভব। তাই এই নায়িকাদের প্রণয়ের প্রকাশপার্থক্য দেশ ও লোকাচারের ভিন্নতা তা নয়। কারণ দেশ বা কালভেদে কেবল বাহ্যপার্থক্য সম্ভব, মনুষ্যহৃদয় সকল দেশে সকল কালেই এক। শকুন্তলাই বরং অন্যান্য নায়িকা অপেক্ষা বেহায়া বলা চলে, তিনি দুষ্মন্তের সভামধ্যে দাঁড়িয়ে কিছুকালের মধ্যেই তাকে তিরস্কারও করবেন। তপোবনে শকুন্তলার সংকোচের কারণ দুষ্মন্তচরিত্রের বিস্তার, কিন্তু সভাতলে শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী ও মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং পূর্ণব্যক্তিত্বসম্পন্না। অর্থাৎ কালিদাসের কবিত্ব টেম্পেস্টের কবির তুলনায় কিছুতেই হীন নয়।

দ্বিতীয়ভাগে, 'শকুন্তলা ও দেস্দিমোনা' অংশে শকুন্তলার সঙ্গে দেস্দিমোনার তুলনা। শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করলে শকুন্তলার এক ভাগ বোঝা যায়। তাঁর চরিত্রের অন্যভাগ বুঝতে গেলে দেস্দিমোনার সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে হবে।

শকুন্তলা ও দেস্দিমোনা উভয়ে তুলনীয়া এবং অতুলনীয়া। উভয়ে গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করেই আত্মসমর্পণ করেছেন। উভয়েই বীরপুরুষের সমক্ষে আত্মসমর্পণ করেছেন। যদিও বীরের প্রতি যে মোহ দেস্দিমোনার মধ্যে প্রকাশিত তা শকুন্তলার মধ্যে পরিলক্ষিত নয়। কৃষ্ণকায় ওথেলোর প্রতি ইতালীয় দেস্দিমোনার রূপজ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মোহ জন্মানো সম্ভবপর নয়। যেমন বীর অর্জুনের প্রতি দ্রৌপ্রদীর অধিক অনুরাগের ফলে স্বর্গারোহণের বাধায় যে তত্ত্ব সেই তত্ত্বই দেস্দিমোনার অনুরাগের মধ্যে দুই কবির কাব্যে প্রকাশিত। শকুন্তলা ও দেস্দিমোনা উভয়েই স্বামী কত্তৃক বিসর্জিতা হয়েছিলেন। সংসারে যে আদরের যোগ্য তার অনাদর প্রভৃতি মানুষের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নয়, বরং তার ফলে যেসব মনোবৃত্তির প্রকাশ কাব্যাদির প্রধান উপকরণ। দুই নায়িকার অদৃষ্টের কারণে যে সব মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছিল তা তুলনীয় অবশ্যই।

দুজনেই প্রকৃতঅর্থে সতী। একজন স্বামীচিন্তামগ্নতায় দুর্বাসার আহ্বান শুনতে পাননি, অন্যজন আবার ভাবতে পারেন না জগতে কোনও নারী অসতী হতেও পারে। শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানে প্রতিবাদিনী, কিন্তু শত অত্যাচারেও দেস্দিমোনা স্বামীর প্রতি রাগ, অভিমান বা ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেননা। এখানে তিনি শকুন্তলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। সে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাউকে সাক্ষ্য করেনি, এমনকি তার হত্যার জন্য পর্যন্ত সে স্বামীকে দায়ী করেনি। শকুন্তলা ও দেস্দিমোনা উভয়ে অতুলনীয়া বটে। কারণ সাগরতুল্য সেক্ষপীয়রের নাটকেসমস্ত হৃদয়াবেগ গভীর, দুস্তর ও ভীমনাদী। আর নন্দনকাননতুল্য কালিদাসের নাটকে সবই নান্দনিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত।

যেহেতু শকুন্তলা ও দেস্দিমোনা ভিন্নজাতীয় তাই উভয়ের তুলনা সম্ভবে না। ভিন্ন কারণ এদেশে যাকে নাটক বলে ইউরোপে ঠিক তাকেই নাটক বলে না। উভয়েই দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদের মতে সমস্ত দৃশ্যকাব্যই নাটক নয়। নাটক না হলেও সে সব দৃশ্যকাব্য উৎকৃষ্ট কাব্য হতেই পারে, যেমন গেটে-র ফক্স অথবা বায়রনের মানফ্রেড। সেক্ষপীয়রের টেম্পেস্ট ও কালিদাসের শকুন্তলা তাঁদের মতে সেইপ্রকার নাটকাকারে উৎকৃষ্ট কাব্য। কিন্তু ভারতীয় আলংকারিকদের মতে এই উভয় রচনাতেই নাটকের সমস্ত লক্ষণ বর্তমান। ইউরোপীয় আলংকারিকদের মতে নাটকের লক্ষণ শুধুমাত্র ওথেলো-তেই আছে, তাই দেস্দিমোনা-চরিত্র যত পরিস্ফুট হয়েছে মিরন্দা বা শকুন্তলা ততটা হয়নি। দেস্দিমোনা সজীব আর অন্য দুজন ধ্যানপ্রাপ্তা। শকুন্তলা আঁকা ছবি আর দেস্দিমোনা সজীবপ্রায় ভাস্কর্য। দেস্দিমোনা স্পষ্ট ব্যক্ত আর শকুন্তলা ইঙ্গিতে ব্যক্ত। দেস্দিমোনার আলেখ্য উজ্জ্বলতর বলেই তার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াতে পারেনা। নয়তো অন্তরে উভয়ে এক।

শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা অর্ধেক দেস্দিমোনা। অপরিণত শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপ আর পরিণত শকুন্তলা দেস্দিমোনার অনুরূপ।

'তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা-চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে' – প্রবন্ধ অবলম্বনে এই বক্তব্য যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিচিত্র সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতার ফল হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি। এদের মধ্যে অন্যতম একটি প্রবন্ধ 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা'। আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্ববিখ্যাত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই সাহিত্যিক কালিদাস ও সেক্ষপীয়রের তিনটি নাটকের তিন নায়িকার তুলনা করেছেন বঙ্কিম। স্পষ্টতর করে বললে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের শকুন্তলার সঙ্গে সেক্ষপীয়রের 'দি টেম্পেস্ট' নাটকের নায়িকা মিরন্দা ও 'ওথেলো' নাটকের নায়িকা দেস্দিমোনা-র তুলনা করেছেন তিনি।

শকুন্তলার তুলনা প্রসঙ্গে আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথমাংশে প্রাবন্ধিক বঙ্কিম শেক্সপীয়রের মিরন্দার কথা বলেছেন। এখানে তিনি বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সাহিত্যের বিচারক তিনি। সঙ্গে তিনি একজন সহৃদয় সামাজিক ব্যক্তি, সর্বোপরি নিজেও সাহিত্যিক। যথার্থ যুক্তি অবলম্বনে তিনি শকুন্তলা চরিত্রের তুলনা প্রতিতুলনায় ক্রমাগ্রসর হয়েছেন। কখনো সাদৃশ্য কখনো বৈসাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করে তিনি উভয় চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছেন–

> 'উভয়ে ঋষিকন্যা; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়ে রাজর্ষি। উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্তা। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা।'

আগাগোড়া বঙ্কিমচন্দ্র দুই নায়িকার এরকম তুল্যমুল্য বিচার করে গিয়েছেন। তিনি উভয়ের মিল, অন্তরের সংযোগ, পারিপার্শ্বিকের প্রভাব, ভাব বহিঃপ্রকাশের ধরনের বিশ্লেষণ করেছেন চরিত্রদুটির মর্মস্থলে প্রবেশ করেই। তিনি দেখিয়েছেন উভয় কন্যা-ই সমাজসম্পর্কশূন্য, অরণ্যচারী, ঋষিপালিত। উভয়েই বনলতা, উভয়ের সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূত। উভয়েই প্রথমদর্শনে হৃদয়দান করে বসেছেন; এসবই আলোচ্য দুই নায়িকার মধ্যে মিল। তাঁর মতে যদিও উভয় স্রষ্টা পরামর্শ করে তাঁদের দুই নায়িকাচরিত্র কল্পনা করেননি, তবুও এ দুই চরিত্র যেন এক চিত্রকরের আঁকা দুটি চিত্রের মতো সমভাব।

তবে দুজনের মধ্যে অমিল-ও বর্তমান। সেই অমিল ঘটবার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করেছেন বঙ্কিম। শকুন্তলা সরলা হলেও অশিক্ষিতা নন, সামাজিক ব্যবহার বিষয়ে তাঁর কিছু

টিপ্পনী

টিপ্পনী

জ্ঞান আছে, তাই সংস্কার-ও আছে। আছে সামাজিক লজ্জা ও ধরা পড়ে যাবার সংকোচ। তাই রাজা দুষ্মন্তের প্রতি প্রীতি তিনি তাঁর সখীদের কাছে প্রথমেই বলে ফেলতে পারেননি। লজ্জা ও সংকোচের জন্যই তাঁর দুষ্মন্ত সন্নিধানে থাকার স্পষ্ট ইচ্ছা প্রকাশের বদলে গাছে বল্কল আটকে যাওয়া, পায়ে কুশাঙ্কুর বিঁধে যাওয়া ইত্যাদি বাহানার প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু মিরন্দার এসবের প্রয়োজন পড়েনি। পিতার সামনে সে অসংকুচিতভাবে নিজের প্রণয় জানায়। আবার পিতাকে ফার্দিনান্দের পীড়নে উদ্যত দেখে সে বলে,

O dear father,

Make not too rash a trial of him, for

He's gentle and not fearfull.

প্রাবন্ধিক এভাবে মূল পাঠ উদ্ধার করে নিজের বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে সেক্ষপীয়রের অপর এক নায়িকা জুলিয়েটের মতো মিরন্দার প্রেম সাগরতুল্য গভীর ও অসীম। কিন্তু শকুন্তলার প্রেম সেরূপ নয়। প্রাবন্ধিকের মতে এ শকুন্তলাচরিত্রের স্রষ্টা কবির গুণ। কারণ ফার্দিনান্দ বা রোমিও দুজনেই দুষ্মন্তের তুলনায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক। এদিকে শকুন্তলা-কলিকার পাশে দুষ্মন্ত যেন মহাবৃক্ষ। সে কারণে মিরন্দার মতো নিজের প্রেম সুপ্রকাশ করা শকুন্তলার পক্ষে আরোপিত হত।

এসব কথা স্মরণ না রাখলে শকুন্তলা-চরিত্র যথার্থ বোঝা অসুবিধে বলেই বঙ্কিমের মত । দেশ বা কালভেদ নয় শকুন্তলার লজ্জা ও সংকোচ এই রাজা দুষ্মন্তের বিরাট ব্যক্তিত্বের উষ্মথিতির সামনে। তাই মাত্র কয়েকমাস পরেই লতামণ্ডপের বালিকা শকুন্তলা যখন পত্নী, রাজমহিষী, তদুপরি মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা তখন সে পূর্ণ রমণীর মতোই পৌরবের সভাতলে দাঁড়িয়ে দুষ্মন্তকে তীব্র তিরস্কার করে–

"অনার্য্য! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?"

অর্থাৎ, টেম্পেস্টের কবির তুলনায় কালিদাস হীনপ্রভ নন। শকুন্তলা চরিত্রের নির্মাণে সে নিদর্শন উষ্মথিত। তাই দুই কবির দুই নায়িকার বাহ্য পারিপার্শ্বিক যেমন তাদের মধ্যে অনুরূপ কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্ম দিয়েছে তেমনি দুটি পৃথক কাব্যের পৃথক আস্বাদ সৃষ্টি হয়েছে যথার্থ যুক্তিক্রমেই । তাই মিলের ক্ষেত্র বিচার করলে দুই নায়িকা যেন এক চিত্রকরের আঁকা দুটি পৃথক চিত্র বলেই মনে হয়, যেমন তা প্রাবন্ধিকের মত তেমনি এই প্রবন্ধের পাঠকেরও।

'শকুন্তলা এবং দেস্দিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া, এবং অতুলনীয়া।' –

মন্তব্যটি প্রবন্ধ অবলম্বনে আলোচনা কর।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা'-র দ্বিতীয় ভাগ, 'শকুন্তলা ও দেস্দিমোনা' । উল্লিখিত প্রবন্ধের এই দ্বিতীয় ভাগে বঙ্কিম কালিদাসের নায়িকা শকুন্তলার সঙ্গে সেক্ষপীয়রের নায়িকা দেস্দিমোনার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখিয়েছেন ও তার কারণ অনুসন্ধান করে যুক্তি সাজিয়ে দুই নাটকে চরিত্রদুটির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।

এই দুই নায়িকাই, প্রাবন্ধিক মন্তব্য করেছেন যে, পরস্পরের সঙ্গে তুলনীয় এবং অতুলনীয় বটেন। তুলনীয় এই অর্থে যে, দুজনেই বীরপুরুষ দেখে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং দুজনেই "দুরারোহিণী আশালতা" মহামহীরুহ অবলম্বন করেছিলেন । অবশ্য বীরমন্ত্রের মোহ দেস্দিমোনায় যতটা প্রকট, শকুন্তলায় ততটা নয়। ওথেলো কৃষ্ণকায়, অতএব তার রূপমুগ্ধ হওয়া ইতালীয় দেস্দিমোনার পক্ষে সম্ভাব্য নয়। অনুরূপ কারণেই পঞ্চসর্বগুণসম্পন্ন সুরূপ পতির মধ্যে দ্রৌপদী অর্জুনকেই বেশি চাইতেন, সে বীরপূজার তত্ত্ব যেমন মহাভারতকার দেখিয়েছেন তেমনি সেক্ষপীয়র-ও।

এই দুই নায়িকা প্রবন্ধকারের মতে তুলনীয়া কারণ, উভয়েই পরে তাদের স্বামীদ্বারা পরিত্যক্তা হয়েছেন। সংসারে যা যত্নের প্রায়শ তারই অযত্ন ঘটে। আর সেই সময়ের অনাদর-অত্যাচারে মানুষের উচ্চাশয় মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখা যা, যা মানুষের সুশিক্ষার বীজ ও কাব্যাদির আশ্রয়বিশেষ। আলোচ্য দুই নায়িকার নিয়তিতেই এই বিশেষ অবস্থার প্রভাবে তাদের অন্তস্থ মনোবৃত্তির প্রকাশের সুযোগ ঘটেছিল।

আরও এক কারণে উভয়ের তুলনা ঘটে- উভয়েই পরম সতী ছিলেন। একজন স্বামীচিন্তায় মগ্নতার জন্য ঋষি দুর্বাসার আহ্বান শুনতে পাননি ও অভিশপ্ত হন। অন্যজনের সতীত্বের কল্পনাও সাধারণের পক্ষে দুরূহ, কারণ স্ত্রীলোক যে অসতী হতে পারে না দেস্দিমোনার এ দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু স্বামীর শত প্রত্যাখ্যানে অবিচলিত থাকা যদি সতীত্ব হয় তবে দেস্দিমোনা শকুন্তলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বামীপরিত্যক্তা শকুন্তলা প্রতিবাদিনী, বাক্যে স্বামীকে আক্রমণকারিণী। কিন্তু সে রাগ বা অভিমানের বাষ্প-ও দেস্দিমোনার মধ্যে নেই। সর্বসমক্ষে ওথেলোর প্রহারের পরে তিনি বিনা প্রতিবাদে সরে গেছেন, শুধু 'আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন' জাতীয় উক্তি করেই। এমনকি তাকে হত্যায় উদ্যত স্বামীকে দেখেও তিনি জীবনভিক্ষা চেয়েছেন কিন্তু স্বামীকে কোনও কঠিন কথা বলেননি । এরপরেও যখন মুমূর্ষু দেস্দিমোনাকে ইমিলিয়া তার ঘাতকের নাম জিজ্ঞাসা করেছে, তিনি নিজের পরিণতির জন্য নিজেকে দায়ী করে গেছেন সেই চরম মুহূর্তেও । প্রাবন্ধিকের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বিচারে তাই এই অবিচলিত চিত্ততার তুলনায় শকুন্তলা অপেক্ষা দেস্দিমোনা শ্রেষ্ঠা।

প্রাবন্ধিকের তাই মত, একদিকে যেমন শকুন্তলা ও দেস্দিমোনা তুলনীয়া, অন্যদিকে তেমনি তুলনীয়া নন। বঙ্কিমের মতে যেখানে সেক্ষপীয়রের নাটক সাগরের মতো সেখানে কালিদাসের নাটক নন্দনকাননের মতো। এই দুইয়ের তো তুলনা সম্ভব নয়। বঙ্কিমের অতুলনীয় উপমা ব্যবহারের কৌশলে আমরা বুঝতে পারি, যে ওথেলোর সংঘাত সমুদ্রের বিক্ষোভের সঙ্গে এক হলে শকুন্তলা অনুপম সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ আকর স্বর্গোদ্যানের মতোই। দুই ভিন্ন জাতীয়ের তুলনা করা যায় না।

ভিন্ন জাতীয় হবার কারণের বিস্তৃত ব্যাখ্যাও বঙ্কিম দিয়েছেন। আসলে তিনি দেখিয়েছেন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে নাটকের যা বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে ইউরোপীয় আলংকারিকদের নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যের অমিল প্রকট। উভয় স্থানেই নাটক দৃশ্যকাব্যতো অবশ্যই; কিন্তু ইউরোপীয় আলংকারিকদের মতে শুধুমাত্র দৃশ্যকাব্য হওয়াটাই নাটকের জন্য যথেষ্ট নয়। তাঁদের বিচারে প্রকৃত নাটকে দৃশ্যকাব্যের অতিরিক্ত কিছু গুণ আবশ্যক। তবে দৃশ্যকাব্য সকল নাট্যবৈশিষ্ট্যে বিশেষ না হলেও তা উৎকৃষ্ট কাব্য হতেই পারে; যেমন গেটে-র ফস্ট বা বায়রন-এর মানফ্রেড – এগুলির মান যাই হোক, এরা কাব্য। কালিদাসের শকুন্তলা বা সেক্ষপীয়রের টেম্পেস্ট সেরকম কাব্য, অতি উৎকৃষ্ট মানের কাব্য হয়েও এরা নাটক নয়। আর তাঁদের মতে নাটক না হওয়াটা এদের জন্য বিন্দুমাত্র অগৌরবের নয়। এর পরেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন ভারতীয় আলংকারিকদের ভাবনায় এই দুই কাব্যই নাটক-ও। ইউরোপীয় আলংকারিকদের মতে নাটকের পূর্ণ লক্ষণ রয়েছে এ দুই কাব্যে নয়, ওথেলো-তে। তাই দেস্দিমোনা চরিত্রটির যত বিকাশ আমরা পেয়ে থাকি মিরন্দা বা শকুন্তলার ততটা নয়। দেস্দিমোনায় প্রাণের উৎসার আর অন্যদুজন যেন তপস্যালীন।

সুতরাং শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার থাকলেও গতি নেই, বেগ নেই- যা দেস্দিমোনায় যথেষ্ট আছে। আর তাই, বঙ্কিম বলেছেন,

'শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন।'

দেস্দিমোনা এই প্রাণবন্ততায় শকুন্তলাকে ছাপিয়ে যায়। না হলে বঙ্কিমের মতে উভয়ে অন্তরে এক, যা তফাৎ তা বহিঃপ্রকাশে। এ জন্যই প্রাবন্ধিক বলেছেন শকুন্তলা ও দেস্দিমোনা পরস্পরের তুলনীয়া এবং একইসঙ্গে অতুলনীয়া-ও বটেন।

'শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেস্দিমোনা।' – প্রাবন্ধিক কিভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন প্রবন্ধের যুক্তিক্রমে দেখাও।

বাংলাভাষায় তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনা ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। যদিও আলাদাভাবে তাঁর কোনও সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ নেই, তবু পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে যথেষ্ট দখল থাকার জন্য তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধে সাহিত্য সমালোচনা স্থান পেয়েছে। সেই সমস্ত প্রবন্ধ পরবর্তীকালের পাঠক-সমালোচকদের কাছে দিকনির্দেশক হয়ে উঠেছে। সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে পাঠ ও আত্মস্থ করে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বঙ্কিম। উপরন্তু অনেকাংশে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী।

টিপ্পনী

আমাদের আলোচ্য বর্তমান বিষয়, 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনা। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্এর নায়িকা শকুন্তলার সঙ্গে সেক্ষপীয়রের নাটক দি টেম্পেস্ট-এর নায়িকা মিরন্দা ও ওথেলো-র নায়িকা দেস্দিমোনার তুলনা করেছেন প্রাবন্ধিক বঙ্কিম। দুই মহান স্রষ্টার সৃষ্টির তুলনা করতে গিয়ে বঙ্কিম কোথাও পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েননি। চরিত্রগুলি কেন তুলনায় এল এবং তুল্য হয়েও তারা কেন আলাদা তা নিয়ে বিস্তারিত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন বঙ্কিম।

প্রবন্ধটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে 'শকুন্তলা ও মিরন্দা' অংশে মিরন্দার সাপেক্ষে ও দ্বিতীয় ভাগে 'শকুন্তলা ও দেস্দিমোনা' অংশে দেস্দিমোনার সাপেক্ষে শকুন্তলাকে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন বঙ্কিম। মুখ্যতঃ শকুন্তলা চরিত্রটিকে বুঝে নেওয়া প্রাবন্ধিকের উদ্দেশ্য। সংক্ষেপে বললে মিরন্দা প্রেয়সী ও দেস্দিমোনা আদর্শ স্ত্রী; আর এই দুই রমণীয় গুণের সমন্বয় ঘটেছে শকুন্তলার মধ্যে।

প্রথমাংশে শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করতে গিয়ে বঙ্কিম তাদের মিল প্রসঙ্গে বলেছেন,

১. উভয়েই ঋষিকন্যা, ২. দৈহিক সৌন্দর্যে উভয়েই অতুলনীয়া, ৩. উভয়েই সমাজসংসার থেকে দূরে বনের মধ্যে প্রতিপালিতা, ৪. নায়কদের সংস্পর্শে আসার আগে অবধি পরপুরুষ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল, ৫. উভয়েরই নায়ককে দেখামাত্রই অনুরক্ত হয়েছেন।

আবার প্রাবন্ধিক তাদের অমিল প্রসঙ্গে বলেছেন, শকুন্তলা সমাজপ্রদত্ত সংস্কার সম্বন্ধে জ্ঞাত বলে তাঁর মধ্যে লজ্জা উপস্থিত। তাই তাঁর প্রণয় আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত। শকুন্তলার প্রণয়ে কিছু লুকোচুরি ও ছলচাতুরি আছে। কিন্তু মিরন্দা সমাজসংস্কারশূন্য বলেই সম্পূর্ণ অকপট। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বঙ্কিম উভয় চরিত্রের অন্তর্নিহিত

সত্তাকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। এজন্য চরিত্রটির বিবর্তন স্পষ্টতর অনুধাবন করা যায়। বিবর্তন দেখাতে গিয়ে শকুন্তলাচরিত্রটিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন প্রাবন্ধিক; এক, তপোবনে প্রণয়পর্বে শকুন্তলা ও দুই, দুষ্মন্ত প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা।

টিপ্পনী

প্রথম পর্যায়ের শকুন্তলা সরলা, মুগ্ধা, প্রণয়অভিলাষী বালিকামাত্র যেন বা সসাগরা ধরিত্রীর সম্রাট দুষ্মন্তের খেলার পুতুল; দুষ্মন্তের ব্যাক্তিত্বের পাশে সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এই ব্যক্তিত্বের তফাৎ কিন্তু মিরন্দা বা জুলিয়েটের সমস্যা নয়। ফার্দিনান্দ বা রোমিও দুজনেই ব্যক্তিত্বে দুই নায়িকার সমান, এমনকি বয়সেও কাছাকাছি। ফলে তাদের যে স্বাভাবিক প্রগলভতা তা পাশ্চাত্যের সামাজিক সংস্থানের জন্য ততোটা নয়, যতোটা প্রণয়ীর সমকক্ষ হবার জন্য। এই কারণেই শকুন্তলার সংকোচ, লজ্জা ও বাহানার কারণ দুষ্মন্ত চরিত্রের ব্যাপ্তি ও বিশালতা। মিরন্দার সঙ্গে শকুন্তলার তাই মিল ও অমিল দুই বর্তমান। তারা যেন এক চিত্রকরের হাতে আঁকা দুটি আলাদা চিত্র।

কিন্তু দুষ্মন্তের রাজসভাতলে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা বালিকামাত্র নয়; সে রাজমহিষী এবং আসন্ন মাতৃত্বসম্ভাবনায় গৌরবান্বিতা। তাই এই অংশের শকুন্তলা রমণী, প্রেয়সী নয় কেবল; সুতরাং সে স্পষ্ট নিজের দাবি ও অভিযোগ জানাতে সক্ষম। তাই সে তখন আর শুধুমাত্র মিরন্দার সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই শকুন্তলার সঙ্গে প্রতিতুলনা করা যায় দেস্দিমোনার। কিন্তু তাঁর সঙ্গেও শকুন্তলা সম্পূর্ণ এক নন, একইসঙ্গে তুলনীয়া ও অতুলনীয়া।

তুলনীয়, কারণ ১. তারা দুজনেই গুরুজনের অনুমতি ব্যতিরেকেই বীর পরপুরুষে সমর্পিতা হয়েছেন। ২. উভয়েরই আশালতা পরে ভগ্ন। ৩. উভয়েই স্বামীপরিত্যক্তা। ৪. উভয়েই সতী, তবে সতীত্বের বিচারে দেস্দিমোনা শকুন্তলার থেকে উচ্চাসীনা। দেস্দিমোনার কোনও অভিযোগ নেই, সে স্বামীর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা। শকুন্তলাও সতী, কিন্তু তিনি স্বামীপরিত্যক্তা হয়ে প্রতিবাদে ও দোষারোপে উচ্চকিতা হয়েছেন। দেস্দিমোনা কিন্তু মৃত্যু অবধি স্বামীকে কোনওভাবেই কোনও দোষারোপ করেননি; এ কারণে তিনি গরীয়সী।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

তবে উভয়ের পার্থক্য আছে; যেমন তফাৎ সাগরে আর নন্দন কাননে তেমন তফাৎ তাদের দুজনের। বঙ্কিম তাঁর ওই অভিমতের সপক্ষে বলেছেন যে রচনাদুটির গঠনকৌশলে এ ফারাক বিদ্যমান। ইউরোপীয় আলংকারিকদের বিচারে ওথেলো নাটক, কিন্তু শকুন্তলা বা টেম্পেস্ট দৃশ্যকাব্য। তারা কাব্যগুণের আধার। সুতরাং নাটকের তরঙ্গভঙ্গ তাদের মধ্যে নেই। তবে ভারতীয় আলংকারিকদের মতে শকুন্তলাও অবশ্যই নাটক।

এক্ষেত্রে বঙ্কিমের মত শকুন্তলা যদি চিত্রকরের চিত্র হয় তবে দেস্দিমোনা ভাস্করের গড়া প্রায় সজীব এক মূর্তি । তাই দেস্দিমোনা শকুন্তলার থেকে অনেক স্পষ্ট, অনেক ধরাছোঁয়ার মধ্যের এক চরিত্র । যে গতিময়তা ওথেলোর আকর্ষণ তা শকুন্তলা বা টেম্পেস্ট-এ নেই। তাই এরা অনুপম কাব্য।

টিপ্পনী

এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের তুলনাত্মক বিচার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সমন্বয়বাদী মনোভাব, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনীষা এ প্রবন্ধের সম্পদ। নিজের বক্তব্য বোধগম্য করতে গিয়ে তিনি বাস্তব ও তত্ত্ব দুয়েরই সাহায্য নিয়েছেন। তাই শকুন্তলা চিত্র ও দেস্দিমোনা ভাস্কর্য যেমন বলেছেন, তেমনি নাটক ও দৃশ্যকাব্যের গঠন ও আন্তরচরিত্রের পার্থক্য সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন । এই ধারার অনুসরণ পরবর্তীতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মধ্যেও দেখা গেছে। সর্বোপরি বঙ্কিমের রচনা সমালোচনার উর্ধে উঠে সৃজনধর্মী হয়ে উঠেছে, যেমন হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনসাহিত্য প্রবন্ধে । রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তাঁর থেকে প্রাবন্ধিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে এগিয়ে রাখতে হলেও তাঁর কৃতিত্বকে ছোট করা যায় না কোনওভাবেই। তিনি ছিলেন পথিকৃৎ, তাকে সামনে পেয়ে যারা সমালোচনার পথে এগোনোর সুযোগ পেয়েছেন তাদের থেকে তাঁর কাজ কঠিন ছিল সন্দেহ নেই। তাই বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে সাহিত্যের তুলনাত্মক আলোচনার একটি স্মরণীয় প্রবন্ধ এই 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা' সে বিষয়ে মতভেদের স্থান নেই। শকুন্তলা যে সত্যি মিরন্দা ও দেস্দিমোনার এক মিলিত সত্তা সে বিষয়ে সহমত হতে এ প্রবন্ধের পাঠকদের দ্বিধান্বিত হবার সুযোগ তিনি কমই রেখেছেন বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথঠাকুর এবং বাংলার নবজাগরণ : সুশোভন সরকার

জীবনী

-অধ্যাপক সুশোভন সরকার ১৯শে আগস্ট, ১৯০০তে মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতা সুরেশচন্দ্র সরকার ও মাতা সরোজিনী সরকার । সরকারি চাকরির বদলির কারণে চারপুত্র-কন্যাসহ সুরেশচন্দ্র বিভিন্ন স্থানে পরিবার নিয়ে থেকেছেন । কাঁথির জন্মস্থান আর দাদামশাই-এর গিরিডির বাড়ির স্মৃতি তাঁর মনেছিল উজ্জ্বল । ১৯১৭-তে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে ভর্তি হন । একে একে ১৯১৯ -এআই.এ, ১৯২১ -এবি.এ এবং ১৯২৩-এএম.এ পাস করেন ।

টিপ্পনী

সাম্মানিক স্নাতক আর স্নাতকোত্তরে ইতিহাস বিষয়ে প্রথমশ্রেণিতে প্রথম হন তিনি। ছাত্রজীবনে পাওয়া অধ্যাপকদের মধ্যে তাঁর ওপরে বেশি প্রভাব ছিল অধ্যাপক কুরুভিলা জ্যাকারিয়া এবং অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর। কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় তিনি কোন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন না।

১৯২৩ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত তিনি অক্সফোর্ডে মডার্নহিস্ট্রি নিয়ে এম.এ পড়েন, সেখানেই তিনি প্রথম মার্কসবাদী ভাবধারার সংস্পর্শে আসেন। দেশে ফিরে ১৯২৬-এ প্রথমেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন, ১৯২৯ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং তারপরে ১৯৩৩ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করেন। সদ্য গড়ে ওঠা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এরপরে তিনি ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দেন। এখানেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৯৬১ সালে। পরে ১৯৬২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক রূপে যোগ দেন ও ১৯৬৭ তে পূর্ণ অবসর নেন।

১৯২৬-এদেশে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন, তারপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ান, শেষে সদ্য গড়ে ওঠা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৬-তে যোগ দেন ও সেখান থেকে অবসর নেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ অব্দি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপকরূপে পড়ানোর পরে তাঁর চাকুরিজীবনে সমাপ্তি টানেন।

তাঁর স্ত্রী ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের কন্যা রেবা। তাঁদের পুত্র ও কন্যা দুজনেই ইতিহাসের যশস্বী অধ্যাপক হয়েছিলেন। পরিচয় পত্রিকার প্রথাম সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল তাঁর প্রবন্ধ 'রুশবিপ্লবের পটভূমিকা'। আমৃত্যু তিনি পরিচয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। উদার, মুক্তচিন্তক, অথচ কোনও 'ডগমা'য় আবদ্ধ না থাকা এই বুদ্ধিজীবীর দুই হাতিয়ারের একটি অধ্যাপনা ও মার্কসবাদের আলয় ইতিহাসের বিশ্লেষণ অন্যটি তাঁর শাণিত কলম, যা মূলত মাতৃভাষাতেই সৃজন করে গেছে। ১৯৮২ সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই প্রথিতযশা অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক। বিজনরায় (জাপানী শাসনের আসলরূপ), অমিত সেন(ইতিহাসের ধারা) ছদ্মনামেও তিনি লিখেছেন।

জীবনের প্রথম তেইশ বছর তিনি রাজনীতি নিয়ে কি ভাবনা চিন্তা করেছেন তা জানার মতো যথেষ্ট প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ অক্সফোর্ডে থাকার সময়েই তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত হন এবং আজীবন তাঁর এই আনুগত্য অটুট ছিল। এই মার্কসবাদ সংলগ্নতার বিরূপ প্রভাব তাঁর চাকুরিজীবনে পড়ে। সরাসরি দলীয় সদস্য না

হলেও একজন একনিষ্ঠ দরদী হিসেবেই ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি তাকে জেনেছিল। ভারতে বস্তুবাদী ইতিহাসচর্চার অন্যতম সক্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি।

অধ্যাপক সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক পুস্তকে প্রথম "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাংলার রেনেসাঁস" প্রবন্ধ ১৯৬১ -তে প্রকাশিত হয়। পরে এটি প্রাবন্ধিকের 'বাংলার রেনেসাঁস' নামক প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয়।

টিপ্পনী

সংক্ষিপ্তসার–

১.

শতবর্ষের উৎসবেদূর থেকে দেখবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে একক স্বমহিমায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছেন তার থেকে মনে হয় এই হয়ে ওঠার যেন কোনো পশ্চাৎপট নেই। কিন্তু মানুষের কীর্তি যত বড় মহীরুহের মতোই হোকনা কেন মাটির সঙ্গে তারযোগ অবিচ্ছেদ্য। তাই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে গিয়ে উনিশ শতকের বাংলার অন্যান্য চিন্তাশীল বাঙালী তথা রামমোহন - দেবেন্দ্রনাথ - বিদ্যাসাগর - মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রদের মতো পূর্বসূরীদের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করে দেখা বাঙালীর পক্ষে স্বাভাবিক ও আবশ্যিক। বাংলার নবজাগরণের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে দুইদিক থেকে দেখা চলে। একদিকে উনিশ শতকের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যমণি তিনি, যার মধ্যে প্রেরণার সমস্ত অঙ্গ প্রকাশ পাচ্ছে। আবার সমসময়ের সবচিন্তা, পরস্পর বিরোধী ভাবধারা, ঘাত-প্রতিঘাত আলোড়ন এনেছিল তাঁরমনে, জগৎ বিমুখ ব্যাক্তি ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল না। রবীন্দ্র-মানসে নবজাগরণের চিন্তা প্রবাহের প্রতিধ্বনি ও বাংলার রেনেসাঁসে রবীন্দ্রনাথ যে সমৃদ্ধি এনেদিয়েছিলেন এই দুই-ই আলোচনার ও বিচারের প্রসঙ্গ শতবর্ষের দূর থেকে।

২.

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণকে রেনেসাঁস আখ্যা সম্প্রতি দেওয়া শুরু হয়েছে যার পিছনে আছে একে পনেরো-ষোলো শতকের ইউরোপের রেনেসাঁসের ইঙ্গিত। এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। প্রথমত, ইউরোপের রেনেসাঁসে ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বাণিজ্য-কৃষি-শিল্প সর্বত্রই আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু বিদেশি শাসনাধীনে থাকা এদেশে পুরনো ব্যবস্থা ভাঙার আয়োজন থাকলে ও নতুন সমাজ গড়ে তোলবার ইচ্ছা বা দায়িত্বর ইলতার নাগালের বাইরে।দ্বিতীয়ত, পশ্চিমী রেনেসাঁসের প্রধান ক্ষেত্র পশ্চিম ইউরোপের স্বাধীন রাজ্যগুলি, আর এদেশের নবজাগরণ এসেছিল বিদেশি শাসনাধীনে থাকাকালে। অন্যের অধীনে থাকা জাগরণের পথ অনুকূলের চাইতে প্রতিকূল

টিপ্পনী

করে তোলে বেশি। তৃতীয়ত, ইউরোপের রেনেসাঁসের উপজীব্য ছিল প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার। প্রাচীন এই সংস্কৃতির প্রভাবে গড়ে উঠল আধুনিক হিউম্যানিস্ট মণ্ডলী। আর আমাদের দেশের অতীত সভ্যতা-সম্পদ নতুন যুগের কতটা উপযোগী প্রশ্ন তোলার আগে যে কথা বুঝে নেবার তাহল বাংলার রেনেসাঁসের উন্মেষ ঘটিয়েছিল একালের পশ্চিম, যার শাসনে এদেশ তখন পরাধীন। অর্থাৎ, পশ্চিমের তুলনায় এদেশের রেনেসাঁস খণ্ডিত, আড়ষ্ট ও কিছু কম স্বাভাবিক প্রকাশ সম্পন্ন। তবে তার মানে এদেশের রেনেসাঁসের মূল্য অত্যল্প বা ইউরোপের রেনেসাঁস সর্বাঙ্গ সুন্দর তা নয়। সে রেনেসাঁসের দুর্বলতা ও তার বৈশিষ্ট্যের অঙ্গ। আর বাংলার তৎকালীন অতীতের পাশে যে জাগরণ উনিশ শতকে ঘটেছিল তাকে মাত্রা ছাড়া মহিমাময় করে দেখা বা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করা দুই-ই ঐতিহাসিক বাস্তববিচার থেকে বিচ্যুতি। যুগ বিশেষের কীর্তির বিচার সেই যুগের প্রেক্ষিতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৩.

বাংলার রেনেসাঁসকে দেখা হয় এক মুখী জাতীয় জাগরণের স্রোত হিসেবে। সেখানে শিক্ষিত মানুষের চিন্তা-উদ্যমের অগ্রগতির কথা ও সর্বাঙ্গীণ জাগরণের প্রসঙ্গ প্রধান। এ এক ধরনের দেখা যাতে মোট সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার দিকে লক্ষ্য থাকে। তবে এ দেখা কিছু এক পেশে ওবাহ্যিক বিচার। কারণ চিন্তার জাগরণের একই পর্যায়ে নানান বিরোধী ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব, পরস্পর-বিরোধিতা পাশাপাশি থাকে। সময়ে সময়ে ও এদের সমর্থন ও প্রত্যখ্যান যেমন থাকে তেমনি পরবর্তীতে ও ঐতিহাসিককে দূর থেকে দেখতে হয় কোনধারা সার্থক বা কোনদৃষ্টি ভঙ্গি কালের বিচারে অচল। সেখানে গভীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে হয় এক মুখী স্রোতের বদলে প্রবাহের বিপরীতধর্মী আবর্ত।

৪.

আমাদের নবজাগরণের মধ্যে যে দুটি অন্তর্বিরোধের প্রধানধারা তার একটি পশ্চিমী দৃষ্টি বা Westernism এবং প্রাচ্যাভিমান বা Orientalism. রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই দুয়ের ঝঙ্কার-ই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের রুশ দেশের ইতিহাসে ও এরকম অন্তর্দ্বন্দ্ব মাসারিক প্রভৃতির লেখাতে দেখা যায়। অবশ্য অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে যে সুস্পষ্ট বিভাজন রুশ দেশে দেখা যায়, এদেশে সেরকম নয়। এখানে এক মানুষের মধ্যেই দুই ঝোঁকের পরিচয় আছে। তাই

পশ্চিমী দৃষ্টি বা প্রাচ্যাভিমান এদেশে দুটি পৃথক গোষ্ঠীর নয়, বরং এক অমূর্তধারণা যা বিশ্লেষকের কাছে ট্রেন্ড হিসেবে বিচার্য।

আবার এই দুইদশার আদর্শগত পার্থক্য বোঝা যায় এদের বৈশিষ্ট্য বিচার করলে। মনে রাখতে হবে ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে এই আদর্শের প্রকাশ সমান প্রবল বা সম্পূর্ণ না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বাংলার নবজাগরণে পশ্চিমী ভাবধারার প্রভাব প্রথম দেখা যায় সমাজ সংস্কার পরিকল্পনায়। এর প্রতি প্রাচ্যাভিমানের ঔদাসিন্য ছিল তানয়, কিন্তু উত্তেজনা বা উৎসাহতে মন ছিল না। নবজাগরণের যুক্তিবাদী মনোভাব পশ্চিমী। তা দিয়েই অবশ্য প্রাচীনকে বর্জনের জন্য শাস্ত্রের সমর্থন খোঁজা হত। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ছাড়াও 'ইয়ংবেঙ্গলে' যুক্তিবাদের প্রবল প্রভাব দেখা গেছিল। কিন্তু যুক্তিবাদতো নিরাসক্ত সত্যের সন্ধান কিংবা বুদ্ধির নির্বিশেষ বিচার নয়। যুক্তিবাদ ইতিহাসে পুরনো ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে নতুন আদর্শের অভিযানের পক্ষ নিয়েছে। বাংলার নবজাগরণে পশ্চিমী যুক্তিবাদ আনল বুর্জোয়াতন্ত্রের মানবতাবাদকে, কারণ প্রাচ্য-সমাজে সবমানুষকেই মানুষের মর্যাদা দেবার আগ্রহ নেই ।এর বিপ্রতীপে গড়ে উঠল প্রাচ্যা ভিমান, যার প্রথম আশ্রয় ও বৈশিষ্ট্য প্রাচীন গৌরব কাহিনি । আর সেই গৌরব গাথা ঘটনাক্রমে হিন্দু সভ্যতার। হিন্দুর সামাজিক ঐতিহ্য পাশ্চাত্য ঝড়ে কাবু হয়নি বিশেষ। ফলত এই দুই মিলে গড়ে উঠল প্রাচ্যা ভিমানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য – হিন্দুত্ববোধ। এর সার্থকতার পাশাপাশি দুর্বলতা হল, ভারতবর্ষ একমাত্র হিন্দুদের দেশ নয়। শতধা বিভক্ত হিন্দুসমাজ বা সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজকে এই বোধ বাঁধতে অক্ষম। মানবতাবাদী পশ্চিমী দৃষ্টির দখল এই দিকে। প্রাচ্যাভিমানের তৃতীয় দিক হল ভক্তি-প্রবণতা, তা আবার যুক্তিবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ বা রামকৃষ্ণের ভক্তি সাধনাকে পশ্চিমী মনদিয়ে শ্রদ্ধা করা যায়, তারমধ্যের ধর্মবোধের যাথার্থ্য হেতু। কিন্তু শতাব্দীর শেষ দিকের ভক্তি মার্গ যুক্তি বা মানবতাবাদ থেকে জনমনকে বিক্ষিপ্ত করতেই পারে, যা প্রাচ্যাভিমান পশ্চিমীভাবের প্রতিরোধ কল্পে আশ্রয় করেছিল।

বাংলার রেনেসাঁসের এই দুই ধারার কোনটিকেই অস্বীকার করা চলেনা। সাহিত্যশিল্পের প্রাচুর্য ও শিক্ষিত সমাজে স্বাদেশিকতার উন্মেষ ও অগ্রগতি রেনেসাঁসের এই দুই প্রভাবের পিছনে এই দুইধারা ক্রিয়াশীল ছিল। এই দুই ধারার বিকৃত রূপকে এখানে উল্লেখ না করে তাদের আসল রূপকে এখানে মূলত দেখানো হল। ধারণা দুটির বিরোধ অস্বীকার করা যায় না। যদিও বারবার এদের সমন্বয়ের রূপ খোঁজা হয় রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। কিন্তু সমন্বয়ের ফলে উভয়কে ছাপিয়ে যে তৃতীয়ের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রতিষ্ঠা ঘটবার কথা তা কোথায় ? আসলে যাকে সমন্বয় বলা হয় তা দুই বিরোধী ঝোঁকের সহাবস্থান মাত্র। কিন্তু ইতিহাসের কাজ বিরোধের সন্ধান পেলে তার কিছু মূল্য বিচার করা। আর আমাদের বিচারে সামাজিক আদর্শের সংঘাতটাই প্রধান। আমি পশ্চিমী দৃষ্টিকে প্রাচ্যাভিমানের উপরে স্থান দিই দুই কারণে। প্রথমত, এই জাগরণের মূল নতুনের আগমনে, প্রাচীন রক্ষণশীলতা তার আদি উৎস নয়। রবীন্দ্রনাথ ও এরকম মনে করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, যে সমাজবাদ আমাদের কাম্যতার সংগতি পশ্চিমীদৃষ্টির মধ্যেই, তাই রেনেসাঁসের অন্তর্বস্তু যে পশ্চিমীতানা বলে উপায় নেই।

৫.

রবীন্দ্রনাথের ও পরে নবজাগরণ কী ঢেউ তুলেছিল এবং পশ্চিমী প্রত্যয় ও প্রাচ্যাভিমানের প্রভাবে তার লেখা কী সুরে বেজেছিল এবার সরাসরি সে প্রসঙ্গে আসা যাক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার উদ্ধৃতি উল্লিখিত হয়েছে ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে এবং তা গৃহীত হয়েছে বিশ্বভারতী - প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রামাণ্য সংস্করণ থেকে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ও কালানুক্রমে মানুষের সৃষ্টিকে দেখবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তারিখের ক্রমে তাঁর রচনা দেখলে তাঁর চিন্তার ক্রমবিকাশ ধরতে পারা সম্ভব; যদিও সংবেদনশীল কবির মনে একই সময়ে বিরোধীভাবের সুরসম্মিলন দেখা যেতে পারে তবুও পর্যাপ্ত সাক্ষ্যের সমাবেশে ভাবধারার স্তরভেদওপর্বান্তরের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

সারাজীবনে নবজাগরণকে তিনি যেভাবে দেখেছেন তা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়, আর নিজের রচনাবলীর অবতরণিকাতে তিনি তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে দেশের নিজেকে খুঁজে পাওয়াতেই রচনার সার্থকতা বলে মনে করেছেন।

৬.

আদিপর্বে, কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ লেখা বর্জন করেছিলেন, রচনাবলীতে। সে বয়সে নবজাগরণ বিষয়ে তাঁর চিন্তা না হওয়া স্বাভাবিক হলেও, তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডল ও উত্তরাধিকার অনুযায়ী তীব্র পশ্চিমী অনুকরণ বা প্রাচ্যসংস্কার-অনুরাগের প্রাবল্য দুই থেকেই তিনি মুক্ত ছিলেন। সামাজিক নিয়মে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হলে তাকে বর্জন করার সপক্ষে তিনি লিখেছেন, ১৮৮১-তে লেখা 'এক-চোখো সংস্কার' প্রবন্ধে। আবার ১৮৮২-তে কলকাতায় সুফি আন্দোলনের প্রভাবে প্রাচ্য প্রত্যয়-ও তাঁর মধ্যেছিল। ১৮৮২-তে 'মেঘনাদবধ সমালোচনায়' মধুসূদনকে আক্রমণ করেন প্রাচ্য ঐতিহ্যের অপমানের জন্য, ১৮৮৫-তে 'রামমোহনরায়' হিন্দু ধরমের রক্ষা তাঁর প্রধান মহত্ব

বলে ভারতের সঙ্গে হিন্দুর একসমীকরণ করেন। সেবছরই 'সমস্যা' প্রবন্ধে 'পরিবার-বিশেষে' বাল্যবিবাহেরঅবসানওবিধবাবিবাহের প্রবর্তনার কথা বলেন।

৭.

পরবর্তীতে বছরে (১৮৮৬-১৮৯৮) যুবক রবীন্দ্রনাথের মনে পশ্চিমী প্রভাব বাড়ে। ১৮৮৪ তে শশধর তর্কচূড়ামণির আবির্ভাবে নব্যহিন্দুয়ানির মাথাচাড়া দেওয়ার বীন্দ্রনাথের অসহ্য মনে হয়েছিল। সে প্রমাণ তাঁর নানা প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে। হাস্যকৌতুক-এর 'আর্য ও অনার্য' (১৮৮৬), 'গুরুবাক্য' (১৮৮৭), 'চিঠিপত্র' (১৮৮৭), 'প্রত্নতত্ত্ব' (১৮৯১) ইত্যাদি প্রবন্ধ বা কবিতাতেও এই প্রচলনের প্রতি তাঁর শ্লেষের পরিচয় প্রচুর লক্ষিত হয়।

প্রাচ্যভাবের বিকৃতির প্রতি যেমন তেমনি খাঁটি প্রাচ্যাভিমানের পরিবর্তন-বিমুখতার বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথ লেখেন। তাঁর নিদর্শন 'পরিত্যক্ত' (১৮৮২) কবিতায়, 'চিঠিপত্র' (১৮৮৭), 'হিন্দুবিবাহ' (১৮৮৭), 'মুসলমান মহিলা' (১৮৯১), 'প্রাচ্যসমাজ' (১৮৯১), 'কর্মের উমেদার' (১৮৯১), 'আদিম সম্বল' (১৮৯১), 'আচারের অত্যাচার' (১৮৯২), 'সমুদ্রযাত্রা' (১৮৯৩), 'পঞ্চভূতের ডায়েরি' (১৮৯৩), 'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য' (১৮৯৪), ইত্যাদি সমস্ত প্রবন্ধেই মাত্রাতিরিক্ত প্রাচ্যসংস্কারবদ্ধতা যে মানবতার বিকাশের বিরোধী বলেই বর্জনীয় সে বক্তব্য নানাভাবে প্রকাশিত।

বাংলার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মনেপ্রাণে পশ্চিমীভাবাপন্ন সে কথা অস্বীকার করা শক্ত। অথচ বহিরঙ্গে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালি। 'বিদ্যাসাগর চরিত'(১৮৯৫) প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের এই বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। একইভাবে 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৮৯৪) প্রবন্ধে রামমোহনের অনুরূপ প্রশংসা তিনি করেছেন।

এই সময়ের 'দুই উপমা' (১৮৯৬), বা 'সতী'(১৮৯৭) কবিতায় লোকাচার ও ধর্মের আবদ্ধতাকে আক্রমণ তিনি করেছেন। আবার 'কোট বা চাপকান' (১৯৯৮), 'অযোগ্য ভক্তি' (১৯৯৮), প্রবন্ধেও ধর্মের ভেদাভেদকে তিনি যুক্তিবুদ্ধিহীনতার লক্ষণ হিসেবেই দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যাকে পশ্চিমী দৃষ্টি বলা হচ্ছে তার সুর যদিও প্রাচীন প্রাচ্য ঐতিহ্যে পাওয়া যায়, তবুও এ কথা মনে রাখা দরকার যে উনিশ শতকে আসা প্রচলিত সংস্কারবিরোধী ভাবনা এসেছিল পাশ্চাত্য থেকে, দেশাভিমান থেকে নয়। প্রাচ্যপ্রীতির এ সময়ের ঝোঁক ছিল যুক্তি দিয়ে বিচারমাত্র না করে প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকা, যুগপ্রবর্তক রামমোহন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের প্রবক্তা। সমন্বয়সাধনের থেকেও এ ছিল তাঁর

টিপ্পনী

বড় অবদান।

৮.

ইতিমধ্যে দেশে চরমপন্থার হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথের ১৮৯৮ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত লেখায় সেই প্রভাবের প্রাবল্য দেখা যায়। জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতিতে চরমপন্থী আন্দোলনের দান অসামান্য হলেও তাতে যে অন্তর্বিরোধ ছিল সে কথা অনস্বীকার্য। আন্দোলনের পিছুটান সাময়িক সাফল্য দিলেও পরে তা আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। স্বদেশী যুগ যার সুচনা ১৯০৫ -এর কিছু আগেই, তার মধ্যে প্রাচ্যাভিমানের বিরাট উত্তাপ ছিল। সেটা তখনকার মতো আন্দোলনের চালিকাশক্তি হলেও পরে সেটাই আন্দোলনের দুর্বলতা হিসেবে নিজের প্রাপ্য আদায় করে নেয়।

এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনের অশান্তি আন্দোলনের শুরুতেই দেখা যায়। আত্মশক্তির আবাহনের কথা তাঁর সব পর্যায়ের লেখাতেই রয়েছে। আন্তরিক অনুভূতি থেকে ছিল তাঁর বিশ্বাসের দিকে যাত্রা। তাই হিন্দুদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য রাজনৈতিকভাবে উপস্থিত না থাকলেও তারা যে জাতিবদ্ধ সে উল্লেখ তাঁর ১৮৯৮ তে লেখা প্রসঙ্গ কথাতে পাওয়া যায়।

১৯০১-এ 'নৈবেদ্য'-তে 'তুচ্ছ আচার' ও 'নিরর্থ আচার'-এর প্রতি তাঁর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু সেই একই বছরে লেখা 'ব্যাধি ও প্রতিকার'-এ তিনি পাশ্চাত্যমন্ত্র গ্রহণের বদলে চিরন্তন ভারতীয় আদর্শ গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছেন। যদিও আসল সমস্যা এখানেই। যুগোপযোগী হতে গেলে বোধহয় চিরন্তন আদর্শের দারস্থ হওয়ার থেকে নতুন আদর্শের দেশোপযোগী রূপান্তর শ্রেয়স্কর।

১৯০১-এ লেখা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা'য় তিনি হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর থেকেই জাগিয়ে তুলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও তার মধ্যে নেশন গঠনের প্রাধান্য যে নেই-ই সে কথাও বলেন। ১৯০১-এ অন্যান্য লেখাতেও প্রাচ্য প্রত্যয়, 'সমাজভেদ'-এ বিধবাবিবাহ ও বাল্যবিবাহের পক্ষে মত দিলেন। 'বিরোধমূলক আদর্শ'-তে নেশনের বিপক্ষে ও সমাজগঠনের পক্ষে কথা বললেন। 'ভারতবর্ষীয় সমাজ'-এ হিন্দু সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সমাজের অবস্থানের পক্ষেই বলেন। ওই একই বছরে 'নেশন কি' প্রবন্ধে অতীত ও বর্তমানের গুরুত্ব প্রসঙ্গে ধরিয়ে দিয়ে তার ভবিষ্যৎচিন্তা না থাকার কথা জানালেন।

১৯০২-তে প্রাচ্যাভিমান প্রবলতর হয়ে উঠল, 'নববর্ষ' প্রবন্ধে সেই সনাতন ভারতের জয়গান গাইলেন। 'বারোয়ারি মঙ্গল'-এ বলে দিলেন পাশ্চাত্যের অর্থনীতি

টিপ্পনী

ভারতের জন্য নয়। 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে ভারতের বর্ণাশ্রমের সমাজভেদের সপক্ষে যুক্তি দিলেন । ওই বছরেই 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে মুসলমান স্থাপত্যকে ভারতের ইতিহাস বলার অপ্রাসঙ্গিকতার কথা বললেন তিনি। আবার 'অত্যুক্তি'-তে বললেন বিলিতি সভ্যতার হাতে নিজেদের সমর্পণের চমক ভাঙবার সময় সমাগত।

'মহর্ষির জন্মোৎসব'(১৯০৪) প্রবন্ধে এদেশের ধর্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ঔচিত্যের কথা বললেন, আর 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধে সতীদাহে আত্মোৎসর্গ করা পিতামহীকে প্রণাম জানালেন। ১৯০৪-এ লেখা 'স্বদেশী সমাজ'-এর আত্মশক্তির আবাহনের প্রসঙ্গ আমাদের ইতিহাসে উজ্জ্বল হলেও আমরা এখন দেখব এখানেও স্টেট থেকে সমাজকে পৃথক করবার কথা বলা হয়েছে। হিন্দু সমাজের গঠন সংরক্ষণের পক্ষে বলা হয়েছে। একমাস পরে লেখা 'স্বদেশী সমাজের পরিশিষ্ট' -তে বিদেশী আইনের সাহায্যে এদেশীয় ধর্মীয় আচারে হস্তক্ষেপের জোরালো বিরোধীতা করা হয়েছে।

১৯০৫-এ লেখা 'সফলতার সদুপায়'-তে দেশীয় ঐক্য গঠনের পরমুহূর্ত থেকে বিদেশী শাসনের অপ্রয়োজনের কথা আর এই ঐক্য ধর্মাশ্রয়ী জাতির ঐক্য কারণ, ওই বছরেই লেখা 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে দেশশাসনের কর্তৃসভার অধিনায়ক একজন হিন্দু ও একজন মুসলিম হবেন বলা হয়েছে । যদিও তাতে দেশ হয়ে ওঠে ধর্মসমাজের ফেডারেশন। এই বছরেই লেখা 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধেও বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পায়।

এই সময়ে বাংলাদেশে যে আলোড়ন উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার সামনের সারির অভিযাত্রী । 'বিজয়া সম্মিলনে' তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত যুদ্ধযাত্রার আহ্বান জানান। কিন্তু এই প্রবল ভাবাবেগের আগের সময়ে যে তাঁর মধ্যেও প্রাচ্যাভিমানের আতিশয্য ছিল তার প্রমাণ আগের প্রবন্ধগুলির উল্লেখে।

৯.

১৯০৭ থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখায় একটা মোড় ফিরবার নিদর্শন পাওয়া যাবে। এর পরের দশবছরের প্রবল রচনাস্রোতে পরিণত রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যাবে। তখন তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছে যে নতুন ভারতবর্ষের স্বপ্ন তাকে আমাদের বিশ্লেষণে পশ্চিমী দৃষ্টি আখ্যা দেওয়া যায়।

'গীতাঞ্জলি'র তিনটি সুপরিচিত কবিতায় এই সুর যেগুলো ১৯১০ সালে পরপর তিনদিনে লেখা । ১৯০৬-তে লেখা 'রাজভক্তি' প্রবন্ধে এর পূর্বাভাস, যেখানে নতুন

টিপ্পনী

ভারতের প্রতীক্ষা, অতীতের আবাহন নয়।

স্বদেশী আন্দোলন থেকে রবীন্দ্রনাথের অপসারণের অন্যতম ঝোঁক প্রাচ্যাভিমান থেকে পশ্চিমী দৃষ্টির দিকে প্রত্যাবর্তন। স্বদেশী আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রতি হয়তো তিনি অবিচার করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাজ পোলিটিকাল অভিযান নয়, তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র ভাবনা ও আদর্শে। স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামে তিনি উদাসীন ছিলেন না তার প্রমাণ পাবনা কনফারেন্সে অভিভাষণ (১৯০৮), কংগ্রেসের প্রকাশ্য বক্তৃতা (১৯১৭), নাইটহুড ত্যাগ (১৯১৯), হিজলী বন্দী-হত্যার প্রতিবাদ (১৯১৩) ইত্যাদি। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল অভ্যুদয়ের মুহূর্তের পর তাঁর মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে পোলিটিকাল এজিটেশন তাঁর কর্মক্ষেত্র নয়। সেইসঙ্গে প্রাচ্যাভিমানের সীমাবদ্ধতার পীড়ায় কাতর হয়ে তিনি মুক্তি খোঁজেন পশ্চিমী দৃষ্টির আলোকে।

মুক্তির পরিচয় নিয়ে এল 'গোরা'(১৯০৭-১৯০৯)। সমসাময়িক ঘাতপ্রতিঘাতকে সাহিত্যসৃষ্টিতে চিত্রিত করবার অতুলনীয় নিদর্শন এর পাতায় পাতায়। 'গোরা'র বক্তব্যে যারা সহমত তাদেরও প্রশ্ন কার্যত আজকের দিনেও তারা এগুলো মেনে চলেন কি না ? ভাল বলে স্বীকার করেও সামাজিকভাবে তা পালনে অস্বীকৃত হওয়ার এদেশি প্রথার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'শিক্ষাবিধি' (১৯১২) -তে।

উপন্যাসের নায়ক প্রাচ্যাভিমানী হয়েও এদেশের দুর্বলতাকে আবিষ্কার করেছে ও উপন্যাসের শেষে ধর্মের উর্দ্ধে ভারতবর্ষীয় হিসেবে নিজের পরিচয় খুঁজে পেয়েছে।

১৯০৮-এ 'পূর্ব ও পশ্চিম' এরই প্রতিধ্বনি করেছে। ভারতের ইতিহাস যে হিন্দুর ইতিহাস নয় এবং মনুষ্যত্বের ওপর দাঁড়িয়ে রামমোহনের সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ভারতকে মেলানোর চেষ্টাকে তিনি পূর্ণ উপলব্ধি করেছেন।

বাংলাদেশে পশ্চিমী হাওয়াকে স্বীকার করে নিলেন 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে। মধুসূদনের ভাবের মধ্যে পশ্চিমী ভাবের প্রভাবজনিত বিদ্রোহের কথাও তিনি বললেন। ১৯০৭-এ 'বাস্তব' প্রবন্ধে হিন্দুত্বের প্রতি কিছু বক্রোক্তি, আর ১৯০৮-এ 'পাবনা অভিভাষণ'-এ মুসলমানদের সমস্ত প্রাপ্য সমান করে বন্টনের প্রতি তিনি দৃষ্টি দিতে বলেছেন।

'সমস্যা' প্রবন্ধেও স্পষ্টত সমস্ত ধর্ম মিলে একটি জাতি গড়ে না তুললে দেশের স্বাধীনতা আসবে না সেকথা বলেছেন। 'সদুপায়' প্রবন্ধে প্রয়োজনের খাতিরে মুসলমানদের ভাই ডাকার অন্তঃসারশূন্যতার কথা বলেছেন। আদর্শ ও আচরণের ফারাকের কথাও বলেছেন এখানে। তিনি এও বিশ্লেষণ করে দেন যে জনসংযোগের

টিপ্পনী

গোঁড়া পাশ্চাত্য আদর্শে৷ দেশীয় উপায়ে যা হচ্ছিল তাতে সমষ্টির মোটেই নয়, অল্প ক্ষেত্রে ব্যক্তির উন্নতির পথ গড়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্য জনসংযোগ অতীত হিন্দু গৌরবের মধ্যে ঘুরে মরবার বদলে যুক্তির পথে সব মানুষের অধিকারের কথা বলে।

'গোরা'র পরে 'অচলায়তন'(১৯১১) প্রতিষ্ঠিত আচার-সংস্কারের ওপরে প্রত্যক্ষ আক্রমণ। পরিণত আত্মস্থ রবীন্দ্রনাথ শুধু রূপকে নয় প্রবন্ধেও স্পষ্ট প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, যা আমরা পাই,'ধর্মের অধিকার'(১৯১২), 'ধর্মশিক্ষা' (১৯১২) ইত্যাদি প্রবন্ধে।

এই ১৯১২-তেই রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে ব্রাহ্মকে হিন্দুধর্মের সংস্কৃতরূপ বলেছেন । একই বছরে 'যাত্রার-পূর্ব-পত্র' প্রবন্ধে ইউরোপাগত আদর্শকে অভিনন্দন জানিয়েছেন । আবার 'ইংলন্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রী'তেবলেছেন গতি বা প্রাণশক্তি ইউরোপকে রক্ষা করে চলেছে। আমাদের সমাজে মনুষ্যত্বের পীড়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন'লক্ষ্য ও শিক্ষা' প্রবন্ধে।

১৯১৪-তে 'বলাকা' এল তার গতির বন্দনা নিয়ে। তাতে থাকলো এগিয়ে চলার ডাক-ও । কবিতা থেকে 'লোকহিত' প্রবন্ধে এসে আমরা দেখব অন্তরে যাকে ভাই বলে মানতে পারিনি রাজনীতির প্রয়োজনে তাকে ভাই বলার ভান যে কাজের কথা নয় সে বিষয় তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন । ১৯১৫-১৬ তে 'ঘরে বাইরে' তেও তিনি এই আচরণ ও আদর্শের অসাম্য নিয়ে বলছেন। বলছেন স্ত্রী জাতি ও মুসলমান ধর্মের মানুষের মানুষের অধিকারের কথা।

প্রাচ্যাভিমানী হয়তো বলবেন উপরিউক্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের অনেক কথাই তারাও বলে থাকেন৷ সে কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় প্রাচ্যাভিমানের সেদিনের ঝোঁক হোক বা আজকের, তার সঙ্গে এ সমস্ত কথার সুরের বিরোধ অগ্রাহ্য করা ন্যায়সংগতভাবে অসম্ভব৷

১০.

জাগরন একটি প্রক্রিয়া বলে কোনও না কোনও সময়ে তাতে ছেদ টানতে হবে। ইউরোপের রেনেসাঁসের প্রভাব আজ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকলেও আমরা ষোল-সতের শতকে তার সীমা নির্দেশ করে থাকি । বাংলার রেনেসাঁসকেও তেমনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিধৃত বলা যায়৷ রামমোহনে শুরু হয়ে পরবর্তী একশো বছরে তার বিস্তার।

তার পরেও শতাব্দীর অর্ধেক জুড়ে রবীন্দ্রনাথের লেখার উৎসার ঘটেছে। দুই যুগের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছেন তিনি। যদিও 'বলাকা' ; ঘরে বাইরে'র দৃষ্টির থেকে আর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মুখ ফেরাননি তিনি।

শেষ পর্বের সূচনা করেছিল 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৯১৭)। সেখানে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার, যুক্তির সঙ্গে সংস্কারের একটা বোঝাপড়া যে এদেশের সর্বত্র একটা বৈপরীত্যের সহাবস্থান ঘটিয়ে চলেছে সে কথা বলেছেন।

'রাশিয়ার চিঠি'(১৯৩০)-তে নতুন দেশ আবিষ্কারের আনন্দ, 'কালান্তর'(১৯৩০)-এ পাশ্চাত্য যুক্তিবোধের পাশে এদেশীয় শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশের সহাবস্থানের প্রসঙ্গ আবার। শেষ পর্যন্ত 'সভ্যতার সংকট'-এ রবীন্দ্রনাথ আক্রমণ করলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনে পশ্চিমী দৃষ্টির বিকৃতরূপটাকে, তার অতীত ব্রিটিশ শাসনের গৌরবে আস্থাকে। আর তাই রাশিয়া ও জাপানের নবীন উন্নতির সঙ্গে তুলনা করলেন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের দুরবস্থাকে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনেও পশ্চিমী দৃষ্টির প্রতি আস্থা রইল অটল। তিনি প্রগতিশীল যে তার প্রমাণ তাঁর পশ্চাৎগমন না ঘটা। পরিণত জীবনের শেষার্ধেরও বেশি জুড়ে থাকলো ভবিষ্যতের উপযোগী পশ্চিমী আদর্শের প্রতি আন্তরিক প্রীতি। 'বাংলার নব-জাগরণের ইতিহাসে পশ্চিমী দৃষ্টিকে আমি প্রাচ্যাভিমানের উপর স্থান দিই দুই কারণে' – লেখকের এই সিদ্ধান্ত প্রবন্ধে কিভাবে পরিণতিলাভ করেছে আলোচনা কর।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক সুশোভন সরকার তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ' প্রবন্ধের শুরুর দিকে সার্বিকভাবে বাংলার নবজাগরণের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। সেখানে তাঁর সিদ্ধান্ত বাংলার নবজাগরণে প্রাচ্যাভিমানের থেকে এগিয়ে রয়েছে পশ্চিমী দৃষ্টি। অধ্যাপক সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক পুস্তকে প্রথম এই প্রবন্ধ ১৯৬১ -তে প্রকাশিত হয়। পরে এটি প্রাবন্ধিকের 'বাংলার রেনেসাঁস' নামক প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয়।

তিনি স্পষ্টত এই বক্তব্য জানিয়েছেন যে ইতিহাস যেহেতু ক্রমবিবর্তনের ধারা, তাই তাতে হঠাৎ করে ঘটে ওঠা আকস্মিকের জায়গা নেই। সমস্ত ঘটনাই পারম্পর্যসূত্রে গাঁথা। প্রাবন্ধিকের সেই চিন্তানুসারি মত হল শতবর্ষের উৎসবে দূর থেকে দেখবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে একক স্বমহিমায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছেন তার থেকে মনে হয় এই হয়ে ওঠার যেন কোনো পশ্চাৎপট নেই। কিন্তু মানুষের কীর্তি যতবড় মহীরুহের মতোই হোকনা কেন মাটির সঙ্গে তার যোগ অবিচ্ছেদ্য। তাই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে গিয়ে উনিশ শতকের বাংলার অন্যান্য চিন্তাশীল বাঙালী তথা রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-

বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রদের মতো পূর্বসূরীদের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করে দেখা বাঙালীর পক্ষে স্বাভাবিক ও আবশ্যিক।

অধ্যাপক সরকারের মতে, বাংলার নবজাগরণের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে দুইদিক থেকে দেখা চলে। একদিকে উনিশ শতকের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যমণি তিনি, যার মধ্যে প্রেরণার সমস্ত অঙ্গ প্রকাশ পাচ্ছে। আবার সম সময়ের সবচিন্তা, পরস্পর বিরোধী ভাবধারা, ঘাত-প্রতিঘাত আলোড়ন এনেছিল তাঁর মনে, জগৎ বিমুখ ব্যাক্তি ভাবনা তাঁরমধ্যে ছিলনা। রবীন্দ্র-মানসে নবজাগরণের চিন্তাপ্রবাহের প্রতিধ্বনি ও বাংলার রেনেসাঁসে রবীন্দ্রনাথ যে সমৃদ্ধি এনেদিয়েছিলেন এই দুই-ই আলোচনার ও বিচারের প্রসঙ্গ শতবর্ষের দূরথেকে।

আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা দেখি প্রাবন্ধিকের বক্তব্য, উনিশ শতকের বাংলারন বজাগরণকে রেনেসাঁস আখ্যা সম্প্রতি দেওয়া শুরু হয়েছে যার পিছনে আছে একে পনেরো-ষোলো শতকের ইউরোপের রেনেসাঁসের ইঙ্গিত। এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। প্রথমত, ইউরোপের রেনেসাঁসে ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বাণিজ্য-কৃষি-শিল্প সর্বত্রই আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু বিদেশি শাসনা ধীনে থাকা এদেশে পুরনো ব্যবস্থা ভাঙার আয়োজন থাকলে ও নতুন সমাজ গড়ে তোলবার ইচ্ছা বা দায়িত্ব রইল তার নাগালের বাইরে। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমী রেনেসাঁসের প্রধান ক্ষেত্র পশ্চিম ইউরোপের স্বাধীন রাজ্যগুলি, আর এদেশের নবজাগরণ এসেছিল বিদেশি শাসনাধীনে থাকাকালে। অন্যের অধীনে থাকা জাগরণের পথ অনুকূলের চাইতে প্রতিকূল করে তোলে বেশি। তৃতীয়ত, ইউরোপের রেনেসাঁসের উপজীব্য ছিল প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার। প্রাচীন এই সংস্কৃতির প্রভাবে গড়ে উঠল আধুনিক হিউম্যানিস্ট মণ্ডলী। আর আমাদের দেশের অতীত সভ্যতা-সম্পদ নতুন যুগের কতটা উপযোগী প্রশ্ন তোলার আগে যেকথা বুঝে নেবার তাহল বাংলার রেনেসাঁসের উন্মেষ ঘটিয়েছিল একালের পশ্চিম, যার শাসনে এদেশ তখন পরাধীন।

যুক্তি সহ-ই প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমের তুলনায় এদেশের রেনেসাঁস খণ্ডিত, আড়ষ্ট ও কিছুকম স্বাভাবিক প্রকাশ সম্পন্ন। তবে তার মানে এদেশের রেনেসাঁসের মূল্য অত্যল্প বা ইউরোপের রেনেসাঁস সর্বাঙ্গ সুন্দর তা নয়। সে রেনেসাঁসের দুর্বলতা ও তার বৈশিষ্ট্যের অঙ্গ। আর বাংলার তৎকালীন অতীতের পাশে যে জাগরণ উনিশ শতকে ঘটেছিল তাকে মাত্রাছাড়া মহিমাময় করে দেখা বা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করা দুই-ই ঐতিহাসিক বাস্তব বিচার থেকে বিচ্যুতি। যুগবিশেষের কীর্তির বিচার সেই যুগের প্রেক্ষিতে হওয়া-ই বাঞ্ছনীয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অথচ প্রাবন্ধিক দেখেছেন যে, বাংলার রেনেসাঁসকে দেখা হয় একমুখী জাতীয় জাগরণের স্রোত হিসেবে। সেখানে শিক্ষিত মানুষের চিন্তা-উদ্যমের অগ্রগতির কথা ও সর্বাঙ্গীণ জাগরণের প্রসঙ্গ প্রধান। এ একধরনের দেখা যাতে মোটসাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার দিকে লক্ষ্য থাকে। তবে এদেখা কিছু একপেশে ও বাহ্যিক বিচার। কারণ চিন্তার জাগরণের একই পর্যায়ে নানান বিরোধী ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব, পরস্পর-বিরোধিতা পাশাপাশি থাকে। সমসময়ে ও এদের সমর্থন ও প্রত্যখ্যান যেমন থাকে তেমনি পরবর্তীতে ও ঐতিহাসিককে দূর থেকে দেখতে হয় কোন ধারা সার্থক বা কোন দৃষ্টিভঙ্গি কালের বিচারে অচল। সেখানে গভীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে হয় এক মুখী স্রোতের বদলে প্রবাহের বিপরীতধর্মী আবর্ত।

প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিকের মতো প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যে, আমাদের নবজাগরণের মধ্যে যে দুটি অন্তর্বিরোধের প্রধানধারা তার একটি পশ্চিমী দৃষ্টি বা Westernism এবং প্রাচ্যাভিমান বা Orientalism. রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই দুয়ের ঝঙ্কার-ই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। উনিশ শতকের রুশ দেশের ইতিহাসে ও এরকম অন্তর্দ্বন্দ্ব মাসারিক প্রভৃতির লেখাতে দেখা যায়। অবশ্য অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে যে সুস্পষ্ট বিভাজন রুশদেশে দেখা যায়, এদেশে সেরকম নয়। এখানে এক মানুষের মধ্যেই দুই ঝোঁকের পরিচয় আছে। তাই পশ্চিমী দৃষ্টি বা প্রাচ্যাভিমান এদেশে দুটি পৃথক গোষ্ঠীর নয়, বরং এক অমূর্ত ধারণা যা বিশ্লেষকের কাছে ট্রেন্ড হিসেবে বিচার্য। আবার এই দুই দশার আদর্শগত পার্থক্য বোঝা যায় এদের বৈশিষ্ট্য বিচার করলে।মনে রাখতে হবে ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে এই আদর্শের প্রকাশ সমান প্রবল বা সম্পূর্ণ না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বরং বাংলার ক্ষেত্রে অধ্যাপকের মতে, নবজাগরণে পশ্চিমী ভাবধারার প্রভাব প্রথম দেখা যায় সমাজ সংস্কার পরিকল্পনায়। এর প্রতি প্রাচ্যাভিমানের ঔদাসিন্য ছিল তা নয়, কিন্তু উত্তেজনা বা উৎসাহতে মন ছিল না। নবজাগরণের যুক্তিবাদী মনোভাব পশ্চিমী। তা দিয়েই অবশ্য প্রাচীনকে বর্জনের জন্য শাস্ত্রের সমর্থন খোঁজা হত । রামমোহন, বিদ্যাসাগর ছাড়াও 'ইয়ংবেঙ্গলে' যুক্তিবাদের প্রবল প্রভাব দেখাগেছিল। কিন্তু যুক্তিবাদতো নিরাসক্ত সত্যের সন্ধান কিংবা বুদ্ধির নির্বিশেষ বিচার নয়। যুক্তিবাদ ইতিহাসে পুরনো ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে নতুন আদর্শের অভিযানের পক্ষ নিয়েছে। বাংলার নবজাগরণে পশ্চিমী যুক্তিবাদ আনল বুর্জোয়া তন্ত্রের মানবতা বাদকে, কারণ প্রাচ্য-সমাজে সব মানুষকেই মানুষের মর্যাদা দেবার আগ্রহ নেই।

স্বাভাবিক ভাবেই, প্রাবন্ধিক বলেছেন, এর বিপ্রতীপে গড়ে উঠল প্রাচ্যাভিমান,

যার প্রথম আশ্রয় ও বৈশিষ্ট্য প্রাচীন গৌরব কাহিনি। আর সেই গৌরব গাথা ঘটনাক্রমে হিন্দুসভ্যতার। হিন্দুর সামাজিক ঐতিহ্য পাশ্চাত্য ঝড়ে কাবু হয়নি বিশেষ। ফলত এই দুই মিলে গড়ে উঠল প্রাচ্যাভিমানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য – হিন্দুত্ববোধ। এর সার্থকতার পাশাপাশি দুর্বলতা হল, ভারতবর্ষ একমাত্র হিন্দুদের দেশ নয়। শতধাবিভক্ত হিন্দুসমাজ বা সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজকে এই বোধ বাঁধতে অক্ষম। মানবতাবাদী পশ্চিমী দৃষ্টির দখল এইদিকে। প্রাচ্যাভিমানের তৃতীয় দিক হল ভক্তি-প্রবণতা, তা আবার যুক্তি বাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ বা রামকৃষ্ণের ভক্তিসাধনাকে পশ্চিমী মনদিয়ে শ্রদ্ধা করা যায়, তার মধ্যের ধর্মবোধের যাথার্থ্য হেতু। কিন্তু শতাব্দীর শেষদিকের ভক্তিমার্গ যুক্তি বা মানবতাবাদ থেকে জনমনকে বিক্ষিপ্ত করতেই পারে, যা প্রাচ্যাভিমান পশ্চিমীভাবের প্রতিরোধ কল্পে আশ্রয় করেছিল।

তাই আমরা প্রবন্ধের বক্তব্যে দেখব, বাংলার রেনেসাঁসের এই দুইধারার কোনটিকেই অস্বীকার করা চলেনা। সাহিত্য শিল্পের প্রাচুর্য ও শিক্ষিত সমাজে স্বাদেশিকতার উন্মেষ ও অগ্রগতি রেনেসাঁসের এই দুই প্রভাবের পিছনে এই দুই ধারা ক্রিয়াশীল ছিল। এই দুই ধারার বিকৃত রূপকে এখানে উল্লেখ না করে তাদের আসলরূপকে এখানে মূলত দেখানো হল। ধারণা দুটির বিরোধ অস্বীকার করা যায় না। যদিও বারবার এদের সমন্বয়ের রূপ খোঁজা হয় রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। কিন্তু সমন্বয়ের ফলে উভয়কে ছাপিয়ে যে তৃতীয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটবার কথা তা কোথায় ? আসলে যাকে সমন্বয় বলা হয় তা দুই বিরোধী ঝোঁকের সহাবস্থান মাত্র।

তবু যুক্তিবাদী ঐতিহাসিকের যথার্থ সততা বজায় রেখে প্রাবন্ধিক বলেছেন, ইতিহাসের কাজ বিরোধের সন্ধান পেলে তার কিছুমূল্য বিচারকরা। আর আমাদের বিচারে সামাজিক আদর্শের সংঘাতটাই প্রধান। আমি পশ্চিমী দৃষ্টিকে প্রাচ্যাভিমানের উপড়ে স্থানদিই দুইকারণে। প্রথমত, এই জাগরণের মূল নতুনের আগমনে, প্রাচীন রক্ষণশীলতা তার আদি উৎস নয়। রবীন্দ্রনাথ ও এরকম মনে করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, যে সমাজবাদ আমাদের কাম্যতার সংগতি পশ্চিমী দৃষ্টির মধ্যেই, তাই রেনেসাঁসের অন্তর্বস্তু যে পশ্চিমী তানা বলে উপায় নেই। "... রবীন্দ্র-প্রতিভা সেতুবন্ধন করেছে দুই যুগের মধ্যে" কিভাবে এই সেতুবন্ধন প্রক্রিয়া ঘটেছে দুই যুগের বৈশিষ্ট্যসহ আলোচনা কর।

যুক্তিবাদী তথ্যনিষ্ঠ প্রাবন্ধিক সুশোভন সরকার তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাংলার রেনেসাঁস' প্রবন্ধে কঠোরভাবে কালক্রম অনুসারে রবীন্দ্রসৃষ্টির বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে কিভাবে বাংলার রেনেসাঁস এবং রেনেসাঁস পরবর্তী দুই যুগের মধ্যে সমন্বয়

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ঘটিয়ে নিজ দর্শন প্রকাশে অকুণ্ঠ থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ। অধ্যাপক সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক পুস্তকে প্রথম এই প্রবন্ধ ১৯৬১ -তে প্রকাশিত হয়। পরে এটি প্রাবন্ধিকের 'বাংলার রেনেসাঁস' নামক প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয়।

অধ্যাপক সরকার রবীন্দ্রনাথের ও পরে নবজাগরণ কী ঢেউ তুলেছিল এবং পশ্চিমী প্রত্যয় ও প্রাচ্যাভিমানের প্রভাবে তার লেখা কী সুরে বেজেছিল এবার সরাসরি সে প্রসঙ্গে আসতে গিয়ে,প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের রচনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন অজস্রবার। সে সব উদ্ধৃতি উল্লিখিত হয়েছে ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে এবং তাগৃহীত হয়েছে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রামাণ্য সংস্করণ থেকে, বলে শুরুতেই জানিয়েছেন প্রাবন্ধিক। আমাদের প্রাবন্ধিকের মতে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও কালানুক্রমে মানুষের সৃষ্টিকে দেখবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তারিখের ক্রমে তাঁর রচনা দেখলে তাঁরচিন্তার ক্রমবিকাশ ধরতে পারা সম্ভব; যদিও সংবেদনশীল কবির মনে একই সময়ে বিরোধীভাবের সুর সম্মিলন দেখা যেতে পারে তবুও পর্যাপ্ত সাক্ষ্যের সমাবেশে ভাবধারার স্তরভেদ ও পর্বান্তরের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। সারা জীবনে নবজাগরণকে তিনি যেভাবে তিনি যেভাবে দেখেছেন তা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়, আর নিজের রচনাবলীর অবতরণিকাতে তিনি তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে দেশের নিজেকে খুঁজে পাওয়াতেই রচনার সার্থকতা বলে মনে করেছেন।

অধ্যাপক সরকার দেখিয়েছেন, আদিপর্বে, কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ লেখা বর্জন করেছিলেন, রচনাবলীতে। সে বয়সে নবজাগরণ বিষয়ে তাঁর চিন্তা না হওয়া স্বাভাবিক হলেও, তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডল ও উত্তরাধিকার অনুযায়ী তীব্র পশ্চিমী অনুকরণ বা প্রাচ্যসংস্কার-অনুরাগের প্রাবল্য দুই থেকেই তিনি মুক্ত ছিলেন। সামাজিক নিয়মে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হলে তাকে বর্জন করার সপক্ষে তিনি লিখেছেন, ১৮৮১-তে লেখা 'এক-চোখোসংস্কার' প্রবন্ধে। আবার ১৮৮২-তে কলকাতায় সফি আন্দোলনের প্রভাবে প্রাচ্য প্রত্যয়-ও তাঁর মধ্যে ছিল। ১৮৮২-তে 'মেঘনাদবধ সমালোচনায়' মধুসূদনকে আক্রমণ করেন প্রাচ্য ঐতিহ্যের অপমানের জন্য, ১৮৮৫-তে 'রামমোহনরায়' হিন্দু ধরমের রক্ষা তাঁর প্রধান মহত্ব বলে ভারতের সঙ্গে হিন্দুর একসমীকরণ করেন। সেবছরই 'সমস্যা' প্রবন্ধে 'পরিবার-বিশেষে' বাল্যবিবাহের অবসানও বিধবা বিবাহের প্রবর্তনার কথা বলেন।

নিষ্ঠ গবেষক ড. সরকার দেখিয়েছেন,পরবর্তীতের বছরে (১৮৮৬-১৮৯৮) যুবক রবীন্দ্রনাথের মনে পশ্চিমী প্রভাব বাড়ে। ১৮৮৪তে শশধর তর্কচূড়ামণির আবির্ভাবে নব্যহিন্দুয়ানির মাথাচাড়া দেওয়া রবীন্দ্রনাথের অসহ্য মনে হয়েছিল। সে প্রমাণ তাঁর নানা

প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে। হাস্যকৌতুক-এর 'আর্য ও অনার্য' (১৮৮৬), 'গুরুবাক্য' (১৮৮৭), 'চিঠিপত্র' (১৮৮৭), 'প্রত্নতত্ত্ব' (১৮৯১) ইত্যাদি প্রবন্ধ বা কবিতাতেও এই প্রচলনের প্রতি তাঁর শ্লেষের পরিচয় প্রচুর লক্ষিত হয়। প্রাচ্যভাবের বিকৃতির প্রতি যেমন তেমনি খাঁটি প্রাচ্যাভিমানের পরিবর্তন-বিমুখতার বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথ লেখেন। তাঁর নিদর্শন 'পরিত্যক্ত' (১৮৮২) কবিতায়, 'চিঠিপত্র' (১৮৮৭), 'হিন্দুবিবাহ' (১৮৮৭), 'মুসলমান মহিলা' (১৮৯১), 'প্রাচ্যসমাজ' (১৮৯১), 'কর্মের উমেদার' (১৮৯১), 'আদিম সম্বল' (১৮৯১), 'আচারের অত্যাচার' (১৮৯২), 'সমুদ্রযাত্রা' (১৮৯৩), 'পঞ্চভূতের ডায়েরি' (১৮৯৩), 'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য' (১৮৯৪), ইত্যাদি সমস্ত প্রবন্ধেই মাত্রাতিরিক্ত প্রাচ্যসংস্কার বদ্ধতা যে মানবতার বিকাশের বিরোধী বলেই বর্জনীয় সে বক্তব্য নানাভাবে প্রকাশিত। বাংলার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মনেপ্রাণে পশ্চিমীভাবাপন্ন সে কথা অস্বীকার করা শক্ত। অথচ বহিরঙ্গে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালি। 'বিদ্যাসাগর চরিত' (১৮৯৫) প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের এই বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। একইভাবে 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৮৯৪) প্রবন্ধে রামমোহনের অনুরূপ প্রশংসা তিনি করেছেন। এই সময়ের 'দুই উপমা' (১৮৯৬), বা 'সতী'(১৮৯৭) কবিতায় লোকাচার ও ধর্মের আবদ্ধতাকে আক্রমণ তিনি করেছেন। আবার 'কোট বা চাপকান' (১৯৯৮), 'অযোগ্য ভক্তি' (১৯৯৮), প্রবন্ধেও ধর্মের ভেদাভেদকে তিনি যুক্তিবুদ্ধিহীনতার লক্ষণ হিসেবেই দেখিয়েছেন।

প্রাবন্ধিকের মতে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যাকে পশ্চিমী দৃষ্টি বলা হচ্ছে তার সুর যদিও প্রাচীন প্রাচ্য ঐতিহ্যে পাওয়া যায়, তবুও এ কথা মনে রাখা দরকার যে উনিশ শতকে আসা প্রচলিত সংস্কারবিরোধী ভাবনা এসেছিল পাশ্চাত্য থেকে, দেশাভিমান থেকে নয়। প্রাচ্যপ্রীতির এ সময়ের ঝোঁক ছিল যুক্তি দিয়ে বিচারমাত্র না করে প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকা, যুগপ্রবর্তক রামমোহন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের প্রবক্তা। সমন্বয়সাধনের থেকেও এ ছিল তাঁর বড় অবদান।

ইতিহাসের অনুসরণে আমরা দেখি, ইতিমধ্যে দেশে চরমপন্থার হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথের ১৮৯৮ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত লেখায় সেই প্রভাবের প্রাবল্য দেখা যায়। জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতিতে চরমপন্থী আন্দোলনের দান অসামান্য হলেও তাতে যে অন্তর্বিরোধ ছিল সে কথা অনস্বীকার্য। আন্দোলনের পিছুটান সাময়িক সাফল্য দিলেও পরে তা আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। স্বদেশী যুগ যার সুচনা ১৯০৫ -এর কিছু আগেই, তার মধ্যে প্রাচ্যাভিমানের বিরাট উত্তাপ ছিল। সেটা তখনকার মতো আন্দোলনের চালিকাশক্তি হলেও পরে সেটাই আন্দোলনের দুর্বলতা

টিপ্পনী

হিসেবে নিজের প্রাপ্য আদায় করে নেয়।এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনের অশান্তি আন্দোলনের শুরুতেই দেখা যায়। আত্মশক্তির আবাহনের কথা তাঁর সব পর্যায়ের লেখাতেই রয়েছে। আন্তরিক অনুভূতি থেকে ছিল তাঁর বিশ্বাসের দিকে যাত্রা। তাই হিন্দুদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য রাজনৈতিকভাবে উপস্থিত না থাকলেও তারা যে জাতিবদ্ধ সে উল্লেখ তাঁর ১৮৯৮ তে লেখা প্রসঙ্গ কথাতে পাওয়া যায়।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা দেখি, ১৯০১-এ 'নৈবেদ্য'-তে 'তুচ্ছ আচার' ও 'নিরর্থ আচার'-এর প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু সেই একই বছরে লেখা 'ব্যাধি ও প্রতিকার'-এ তিনি পাশ্চাত্যমন্ত্র গ্রহণের বদলে চিরন্তন ভারতীয় আদর্শ গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছেন। যদিও আসল সমস্যা এখানেই। যুগোপযোগী হতে গেলে বোধহয় চিরন্তন আদর্শের দারস্থ হওয়ার থেকে নতুন আদর্শের দেশোপযোগী রূপান্তর শ্রেয়স্কর।১৯০১-এ লেখা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা'য় তিনি হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর থেকেই জাগিয়ে তুলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও তার মধ্যে নেশন গঠনের প্রাধান্য যে নেই-ই সে কথাও বলেন। ১৯০১-এ অন্যান্য লেখাতেও প্রাচ্য প্রত্যয়, 'সমাজভেদ'-এ বিধবাবিবাহ ও বাল্যবিবাহের পক্ষে মত দিলেন। 'বিরোধমূলক আদর্শ'-তে নেশনের বিপক্ষে ও সমাজগঠনের পক্ষে কথা বললেন। 'ভারতবর্ষীয় সমাজ'-এ হিন্দু সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সমাজের অবস্থানের পক্ষেই বলেন। ওই একই বছরে 'নেশন কি' প্রবন্ধে অতীত ও বর্তমানের গুরুত্ব প্রসঙ্গে ধরিয়ে দিয়ে তার ভবিষ্যৎচিন্তা না থাকার কথা জানালেন।

১৯০২-তে রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্যাভিমান প্রবলতর হয়ে উঠল, 'নববর্ষ' প্রবন্ধে সেই সনাতন ভারতের জয়গান গাইলেন। 'বারোয়ারি মঙ্গল'-এ বলে দিলেন পাশ্চাত্যের অর্থনীতি ভারতের জন্য নয়। 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে ভারতের বর্ণাশ্রমের সমাজভেদের সপক্ষে যুক্তি দিলেন। ওই বছরেই 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে মুসলমান স্থাপত্যকে ভারতের ইতিহাস বলার অপ্রাসঙ্গিকতার কথা বললেন তিনি। আবার 'অত্যুক্তি'-তে বললেন বিলিতি সভ্যতার হাতে নিজেদের সমর্পণের চমক ভাঙবার সময় সমাগত।' মহর্ষির জন্মোৎসব'(১৯০৪) প্রবন্ধে এদেশের ধর্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ঔচিত্যের কথা বললেন, আর 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধে সতীদাহে আত্মোৎসর্গ করা পিতামহীকে প্রণাম জানালেন। ১৯০৪-এ লেখা 'স্বদেশী সমাজ'-এর আত্মশক্তির আবাহনের প্রসঙ্গ আমাদের ইতিহাসে উজ্জ্বল হলেও আমরা এখন দেখব এখানেও স্টেট থেকে সমাজকে পৃথক করবার কথা বলা হয়েছে। হিন্দু সমাজের গঠন সংরক্ষণের পক্ষে বলা হয়েছে। একমাস পরে লেখা 'স্বদেশী সমাজের পরিশিষ্ট' -তে বিদেশী আইনের সাহায্যে এদেশীয় ধর্মীয় আচারে হস্তক্ষেপের জোরালো

বিরোধীতা করা হয়েছে।

আমাদের পাঠ্য প্রবন্ধের অনুসরণে আমরা পাব, রবীন্দ্রনাথের ১৯০৫-এ লেখা 'সফলতার সদুপায়'-তে দেশীয় ঐক্য গঠনের পরমুহূর্ত থেকে বিদেশী শাসনের অপ্রয়োজনের কথা আর এই ঐক্য ধর্মাশ্রয়ী জাতির ঐক্য কারণ, ওই বছরেই লেখা 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে দেশশাসনের কর্তৃসভার অধিনায়ক একজন হিন্দু ও একজন মুসলিম হবেন বলা হয়েছে। যদিও তাতে দেশ হয়ে ওঠে ধর্মসমাজের ফেডারেশন। এই বছরেই লেখা 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধেও বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পায়। এই সময়ে বাংলাদেশে যে আলোড়ন উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার সামনের সারির অভিযাত্রী। 'বিজয়া সম্মিলনে' তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত যুদ্ধযাত্রার আহ্বান জানান। কিন্তু এই প্রবল ভাবাবেগের আগের সময়ে যে তাঁর মধ্যেও প্রাচ্যাভিমানের আতিশয্য ছিল তার প্রমাণ আগের প্রবন্ধগুলির উল্লেখে।

এবার প্রাবন্ধিক দেখাচ্ছেন, ১৯০৭ থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখায় একটা মোড় ফিরবার নিদর্শন পাওয়া যাবে। এর পরের দশবছরের প্রবল রচনাস্রোতে পরিণত রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যাবে। তখন তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছে যে নতুন ভারতবর্ষের স্বপ্ন তাকে আমাদের বিশ্লেষণে পশ্চিমী দৃষ্টি আখ্যা দেওয়া যায়।'গীতাঞ্জলি'র তিনটি সুপরিচিত কবিতায় এই সুর যেগুলো ১৯১০ সালে পরপর তিনদিনে লেখা। ১৯০৬-তে লেখা 'রাজভক্তি' প্রবন্ধে এর পূর্বাভাস, যেখানে নতুন ভারতের প্রতীক্ষা, অতীতের আবাহন নয়।

স্বদেশী আন্দোলন থেকে রবীন্দ্রনাথের অপসারণের অন্যতম ঝোঁক প্রাচ্যাভিমান থেকে পশ্চিমী দৃষ্টির দিকে প্রত্যাবর্তন। স্বদেশী আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রতি হয়তো তিনি অবিচার করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাজ পোলিটিকাল অভিযান নয়, তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র ভাবনা ও আদর্শে। স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামে তিনি উদাসীন ছিলেন না তার প্রমাণ পাবনা কনফারেন্সে অভিভাষণ (১৯০৮), কংগ্রেসের প্রকাশ্য বক্তৃতা (১৯১৭), নাইটহুড ত্যাগ (১৯১৯), হিজলী বন্দী-হত্যার প্রতিবাদ (১৯১৩) ইত্যাদি। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল অভ্যুদয়ের মুহূর্তের পর তাঁর মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে পোলিটিকাল এজিটেশন তাঁর কর্মক্ষেত্র নয়। সেইসঙ্গে প্রাচ্যাভিমানের সীমাবদ্ধতার পীড়ায় কাতর হয়ে তিনি মুক্তি খোঁজেন পশ্চিমী দৃষ্টির আলোকে।

মুক্তির পরিচয় নিয়ে এল 'গোরা'(১৯০৭-১৯০৯)। সমসাময়িক ঘাতপ্রতিঘাতকে সাহিত্যসৃষ্টিতে চিত্রিত করবার অতুলনীয় নিদর্শন এর পাতায় পাতায়। 'গোরা'র বক্তব্যে যারা সহমত তাদেরও প্রশ্ন কার্যত আজকের দিনেও তারা এগুলো মেনে চলেন কি না? ভাল

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বলে স্বীকার করেও সামাজিকভাবে তা পালনে অস্বীকৃত হওয়ার এদেশি প্রথার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'শিক্ষাবিধি' (১৯১২) -তে। উপন্যাসের নায়ক প্রাচ্যাভিমানী হয়েও এদেশের দুর্বলতাকে আবিষ্কার করেছে ও উপন্যাসের শেষে ধর্মের উর্দ্ধে ভারতবর্ষীয় হিসেবে নিজের পরিচয় খুঁজে পেয়েছে। ১৯০৮-এ 'পূর্ব ও পশ্চিম' এরই প্রতিধ্বনি করেছে। ভারতের ইতিহাস যে হিন্দুর ইতিহাস নয় এবং মনুষ্যত্বের ওপর দাঁড়িয়ে রামমোহনের সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ভারতকে মেলানোর চেষ্টাকে তিনি পূর্ণ উপলব্ধি করেছেন। বাংলাদেশে পশ্চিমী হাওয়াকে স্বীকার করে নিলেন 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে। মধুসূদনের ভাবের মধ্যে পশ্চিমী ভাবের প্রভাবজনিত বিদ্রোহের কথাও তিনি বললেন। ১৯০৭-এ 'বাস্তব' প্রবন্ধে হিন্দুত্বের প্রতি কিছু বক্রোক্তি, আর ১৯০৮-এ 'পাবনা অভিভাষণ'-এ মুসলমানদের সমস্ত প্রাপ্য সমান করে বন্টনের প্রতি তিনি দৃষ্টি দিতে বলেছেন। 'সমস্যা' প্রবন্ধেও স্পষ্টত সমস্ত ধর্ম মিলে একটি জাতি গড়ে না তুললে দেশের স্বাধীনতা আসবে না সেকথা বলেছেন। 'সদুপায়' প্রবন্ধে প্রয়োজনের খাতিরে মুসলমানদের ভাই ডাকার অন্তঃসারশূন্যতার কথা বলেছেন। আদর্শ ও আচরণের ফারাকের কথাও বলেছেন এখানে। তিনি এও বিশ্লেষণ করে দেন যে জনসংযোগের গোঁড়া পাশ্চাত্য আদর্শে। দেশীয় উপায়ে যা হচ্ছিল তাতে সমষ্টির মোটেই নয়, অল্প ক্ষেত্রে ব্যক্তির উন্নতির পথ গড়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্য জনসংযোগ অতীত হিন্দু গৌরবের মধ্যে ঘুরে মরবার বদলে যুক্তির পথে সব মানুষের অধিকারের কথা বলে।

অধ্যাপক সরকার এর পরে দেখাচ্ছেন, 'গোরা'র পরে 'অচলায়তন'(১৯১১) প্রতিষ্ঠিত আচার-সংস্কারের ওপরে প্রত্যক্ষ আক্রমণ। পরিণত আত্মস্থ রবীন্দ্রনাথ শুধু রূপকে নয় প্রবন্ধেও স্পষ্ট প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, যা আমরা পাই,'ধর্মের অধিকার'(১৯১২), 'ধর্মশিক্ষা' (১৯১২) ইত্যাদি প্রবন্ধে। এই ১৯১২-তেই রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে ব্রাহ্মকে হিন্দুধর্মের সংস্কৃতরূপ বলেছেন। একই বছরে 'যাত্রার-পূর্ব-পত্র' প্রবন্ধে ইউরোপাগত আদর্শকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আবার 'ইংলন্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রী'তে বলেছেন গতি বা প্রাণশক্তি ইউরোপকে রক্ষা করে চলেছে। আমাদের সমাজে মনুষ্যত্বের পীড়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' প্রবন্ধে।১৯১৪-তে 'বলাকা' এল তার গতির বন্দনা নিয়ে। তাতে থাকলো এগিয়ে চলার ডাক-ও। কবিতা থেকে 'লোকহিত' প্রবন্ধে এসে আমরা দেখব অন্তরে যাকে ভাই বলে মানতে পারিনি রাজনীতির প্রয়োজনে তাকে ভাই বলার ভান যে কাজের কথা নয় সে বিষয় তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন। ১৯১৫-১৬ তে 'ঘরে বাইরে' তেও তিনি এই আচরণ ও আদর্শের অসাম্য নিয়ে বলছেন। বলছেন স্ত্রী

জাতি ও মুসলমান ধর্মের মানুষের মানুষের অধিকারের কথা।

প্রাবন্ধিকের বক্তব্য, প্রাচ্যাভিমানী হয়তো বলবেন উপরিউক্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের অনেক কথাই তারাও বলে থাকেন। সে কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় প্রাচ্যাভিমানের সেদিনের ঝোঁক হোক বা আজকের, তার সঙ্গে এ সমস্ত কথার সুরের বিরোধ অগ্রাহ্য করা ন্যায়সংগতভাবে অসম্ভব।জাগরন একটি প্রক্রিয়া বলে কোনও না কোনও সময়ে তাতে ছেদ টানতে হবে। ইউরোপের রেনেসাঁসের প্রভাব আজ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকলেও আমরা ষোল-সতের শতকে তার সীমা নির্দেশ করে থাকি। বাংলার রেনেসাঁসকেও তেমনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিধৃত বলা যায়। রামমোহনে শুরু হয়ে পরবর্তী একশো বছরে তার বিস্তার। তার পরেও শতাব্দীর অর্ধেক জুড়ে রবীন্দ্রনাথের লেখার উৎসার ঘটেছে। দুই যুগের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছেন তিনি। যদিও 'বলাকা', ;ঘরে বাইরে'র দৃষ্টির থেকে আর মুখ ফেরাননি তিনি। শেষ পর্বের সূচনা করেছিল 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৯১৭)। সেখানে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার, যুক্তির সঙ্গে সংস্কারের একটা বোঝাপড়া যে এদেশের সর্বত্র একটা বৈপরীত্যের সহাবস্থান ঘটিয়ে চলেছে সে কথা বলেছেন। 'রাশিয়ার চিঠি'(১৯৩০)-তে নতুন দেশ আবিষ্কারের আনন্দ, 'কালান্তর'(১৯৩০)-এ পাশ্চাত্য যুক্তিবোধের পাশে এদেশীয় শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশের সহাবস্থানের প্রসঙ্গ আবার। শেষ পর্যন্ত 'সভ্যতার সংকট'-এ রবীন্দ্রনাথ আক্রমণ করলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনে পশ্চিমী দৃষ্টির বিকৃতরূপটাকে, তার অতীত ব্রিটিশ শাসনের গৌরবে আস্থাকে। আর তাই রাশিয়া ও জাপানের নবীন উন্নতির সঙ্গে তুলনা করলেন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের দুরবস্থাকে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনেও পশ্চিমী দৃষ্টির প্রতি আস্থা রইল অটল। তিনি প্রগতিশীল যে তার প্রমাণ তাঁর পশ্চাৎগমন না ঘটা। পরিণত জীবনের শেষার্ধেরও বেশি জুড়ে থাকলো ভবিষ্যতের উপযোগী পশ্চিমী আদর্শের প্রতি আন্তরিক প্রীতি। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে রবীন্দ্ররচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রমানসের পথ এইভাবে প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করেছেন ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার।

শব্দের পবিত্র শিখা : শঙ্খ ঘোষ

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মিতবাক সংযমী কবি শঙ্খ ঘোষের জন্ম ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২২ শে মাঘ (ইং ১৯৩২, ৫ ফেব্রুয়ারি)। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরে তাঁর মামার বাড়িতে তাঁর জন্ম হয়। পৈতৃক বাসস্থান বরিশাল জেলার বাপারিপাড়া। তাঁর মাতা অমলাবালা ঘোষ এবং পিতা মণীন্দ্রকুমার ঘোষ।

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

টিপ্পনী

তাঁর শৈশবশিক্ষার শুরু বাড়িতেই, পরে পাকশি চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ ভ্রতি হন ১৯৪৩ সালে, ষষ্ঠ শ্রেণীতে। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাঁর পিতা। এখানে দশম শ্রেণীতে পড়বার সময়ে ১৯৪৬ সালে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের আদ্যভারতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৭ -এ চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঁচটি বিষয়ে লেটার নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি বৃত্তি পেয়েছিলেন।

এরপরে তিনি কলকাতায় পড়াশোনা করেন। ১৯৪৯ -এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং ১৯৫১ সালে এই কলেজ থেকেই বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়বার সময়ে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (জুলাই, ১৯৫৩) তাঁর 'দিনগুলি রাতগুলি' কবিতা প্রকাশিত হয়। এর পরের বছর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে প্রথম হয়ে এম.এ তে উত্তীর্ণ হন।

প্রথাগত পড়াশোনার পর ১৯৫৫ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর বঙ্গবাসী কলেজে লিভ ভ্যাকান্সিতে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। এরপরে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর কলেজ, বহরমপুর গার্লস কলেজ হয়ে ১৯৫৭-এর ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার সিটি কলেজে যোগ দেন। ইতিমধ্যে ১৯৫৬-এর ফাল্গুন মাসে সহপাঠিনী প্রতিমা বিশ্বাসের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তিনি। এস. রায় এন্ড কোং থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি'। সেই সময়ের শঙ্খ ঘোষ সম্বন্ধে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পরে লিখেছেন -

> ' সেই সময়, শঙ্খ ঘোষই ছিলেন সবচেয়ে আলোচিত এবং প্রশংসিত তরুণ কবি। পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি কবিতা দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল ...
>
> সিটি কলেজে তখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতন লেখক এবং জীবনানন্দ দাশ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে মস্করা করতেন, কিন্তু তিনি শঙ্খ ঘোষের কবিতা আমাদের পড়তে বলেছিলেন। '

অধ্যাপনা সূত্রে সিটি কলেজের পরে শঙ্খ ঘোষ পড়িয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ১৯৬৫ -এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৯২-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এগারোটি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ – 'দিনগুলি রাতগুলি' (১৯৫৬), 'নিহিত পাতালছায়া' (১৯৬৭), 'আদিম লতাগুল্মময়'(১৯৭২), 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়'(১৯৭৪), 'বাবরের প্রারথনা'(১৯৭৬), 'তুমি তো তেমন গৌরী নও'(১৯৭৮),

'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'(১৯৮০), প্রহরজোড়া ত্রিতাল'(১৯৮২), 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'(১৯৮৪), 'বন্ধুরা মাতি তরজায়'(১৯৯৪), 'ধূম লেগেছে হৃৎকমলে'(১৯৮৭)। এই সময়ে তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধগ্রন্থ-ও প্রকাশিত হয়, 'কালের মাত্রা ও রবিন্দ্রনাটক'(১৯৬৯), 'নিঃশব্দের তর্জনী'(১৯৭১), 'ছন্দের বারান্দা'(১৯৭১), 'শব্দ নিয়ে খেলা'(১৯৮০), 'এ আমির আবরণ'(১৯৮০), 'উর্বশীর হাসি'(১৯৮১), 'শব্দ আর সত্য,(১৯৮২), 'নির্মাণ আর সৃষ্টি'(১৯৮২), 'কল্পনার হিস্টিরিয়া'(১৯৮৪), 'জার্নাল'(১৯৮৫), 'ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম'(১৯৮৬), 'কবিতার মুহূর্ত'(১৯৮৭), 'কবিতালেখা কবিতাপ্রা'(১৯৮৯), 'ঐতিহ্যের বিস্তার'(১৯৮৯)।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর পাশাপাশি শঙ্খ ঘোষ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং ফেলো হন ১৯৭৮ -এ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রাইটার ইন রেসিডেন্স হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮৪-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর। সিমলার ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডিতে পোয়েট ইন রেসিডেন্স হয়ে থেকেছেন ১৯৮৭-৮৮। 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৭৭-এ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান নরসিংহ দাস পুরস্কার। 'বাবরের প্রার্থনা' কব্যগ্রন্থের জন্য পান অকাদেমি পুরস্কার ১৯৭৭-এ। ১৮৮৯-এ 'ধূম লেগেছে হৃৎকমলে' কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান। বিশ্বভারতীতে তিনি রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষরূপে কাজ করেছেন জুন ১৮৮৯-মে ১৯৯০। সারাজীবনে পেয়েছেন অনেক সম্মাননা – সরস্বতী সম্মাননা (১৯৯৮), দেশিকোত্তম(১৯৯৯), পদ্মভূষণ(২০১১), জ্ঞানপীঠ(২০১৬)। স্বভাবত নির্জনচারী শঙ্খ ঘোষকে নিয়ে কথা হয় অনেক বেশি। তিনি প্রতিষ্ঠানবিমুখ, কিন্তু নানা প্রতিধ্বনি তাঁকে ঘিরে থাকে। প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে তাঁর অনীহা সত্ত্বেও তিনি নিজেই এক প্রতিষ্ঠান। প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী খরশান, 'জলই পাষাণ হয়ে আছে'(২০০৪), 'সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি'(২০০৭), 'মাটিখোঁড়া পুরোনো করোটি'(২০০৯), 'গোটা দেশজোড়া জউঘর'(২০১০), 'হাসিখুসিমুখে সর্বনাশ'(২০১১), 'শুনি শুধু নীরব চিৎকার'(২০১৬) প্রভৃতি কাব্যে গুজরাট কাণ্ড, নন্দীগ্রামে পুলিশের নির্বিচার হত্যা, পরবর্তি নতুন শাসকের খেয়ালখুশির বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ উচ্চকিত হয়ে ওঠে। শুধু কবিতাতেই নয়, 'কবির বউ'(১৯৯৮), 'ঈশারা অবিরত'(১৯৯৯), 'অবিশ্বাসের বাস্তব'(২০০৩), 'ভিন্নরুচির অধিকার'(২০০৯) প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থে নিজের লেখার মধ্যে দিয়ে তিনি সমসময়ের সব রক্তক্ষত নিয়ে যাত্রা করেন মহাসময়ের দিকে। রবীন্দ্রনাথের দেবমূর্তি যেমন তাঁর কাছে অচল মনে হয়, অন্য দিকে সারাজীবন তিনি পরম মমতায় আঁকড়ে ধরতে চান রবীন্দ্রনাথেরই হাত। স্বভাবসংযমের বাইরে গিয়ে মরিচঝাঁপি, বরানগর,

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

আরোয়াল, জেহানাদাবাদ, মণিপুর, লালগড়ের মৃত্যুমিছিলে তাঁর স্বর বিদ্যুৎপ্রভার মতো ঝলসে ওঠে। তিনি হয়ে ওঠেন অসুখ সময়ের আশ্রয়।

সংক্ষিপ্তসার-

টিপ্পনী

কবি কীটস নিজপ্রিয়ার বর্ণনার জন্য চেয়েছিলেন উজ্জ্বলের থেকেও উজ্জ্বলতর বা সুন্দরের থেকেও সুন্দরতর শব্দ। শুদ্ধ আবেগের প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শুদ্ধ শব্দ মেলা ভার। কারণ যে শব্দ সকলের তা তো বহু ব্যবহারে জীর্ণ, এমনকি জীর্ণ এ নিয়ে জীবনানন্দের মতো কবির আক্ষেপও। কবি আসলে চান শব্দের মধ্যে পুরে দিতে তাঁর সমস্ত অস্তিত্বকে। কিন্তু সে শব্দ মেলে না। শব্দের সঙ্গে তাই কীটসের মতো সংগ্রাম কবিমাত্রেরই জীবনেতিহাস।

'উজ্জ্বল' ঠিক কি করে পাঠকের বুকে 'উজ্জ্বলতার' আঘাত তৈরি করবে সেই হল কবির অনুসন্ধান। এই জন্যই খুঁজে নিতে হয় উপযুক্ত শব্দ। অথচ শব্দ খুঁজে বের করার কথা এক অর্থে অর্থহীন। কী তাৎপর্য এই শব্দ খুঁজে নেবার। পুরনো শব্দের বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে ওঠাকে ছুঁড়ে ফেলে শব্দভাণ্ডারের প্রসার বাড়িয়ে তোলাই কি এর মূল কথা ? নতুন শব্দের ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়েই প্রশ্ন করা যায় যে নতুন শব্দের ব্যবহার কতজন বড় কবির সাফল্যের চাবিকাঠি ?

নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টি কবির অভিপ্রায়। মধুসূদনের মতো পরিশ্রমী শব্দচয়ন কবিতাকে একটা স্বতন্ত্র চেহারা দিলেও এই অভ্যাস তৈরি করতে পারে ম্যানারিজম – যা কবিকে কবিতায় আরও একবার নিজেকে প্রতিফলিত করবার বদলে এক জড় অভ্যাসের অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারে।

শব্দের নতুন সৃষ্টি-ই তাই আসল কথা। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব ? তখন আশ্রয় নিতে হয় লৌকিক বা মৌখিক ভাষার কাছে। আলাদা করে কবিতার শব্দ বলে কিছু হয় না, সমস্ত প্রচলিত শব্দ-ই কবিতার শব্দ। এ ও পুরনো কথা। দেড়শ বছর আগে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বা পরে হুইটম্যান, আর্নো হোলৎসের, অথবা তিরিশ বছর আগে, বা আজকের বীট কবিরা, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ওই একই রকম ভাবছেন। সাম্প্রতিক আলোচনায় এলিজাবেথ জেনিংসও জানিয়েছেন এই একই কথা। যদিও এসব যুগ আর নামের মধ্যে অনেক ব্যবধান, তবু সবাই একই জায়গায় মিলে যান কেমন করে? ঠিক মিলও একে বলা যায় কি? কারণ মৌখিক ভাষা সম্বন্ধে সবার অভিজ্ঞতা এক নয়, সময়ের সঙ্গে তার স্তরানুক্রমণও ঘটে যায়। মৌখিক ভাষা সচলতায় তার পরিবর্তমান পথে প্রবাহিত হয়, আর নানা জন

তাদের প্রয়োজনের অঞ্জলি সেখান থেকে ভরে নেন। সে ভরে নেওয়া জল কোথাও টলটলে, কোথাও উদ্ভিদের শবে ভরা কোথাও ঘুলিয়ে ওঠা পাঁক।

আসলে অভিজ্ঞতা ধারণা ও প্রেরণার তফাৎ আর ওই ভাষার ক্রমিক স্তরাবরোহণের ফলে এক-একটা সময়ে কবিতার জগতে বড়রকমের চাঞ্চল্য তৈরি হয়। বোঝা যায় কবিরা এখানে নতুন শব্দ ব্যবহারের দুঃসাহসী ব্রত নিয়েই এলেন, পূর্বতম জড়তাকে মোচনের এই উপায় তারা গ্রহণ করেছেন। তিরিশ বছর আগে ভার্জিনিয়া উলফ এক তরুণ কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন এই পদ্ধতির শেষ কোথায়? এর লক্ষ্য কি? আঘাত? রুচিতে আঘাত? সংস্কারে আঘাত? কিন্তু আঘাতের পরেও কি কবিতার দিক থেকে কিছু প্রাপ্তি থাকে? পরিচিত শব্দের অস্থানিক ব্যবহারে কি কবিতার যোগ্যতা বাড়ে? পাঠকের প্রতি এই আঘাতের শেষ লক্ষ্যই বা কি?

এমন নয় যে শব্দের বিরুদ্ধে আপত্তি নীতি বা রুচির দিক থেকে। উদাহরণযোগে প্রমাণ করা যায় যে শব্দের ক্ষেত্রে মহাকবিরা কোনও জাতি বিচার করেন না, নীতির প্রশ্ন ওখানে অবান্তর। রিচার্ডসের অনুসরণে বলা যায় শব্দের কোনও ভালোমন্দ নেই, ভালোমন্দ আছে শব্দ ব্যবহারের। অলোকরঞ্জন যদি 'শব্দের পবিত্র শিখা নিয়ে ঐ অপব্যবহার' বলে আক্ষেপ করে ওঠেন তবে মনে রাখতে হবে ঐ শিখাটাই পবিত্র, কথাটা 'পবিত্র শব্দের শিখা' নয়। শব্দের জ্বলে ওঠা ওপর শব্দের সমবায় সংঘর্ষে। আগুনের মতোই কবিতার মধ্যে সমিধ হিসেবে যে শব্দই আসুক না কেন তা পবিত্রতা অর্জন করবে।

শব্দকে কবিতার আগুনে সমর্পিত হতে হয়, কবিতা ছাপিয়ে শব্দের মাথা জেগে উঠলে কবির চেয়ে কবির উপাদান বড় হয়ে ওঠে। প্রথম পাঠেই বড় কবির রচনায় তার ছন্দ বা শব্দ বা প্রতিমাকে চোখে পড়ে না। এ সমস্ত এমন মিলে থাকে যে আলাদা করে প্রধান না হয়ে কেবল সমগ্রের স্বাদ হয়ে ওঠে। শব্দ আপত্তিকর হয়ে ওঠে তার স্বয়ম্প্রকট অস্তিত্বের জন্য। শব্দকে অবশ্যই সমগ্রের অংশ হতে হবে, আলাদা করে চমক হয়ে উঠলে তার চলবে না।

রক্তবীজের মতো শব্দ নিত্য বেড়ে যায় না। শব্দের নতুন ব্যবহারের জন্য এর অনায়াস পারম্পর্য ভেঙে ফেলা দরকার। প্রত্যেক যুগের একটা নির্দিষ্ট কবিতার ভাষা গড়ে ওঠে। অনুসারী কবিরা জেনে অথবা অজান্তে সেই ভাষার অনুকরণ করতে থাকেন। এলিয়ট বলেছিলেন খারাপ কবি তিনি যিনি জানেন না কোথায় সচেতনের ওপর আর কোথায় অবচেতনের ওপর ভর করতে হবে তাঁকে। অন্তত প্রকাশের সময়ে কবিকে জানতে হয় তাঁর পূর্বসূরী আর সমকালীনদের সিদ্ধির কথা। তৎসাময়িক বাঁধিবুলির ধরণ বুঝে সেগুলো

টিপ্পনী

ভাঙতে জানতে হয়। যাতে একই শব্দ দিয়ে ভিন্ন অনুভবের প্রকাশ ঘটানো সম্ভব হয়। একটি বাক্য বা বাক্যখণ্ডের শব্দ সাজানোর মধ্যে থেকে যায় এই ভাঙাগড়ার উপায়। শব্দ মধ্যবর্তী সেই অংশে উপযুক্ত আঘাত করতে জানা জরুরি।

টিপ্পনী

এই কারণেই কবিতার ভাষায় দেখা যায় অন্বয়গত বিপর্যাস। বক্তব্যগত দার্শনিকতায় এই অন্বয়গত বিপর্যাসের মূল প্রেরণা হলেও, শব্দকে নবীনতায় টেনে নেওয়াও এর অন্যতম অভিপ্রায়। এটাও একটা অভ্যাস বলে এর মধ্যে বিপদের সংকেত আছে। যেমন বিষ্ণু দের কিছু ম্যানারিজম মধ্যবর্তী পর্যায়ে তাঁকে শৃঙ্খলিত করে আনছিল, আর সাম্প্রতিক রচনায় যে তিনি তাঁর থেকে মুক্তির জন্য উৎসুক তা ঐ পুরনো ভয়কেই বাড়িয়ে দেয়। কেবল অন্বয় নয়, একই চেতনা থেকে চোখের অভ্যাস ভেঙে কবি একটি নতুন গড়ন তৈরি করতে চান যার মধ্যে শব্দ নতুন প্রাণ খুঁজে পায়। ডিলান টমাসের বরফি কবিতা, সত্যেন্দ্রনাথের রচনা, কামিংসের ভাঙা ভাঙা উলটোপালটা শব্দব্যূহ রচনাতে চোখের সঙ্গেই যুদ্ধ। আধুনিককালে কবিতা যখন দৃশ্য মাধ্যমে পড়া হয়, তখন তার দৃশ্যগুণের কথাও ভাবতে হয়। শ্রুতিতে দৃশ্যে একটা সংযোগ চাই শব্দগুলোর মধ্যে। শব্দের বর্ণেরও রূপ আছে, সিটওয়েল বর্ণে এক একটা রং বা স্পর্শের আভাস পান, যাঁবো স্বরবর্ণের রং লিখে রাখেন। যদি বর্ণের রূপরং থাকে তবে শব্দের ও শব্দের পরম্পরার নিশ্চয় আরও কিছু আছে। কবিতা একটি প্রকৃতিগঠন অর্জন করে আর কবি তাকে ভেঙে ভেঙে নিত্য নতুন গড়ন বানান। কামিংসের স্বেচ্ছাচারের মধ্যেও শব্দগুলি নৃত্যপর সজীবতা পায়। কিন্তু সজিব কতদিন বা কতক্ষণের জন্য? এই ব্যবহারভঙ্গিও কি এক অচল ম্যানারিজমে পৌঁছবে না? এখানে কবির তৃতীয় ম্যানারিজমের সুত্রপাত।

বস্তুত এই সব পর্যায়ের শব্দ বা শব্দপরম্পরার ওপরে কবির আক্রমণ নিতান্ত তার বাইরের অবয়বে। কিন্তু ভিতরের আক্রমণ ছাড়া কি শব্দের নতুন দ্যোতনা সম্ভব অথবা কিভাবে এই ভিতরের আক্রমণ সম্ভব? বলেছিলাম, দুই শব্দের সংযোগবিন্দুর ওপর আক্রমণটাই সবচেয়ে জরুরি। কিন্তু কোথায় সেই সংযোগবিন্দু? সেই বিন্দু যেখানে আঘাত করে শব্দের মৃত বাঁধন খুলে দিতে হয় তা তো অদৃশ্য। অদৃশ্যে গিয়েই তার সঙ্গে লড়তে হয়।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

120

প্রথম প্রশ্ন এই যে শব্দকে ধরে রাখে কে? কবিতা হোক বা গদ্য শব্দকে ধরে রাখে তার ছন্দস্পন্দ। ছন্দ অদৃশ্য কিন্তু শ্রুতিগোচর। ছন্দের প্রবাহের মধ্যে ভেসে থাকা শব্দের দ্বারা পদ্যপঙক্তি পাওয়া যায় কিন্তু সুগঠিত ব্যক্তিত্ব পাওয়া যায় না। তাই কবিতার ইতিহাসে শব্দের চেতনাগত বিদ্রোহের সঙ্গে দেখা যায় এক ছান্দসিক বিদ্রোহ। বস্তুত শব্দের

আলোড়ন আর ছন্দের আলোড়ন একই সূত্রে বাঁধা। মধুসূদনকেও তাই ছন্দ ভাঙতে হয়েছিল শব্দকে প্রাণ দেবার জন্যই। যে শব্দ-প্রকটতা তাঁর ম্যানারিজম তাও এসেছিল অমিত্রাক্ষরের প্রেরণায়। চোদ্দ মাত্রার সুবিন্যস্ত লাইন ভেঙে কথার স্রোত স্বাধীনমতে এগিয়ে আসাতে শব্দগুলি অনেকদিন পরে কিছু জায়গা পেল। আভিধানিক অর্থে রঙ্গলালের শব্দসম্পদ দ্বারাও নতুন কবিতা রচিত হতে পারতো যদি তাদের তিনি পুরনো পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ না রাখতেন। কেবল মধুসূদন নয় বাংলা কবিতায় ক্রমিক ছন্দোমুক্তির সাধনা আমরা দেখেছি আরও একশো বছর। রবীন্দ্রনাথকে যে পৌঁছতে হল গদ্যকবিতা পর্যন্ত তার একটা বড় কারণ নিজের অভ্যাসের গণ্ডি থেকে মুক্তি পাওয়া। গদ্যকবিতায় তাঁর যা বক্তব্য তাকে অন্য ছন্দোস্পন্দে ধরিয়ে দেওয়া যেতেই পারতো। এই পরীক্ষাকালের পরেই শুরু হল 'প্রান্তিক' ও তার পরবর্তী কবিতার দিকে নতুন শক্তিসহ যাত্রা। কিন্তু ছন্দোমুক্তিরও তো শেষ আছে। ছন্দকে বাইরের অর্থে ভাবলে তার শেষ নিশ্চয় আছে। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় অক্ষরবৃত্তের বিশেষত আঠারো মাত্রার যে অবিশ্বাস্য প্রতিপত্তি দেখা যায়, তাকে না হয় ভেঙে দেওয়া গেল। কিন্তু তারপরে? নানা রকমের পঙক্তিবন্ধ, স্বতন্ত্র ছন্দোরীতি – তার মধ্যে বাক্‌স্পন্দের সুমিত প্রয়োগ – ধরা যাক গৃহীত হল কোনও কবির লেখায়, কিন্তু তারপর? এ-ও কি শেষত এক বহিরঙ্গ ভাবনায় পৌঁছচ্ছে না? হয়তো নতুন ছন্দের জন্য গড়ে উঠবে নতুন ছন্দোসূত্র। কিন্তু তারপরে?

মনে হয় তার পরেও কিছু অবশিষ্ট থাকে ছন্দে নয়, ছন্দোস্পন্দে। যেমন দুজনের কথা বলার স্বর একরকম নয়, তেমনি দুই কবির স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে দেয় এই স্বর, এই স্পন্দ। যা ভদ্রতার বাঁধা বুলির মধ্যে সবসময় পাওয়া যায় না। কবিতা কিন্তু খোঁজে অন্তরঙ্গ ব্যক্তিত্বের স্বর। এটি পাওয়া যায় ছন্দস্বরের স্বাতন্ত্র্যে। কণ্ঠস্বরের, ব্যক্তিগত ধ্বনির জাদু সঞ্চারিত করতে পারা চাই কবিতার ছন্দের মধ্যে। একমাত্র সেখানেই কোনও ম্যানারিজমের ধারক না হয়ে কবিতা হয়ে উঠতে পারে স্বতন্ত্র কবির অস্তিত্ব। শব্দশৃঙ্খলার মাঝের বাঁধন আলগা করে দিতে পারে কবির কণ্ঠ। যখন দুটো শব্দের মধ্যে কবির মুখই ভেসে ভেসে সরে যায় তখন কোনও শব্দই আর মৃত থাকে না। নিছক পুরনো-ও মুহূর্তে মায়াময় হয়ে ওঠে। জীবনানন্দের ভাষার মতো শব্দ খুঁজে পায় একান্ত স্বকীয়তার ধ্বনি। ফ্যানির কাছে পৌঁছয় কীটসের আর্তি।

কবির অনুভূতি তখনি সত্যরূপে ধরা দেয়। কবিতার মধ্যে থেকে খুঁজে নেওয়া যায় কবির বাড়িয়ে দেওয়া হাত। 'নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টিই কবির অভিপ্রায়।' শব্দের নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষের অভিপ্রায় আলোচনা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

শঙ্খ ঘোষ মিতভাষী, সংযতবাকশব্দশিল্পী। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি খুঁজেছেন কিভাবে কবির স্বাতন্ত্র্য আর শব্দের প্রয়োগ হয়ে উঠতে পারে একে ওপরের অনুসারী, যাতে করে সৃষ্টি হতে পারে মহৎ কবিতার। কোন শব্দ হতে পারে কবিতার উপযুক্ত আশ্রয় সে নিয়ে ভাবতে বসে তাঁর মনে হয় দৈনন্দিন ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে যাওয়া শব্দ শিল্পের বাহন হতে পারে না, আবার 'কবিতার শব্দ' নামে পৃথক কোনও শব্দের ধারণাও খুব আকর্ষণীয় বা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সাহিত্যের নির্মাণে কবি-লেখককে সচেতন-সুচিন্তিত হতেই হয়। লৌকিক ভাষা তথা মুখের ভাষা কবিতার অবলম্বন হলেও মৌখিক ভাষার সম্বন্ধে স্থান ও কালভেদে ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকে। স্তরানুক্রম ঘটতে থাকে লৌকিক ভাষার। যুগে যুগে মুখের সচল ভাষা পরিবর্তিত হয়ে বয়ে চলে পৃথিবীর নানা অংশে নানারূপে। শব্দশিল্পীরা স্থানান্তরে সময়ান্তরে এই প্রবহমান ভাষাস্রোত থেকে অঞ্জলি ভরে নেন। প্রাবন্ধিক মনে করিয়ে দেন, সাহিত্যে চিরকালীন শব্দ বলে কিছু নেই। যে শব্দকে আজ গৌরবময় মনে হয়, ব্যবহৃত হতে হতে তা-ই জীর্ণ হয়ে পড়ে। নতুন কালের কবিরা এই শব্দকে নতুন করে ব্যবহার করতে চান, উজ্জ্বল শব্দকে আরও উজ্জ্বলতর করে তুলতে চান। কবিরা নতুন শব্দ সৃষ্টি করেন না, বরং শব্দের নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠে তাদের অভিপ্রায়। ব্যবহৃত শব্দের ভাণ্ডার থেকে বাছাই করে কবিরা তাদের শব্দচয়ন করেন, সেই শব্দের নতুন ব্যবহারের উজ্জীবন মন্ত্রে তা হয়ে ওঠে অব্যর্থ মর্মভেদী।

মনোযোগী সাহিত্যভোক্তা শঙ্খ ঘোষ দেখেছেন, বাংলা সাহিত্যে কবি মধুসূদনের মতো পরিশ্রমী শব্দচয়ন কবিতাকে স্বতন্ত্র চেহারা দিলেও তার মধ্যে অনেক সময় রয়ে যায় পতনের বীজ। শব্দ সন্ধান ও যোজনার অতীব প্রেরণায় অনেক কবিই জড় অভ্যাসের মধ্যে প্রবেশ করেন। কবিতার কাজ কেবলমাত্র স্বাতন্ত্র্য তৈরি নয়, প্রতিটি কবিতায় আরও একবার নিজেকে প্রতিফলিত করে তোলাই কবির পক্ষে প্রয়োজন। তাই নতুন শব্দের সৃষ্টি নয় শব্দের নতুন সৃষ্টি কাম্য, তাই প্রাবন্ধিকের বক্তব্য। অধ্যাপক প্রাবন্ধিক স্মরণ করেন, কবি কীটস চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয়ার বর্ণনা করবেন উজ্জ্বলের চেয়ে উজ্জ্বলতর শব্দে, কিন্তু শব্দ প্রত্যহ ব্যবহারের ফলে তার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে। শব্দের সেই ঔজ্জ্বল্য আর দার্ঢ্য নির্মাণ কবিকে নিয়ে যায় এক সংগ্রামের দিকে। পুরনো শব্দগুলির মধ্যে প্রকাশহীন নির্জীবতা কবিকে আহত করে। তাই শব্দের নতুন সৃষ্টির জন্য, প্রকাশের জন্য কবিদের সংগ্রাম চলতেই থাকে।

শব্দের নতুন সৃষ্টি প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ এনেছেন কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, হুইটম্যান, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কথা। তিনি জানিয়েছেন কোনও গ্রন্থকীটের ভাষা নয়,

লৌকিক ভাষা তথা মৌখিক ভাষা হল কবিতার অবলম্বন। কবিতার শব্দ বলে আলাদা কিছু নেই, সমস্ত প্রচলিত শব্দই কবিতার শব্দ। অভিজ্ঞতা, ধারণা ও প্রেরণার বিভিন্নতায় অনেক সময় কবিতার জগতে বড় কোনও চমক-চাঞ্চল্য তৈরি হতে পারে। শব্দের ব্যবহারে দুঃসাহসী হবার ব্রতকে অনেক কবি মনে করেন পূর্বতন জড়তাকে মোচন করবার মহত্তম উপায়। তবে মনে রাখতে হবে পরিচিত শব্দের অস্থানিক ব্যবহার মাত্রেই কবিতার যোগ্যতা বেড়ে যায় না। শব্দ জড় ও স্থানু, তার কোনও শক্তি নেই, জনন নেই, কেবল ওপর এক শব্দের সমবায়ে সংঘর্ষে জ্বলে ওঠা আছে।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি হিসেবে শঙ্খ ঘোষ জানেন, শব্দের নিজস্ব শক্তি নেই বলে নিত্য নতুন শব্দ বাড়িয়ে তোলা যায় না, বা বেড়ে যায় না। সেজন্য চাই শব্দের নতুন ব্যবহার। আর শব্দের নতুন ব্যবহারের জন্য চাই শব্দের প্রচলিত অনায়াস পারম্পর্য ভেঙে ফেলা। কবিতার ভাষায় আমরা কখনও দেখি অন্বয়গত বিপর্যাস। আবার কেবল অন্বয়ই নয়, একই চেতনা থেকে কখনও কখনও চোখের সব অভ্যাস ভেঙে দিয়ে কবি যেন চান একটি দৃশ্যগ্রাহ্য গড়ন তৈরি করতে। সে কাজ সম্ভব। কারণ কবিতা আজকের ছাপার যুগে আর শুধুমাত্র শ্রাব্য নয়, দৃশ্য-ও। এই দৃশ্যগ্রাহ্যতার মধ্য দিয়ে শব্দ অনেক সময়ে প্রাণ খুঁজে পায়।

উদাহরণ হিসেবে কবি শঙ্খ ঘোষ বলেছেন, ডিলান টমাসের বরফি কবিতা, সত্যেন্দ্রনাথের রচনা, কামিংসের ভাঙা ভাঙা উলটোপালটা শব্দব্যূহ রচনাতে চোখের সঙ্গেই যুদ্ধ। আধুনিককালে কবিতা যখন দৃশ্য মাধ্যমে পড়া হয়, তখন তার দৃশ্যগুণের কথাও ভাবতে হয়। শ্রুতিতে দৃশ্যে একটা সংযোগ চাই শব্দগুলোর মধ্যে। শব্দের বর্ণেরও রূপ আছে, সিটওয়েল বর্ণে এক একটা রং বা স্পর্শের আভাস পান, যাঁবো স্বরবর্ণের রং লিখে রাখেন। যদি বর্ণের রূপরং থাকে তবে শব্দের ও শব্দের পরম্পরার নিশ্চয় আরও কিছু আছে। কবিতা একটি প্রকৃতিগঠন অর্জন করে আর কবি তাকে ভেঙে ভেঙে নিত্য নতুন গড়ন বানান। কামিংসের স্বেচ্ছাচারের মধ্যেও শব্দগুলি নৃত্যপর সজীবতা পায়।

শব্দের প্রাণ খুঁজে পাওয়ার প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, দুই শব্দের সংযোগবিন্দুর ওপরে আক্রমণ খুব জরুরি। শব্দ যেখানে কোনও মৃত বন্ধনে জড়িয়ে যাচ্ছে, তার থেকে শব্দকে মুক্ত করা কবির কাজ। তবে শব্দের সংযোগবিন্দুর ওপরে কবির আক্রমণ নিতান্ত বাইরের অবয়বে। অন্তর্গূঢ় আক্রমণ ভিন্ন শব্দের নতুন দ্যোতনা প্রায় অসম্ভব। কবিতা একটা প্রকৃতি, গঠন অর্জন করে আর কবি তাকে ভেঙে নিত্য নতুন গড়ন নির্মাণ করেন। কাব্য সৃষ্টি করেন। কবিতা খোঁজে অন্তরঙ্গ ব্যক্তিত্বের স্বর। সেই অন্তরঙ্গ ব্যক্তিত্বের স্বরেই শব্দের নতুন সৃষ্টি হয়। এক পরম্পরা ভেঙে শব্দ এগিয়ে চলে সামনের দিকে। নতুন কোনও প্রবাহের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গতির দিকে।

শব্দশৃঙ্খলার মাঝের বাঁধন আলগা করে দিতে পারে কবির কণ্ঠ। যখন দুটো শব্দের মধ্যে কবির মুখই ভেসে ভেসে সরে যায় তখন কোনও শব্দই আর মৃত থাকে না। নিছক পুরনো-ও মুহূর্তে মায়াময় হয়ে ওঠে। জীবনানন্দের ভাষার মতো শব্দ খুঁজে পায় একান্ত স্বকীয়তার ধ্বনি। ফ্যানির কাছে পৌঁছয় কীটসের আর্তি। কবির অনুভূতি তখনি সত্যরূপে ধরা দেয়। কবিতার মধ্যে থেকে খুঁজে নেওয়া যায় কবির বাড়িয়ে দেওয়া হাত।

অর্থাৎ নতুন শব্দের সন্ধান বা জন্ম যে ম্যানারিজমের মধ্যে তলিয়ে দিতে পারে কবিত্বশক্তিকে, শব্দের নতুন সৃষ্টি তার থেকেই কবিকে মুক্ত করতে পারে। পরম্পরায়িত শব্দের শৃঙ্খলা ভেঙে তাকে মুক্ত করতে পারেন শব্দকার। আর একজন সার্থক কবি পারেন শব্দকে নতুন সজ্জায় নতুন অর্থে বিকশিত করতে। আর সেই বিকাশমানতার মধ্যেই জন্ম নেই সত্যিকারের কাব্যগুণ সম্পন্ন কালজয়ী অনুভবের কবিতা। যার মধ্যে ধরা পড়ে কবির প্রার্থিত জীবন, যাপন, যন্ত্রণা, অনুভব সমস্তটাই। 'শব্দকে ধরে রাখে তার ছন্দ বা স্পন্দন অথবা একই সঙ্গে বলা যাক ছন্দস্পন্দ।' – ছন্দস্পন্দ তৈরি হওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ অবলম্বনে আলোচনা কর।

> 'মানুষের শিল্পের উপাদান কেবল তো কাঠপাথর নয়, মানুষ নিজে। বর্বর অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত করেছে। এই সংস্কৃতি তার বিশেষ স্বরচিত ছন্দোময় শিল্প।'

১৯৩৩ -এ 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে এইভাবে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে ছন্দের প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে তিনি প্রথমে বোঝাতে চেয়েছিলেন প্রকৃতির ছন্দ। কারণ প্রকৃতির সেই ছন্দই ধরা দেয় জীবনের ছন্দে, শিল্পের ছন্দে। অন্যদিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিতা কিংবা গদ্য যাই হোক না কেন, শব্দকে ধরে রাখবার বিষয়ে ছন্দস্পন্দ একটি প্রয়োজনীয় ধারণা।

১৯৬২ সালে লেখা 'শব্দের পবিত্র শিখা' প্রবন্ধটি ১৯৭১ -এ প্রকাশিত 'নিঃশব্দের তর্জনী' প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। প্রবন্ধে কবি সন্ধান করতে চেয়েছেন সেই গুণের যার দ্বারা শব্দের পবিত্র শিখা জ্বলে ওঠে, আর শব্দ অবলম্বী কবিতা হয়ে ওঠে কবিতা। মননশীল এই প্রবন্ধে আবেগ ও যুক্তির পারস্পরিক প্রয়োগে প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ খুঁজে পেয়েছেন সেই বৈশিষ্ট্য যা সমস্ত ম্যানারিজম ছাপিয়ে কবিতাকে কবিতা করে তোলে।

তিনি বলেছেন, সাধারণভাবে অদৃশ্য কিন্তু শ্রুতিগোচর ছন্দ প্রবাহের মধ্যে ভেসে

থাকে শব্দগুলি। আর তাই ছন্দের নকশা সুনিয়মিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন অন্ধকারে একে অন্যের গায়ে লেগে যায়। এর ফলে একটি সুগঠিত পদ্যপঙক্তি পাওয়া গেলেও সজীব ব্যক্তিত্বের লক্ষণ তার মধ্যে প্রায়ই পাওয়া যায় না। সে জন্য কবিতার ইতিহাসে কখনও কখনও দেখা দেয় এক ছান্দসিক বিদ্রোহ। ছন্দোমুক্তির সাধনা প্রকৃতপক্ষে ছন্দের আলোড়ন শব্দের আলোড়ন একই সূত্রে বাঁধা।

আমরা দেখব প্রাবন্ধিক উদাহরণ হিসেবে বলছেন, বাংলাসাহিত্যের পরম্পরায় মধুসূদন দত্ত ছন্দকে ভাঙতে চেয়েছিলেন, শব্দকে প্রাণ দেবার জন্য। যে শব্দপ্রকটতাকে আমরা তাঁর ম্যানারিজম বলে জানি তার প্রেরণা এসেছিল অমিত্রাক্ষরের প্রয়োজনে। চোদ্দমাত্রার সুবিন্যস্ত লাইন ভেঙে নিয়ে কথার স্রোত যখন এগিয়ে এল স্বাধীনভাবে, শব্দগুলো যেন অনেকদিন পরে নড়েচড়ে উঠল। একটু পাশ ফিরবার জায়গা পেল তারা, হাঁপ ছাড়তে পারল অনেকদিনের পরে। বস্তুত এই সব পর্যায়ের শব্দ বা শব্দপরম্পরার ওপরে কবির আক্রমণ নিতান্ত তার বাইরের অবয়বে। কিন্তু ভিতরের আক্রমণ ছাড়া কি শব্দের নতুন দ্যোতনা সম্ভব অথবা কিভাবে এই ভিতরের আক্রমণ সম্ভব?

প্রাবন্ধিক বলেছেন, দুই শব্দের সংযোগবিন্দুর ওপর আক্রমণটাই সবচেয়ে জরুরি। কিন্তু কোথায় সেই সংযোগবিন্দু? সেই বিন্দু যেখানে আঘাত করে শব্দের মৃত বাঁধন খুলে দিতে হয় তা তো অদৃশ্য। অদৃশ্যে গিয়েই তার সঙ্গে লড়তে হয়।

প্রাবন্ধিকের প্রশ্ন এই যে শব্দকে ধরে রাখে কে? কবিতা হোক বা গদ্য শব্দকে ধরে রাখে তার ছন্দস্পন্দ। ছন্দ অদৃশ্য কিন্তু শ্রুতিগোচর। ছন্দের প্রবাহের মধ্যে ভেসে থাকা শব্দের দ্বারা পদ্যপঙক্তি পাওয়া যায় কিন্তু সুগঠিত ব্যক্তিত্ব পাওয়া যায় না। তাই কবিতার ইতিহাসে শব্দের চেতনাগত বিদ্রোহের সঙ্গে দেখা যায় এক ছান্দসিক বিদ্রোহ। বস্তুত শব্দের আলোড়ন আর ছন্দের আলোড়ন একই সূত্রে বাঁধা।

অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ এও দেখিয়েছেন, শুধুমাত্র মধুসূদন নয়, বাংলা কবিতায় এর পরে আমরা ক্রমিক ছন্দোমুক্তির সাধনা দেখেছি আরও একশো বছর। রবীন্দ্রনাথ যে পৌঁছলেন গদ্যকবিতা পর্যন্ত তার একটা মস্ত কারণ মনে হয় যে নিজের অভ্যাসের গণ্ডি থেকে মুক্তি পাওয়া। তখন তাঁর জন্য এই মুক্তি খুবই জরুরি ছিল। নাহলে তাঁর গদ্য কবিতার সমস্ত কাব্যগুণ যে অন্য ছন্দে সাজানো যেতে পারতো সে কথা না বোঝার কিছু নেই। এ নিশ্চয় একটা পরীক্ষাকাল। কিন্তু এই পরীক্ষার শোধনের মধ্যে দিয়ে তাঁর শব্দেরা যেন আবার নতুন করে শক্তি পেল। শুরু হল কবিগুরুর এক নতুন যাত্রা। 'প্রান্তিক' আর তার পরবর্তী কবিতাবলীর মধ্যে আমরা যার স্বতঃপ্রকাশ দেখতে পাব।

টিপ্পনী

তবু, প্রাবন্ধিকের মতে আশংকার বিষয় হল, কিন্তু এই প্রক্রিয়া ম্যানারিজমে আক্রান্ত হতে পারে। যেমনটা ঘটেছিল মধুসূদনের পরে রঙ্গলালের কবিতায়। তা কেবল নতুন শব্দচয়নের আকর হয়ে রয়ে গেছিল। কাব্যগুণে কালোত্তীর্ণ হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি।

টিপ্পনী

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, ছন্দোমুক্তির শেষ আছে। ছন্দকেও যদি নিছক বাইরের অর্থে ভাবি তবে তার শেষ আছে সেই অভ্যাসের দাসত্বের মধ্যেই। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় অক্ষরবৃত্তের আরও বিশেষ করে আথারমাত্রার যে অবিশ্বাস্য প্রভাব দেখা যায় তাকেও হয়তো ভেঙে দেওয়া সম্ভব। ধরা যাক নানারকমের পঙক্তিবন্ধ, স্বতন্ত্র ছন্দোরীতি এবং তার মধ্যে বাকস্পন্দের সুমিত প্রয়োগ গৃহীত হল কোনও কোনও কবির লেখায়। কিন্তু তারপর কী? পর্বকে বিভাগ চলবে কিনা অথবা মধ্যখণ্ডনের কোনও প্রয়োজন আছে কি না, কোন ছন্দের কোন শব্দের মাত্রামুল্য কী হবে এসব প্রশ্নে ভবিষ্যতের ছান্দসিককে আবার নতুন করে ভাবতে হবে সব। হয়তো বা তাকে নির্মাণ করে নিতে হবে উপযোগী সূত্রের।

এই সব সূত্রসংহিতা নির্মাণের পরেও কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়। কবি তাকে বলেছেন ছন্দস্পন্দ। দুই ভিন্ন জনের কথা বলার স্বর ঠিক একই রকম নয়, যদিও একই শব্দ হয়তো তারা ব্যবহার করে। দুই কবির মধ্যেও স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে দেয় এই স্বরের পার্থক্য বা স্পন্দের বৈচিত্র্য। 'শব্দের পবিত্র শিখা' প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ জানিয়েছেন–

> 'অবশ্য এটা ঠিক যে ভদ্রতার কণ্ঠ একটা রীতির মধ্যে বাঁধা বলে অনেক সময় তা সুঠাম কিন্তু নির্জীব, কথা বলবার ঠিক স্বরটি জানা যায় কেবল অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে আলাপনে। কবিতাও খোঁজে সেই অন্তরঙ্গ ব্যক্তিত্বের স্বর। প্রথমটি যেমন ধরা পড়ে কণ্ঠস্বরের ভিন্নতায়, পরেরটি তেমনি দেখা দেয় ছন্দস্বরের স্বাতন্ত্র্যে। অন্য ভাষায় হয়তো বলা যায় যে এই কণ্ঠস্বরের, ব্যক্তিগত ধ্বনির এই জাদুটিই সঞ্চারিত করে দেওয়া চাই কবিতার ছন্দের মাঝখানে।'

এই জাদু সঞ্চারিত করে দেওয়া সম্ভব হলে কোনও ম্যানারিজমের বাহন না হয়েই কবিতার দেহ হয়ে উঠতে পারে স্বতন্ত্র কবির অস্তিত্ব। কবিতার শব্দমালার মধ্যে কবির মুখ ভেসে উঠলে সে শব্দ মৃত নয়, পুরনো নয় নিছক, কবির জাদুস্পর্শে তা হয়ে ওঠে মায়াময় নবীন। সেই ছন্দস্পন্দ ছুঁয়ে থাকে যে শব্দেরা তারাই শব্দের পবিত্র শিখা জ্বালিয়ে দেয়। সরাসরি সেই আলো পৌঁছে যায় পাঠকের কাছে। কবিতা তার বহিরঙ্গকে ছাপিয়ে হয়ে ওঠে অন্তরঙ্গ কবিতা।

‘বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সম্ভার : কাজী আবদুল ওদুদ

কাজী আব্দুল ওদুদ মুসলমান সমাজে বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলন ও প্রগতিশীল চিন্তাতধারাকে বপন করেছিলেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধ সাম্প্রদায়িকতায় চিহ্নিত নয়। ফলে তাঁর প্রবন্ধ সর্বজন পাঠকের কাছে গৃহীত। ফরিদপুর জেলার এক সম্ভান্ত মুসলমান পরিবারে ওদুদের জন্ম ২৬ এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান যখন তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজেরও ছাত্রী ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর অসাধারণ ভাষা ও সাহিত্যের সুগভীরতায় মুগ্ধ হয়ে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাংলার অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেন। ওদুদ মূলত প্রাবন্ধিকজ। তবে তিনি গল্প - উপন্যাসও লিখেছিলেন। মীর পরিবার তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন। নদীবক্ষে ও আজাদ নামক উপন্যাসও লিখেছিলেন। তাঁর লেখা নাটক ‘পথ ও বিপথ’ ও ‘মানব চক্ষু’। তবে কথাসাহিত্যিক হিসবাএ নয়, তাঁর প্রবন্ধই তাঁকে দিয়েছে পরিচিতি। রবীন্দ্রনাথ ও কবি গ্যেটের জীবনদর্শন সম্পর্কিত বিশ্লেষণ বিদগ্ধ পাঠক সমাজে প্রশংসা পেয়েছে। ওদুদের লেখা প্রবন্ধগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য - ‘নবপর্যায়’ (১মখন্ড, ১৯২৬ / ২য় খন্ড ১৯২৯), ‘রবীন্দ্রকাব্য পাঠ’ (১৯২৮), ‘সমাজ ও সাহিত্য’ (১৯৩৪), ‘হিন্দুমুসলমানের বিরোধ’ (১৯৩৫), ‘আজকের কথা’ (১৯৪১), ‘কবিগুরুর গ্যেটে’ (১ম ও ২য় কন্ড ১৯৪৬), ‘নজরুল প্রতিভা (১৯৪৯), ‘স্বাধীনতা দিনের উপহার (১৯৫১), ‘শ্বাশত বঙ্গ’ (১৯৫১), ‘বাংলার জাগরণ’ (১৯৫৬), ‘শরৎচন্দ্র ও তারপর’ (১৯৬১), ‘কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (১ম খন্ড, ১৯৬২ / ২য় খন্ড ১৯৬৯), ‘‘হজরত মহম্মদ ও ইসলাম’ (১৯৬৬)। তাঁর Cretive Bengali ও Modernism o poet Tagor গ্রন্থ দুটি বেশ সমাদৃত। তিনি কোরাণ অনুবাদও করেছিলেন।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। ওদুদ সাহেব এই আন্দোলনের অন্যতম পুরবী ব্যাক্তিত্ব ছিলেন। ওতিনি তাঁর বিচার বুদ্ধিকর সংস্কারমুক্ত ও গতিশীলতা দান করেছিলেন, যার ছাপ পড়েছে তাঁর প্রবন্ধগুলিতে। নিজের সমাজ ও সম্প্রদায়ের দৈন্যতার জন্য ওদুদ সাহেবের গভীর আক্ষেপ ছিল। বিভিন্ন প্রবন্ধে তার প্রমাণও মেলে। ওদুদ সাহেবের স্বদেশ চেতনা আর বিশ্ব চেতনা একাকার হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে হয়তো রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কর্মক্ষেত্রের নিবিষ্ট পাঠক ছিলেন তিনি। ওদুদ সাহেব কতখানি মুক্তমনের ও যুক্তিবাদী ছিলেন, তার প্রমাণ মেলে ‘হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম’ গ্রন্থে। এখানে তিনি হজরত মোহম্মদকে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

একজন রক্তমাংসের মানব বলে উল্লেখ করেছেন, যিনি ঐতিহাসিক এক সঙ্কটকালে মানবজাতির জন্য সাম্য ও জ্ঞানানুবাগের দীপ জ্বেলেছিলেন। যুক্তি, পরিমিতিবোথ ও আত্মপ্রত্যয়ের ত্রিবেণিসঙ্গম দেখা যায় ওদুদের গদ্যে। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ব্যবহারিক শব্দকোষ বাংলাভাষা সাহিত্যের এক অভিনব সংযোজন। প্রচলিত বাংলা শব্দের পাশাপাশি মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবি, ফার্সি ও তুর্কি শব্দের স্থান মিলেছে এই শব্দকোষে, যা এক ব্যাতিক্রমী প্রয়াস। পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মুক্তিচিন্তা জাগরণে ওদুদের অবদান চিরকাল স্মরণযোগ্য। তাঁর'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্য' প্রবন্ধটিতে মুসলমানের সাহিত্যে সীমিত অবদান সম্পর্কিত সমস্যার একটি চমৎকার পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে।

'বাঙালী মুসলমানেদর সাহিত্য সমস্যা প্রবন্ধটি মুসলিম সাহিত্য সমাজ এর প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পাঠিত প্রবন্ধ। রচনাকাল ফাল্গুন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ। কাজী আবদুল ওদুদ প্রবন্ধটিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে আছে বাংলার গৌরব সাধনে মুসলমান সমাজেদর কোনো অবদান আছে কিনা। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা নিয়ে একটি সুচিন্তিত বিশ্লেষণী মতামত। প্রথম পর্যায়ের সূত্রপাতে ওদুদ সাহেব বাংলার গৌরবময় ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। বলেছেন বাংলাদেশের কথা 'ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা ধাকবে; কেননা, অপেক্ষাকৃত অল্পকালের ব্যবধানে মানুষের চিত্তের অপূর্বতার নব নব প্রকাশ এদেশে ঘটেছে।' বস্তুত বাঙালি জাতি বলতে হিন্দু - মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে নিয়েই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ওদুদ সাহেবের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যে, মুসলমানদের বাংলার বিশাল মানবসমাজে অবসান সামন্যই। তাঁর কাছে মনে হয়েছে গোটা মুসলমান সমাজটাই একটা সমস্যা। সাহিত্য, অর্থনীতি, শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেরই সমস্যা। কেউ কেউ মনে করেন মুসলমান সমাজের বয়স বেশী নয় - সাত আট শত বছর হবে। সুতরাং এই সমাজের কাছে প্রত্যাশা করাটা ভুল হবে। কিন্তু ওদুদ সাহেব মনে করেন মুসলমানের প্রতি এই ভাবনা যদি জারি থাকে ও তাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে যদি দেখা হয় তাহলে অবস্থা শুধু শোচনীয় নয়, অত্যন্ত চিন্তনীয়'। আবার অনেকে মনে করেন 'মুসলমান সমাজ হীন উপকরণে' গঠিত'। আবদুল সাহেব এই মতকে কিছুটা খন্ডন করেছেন অন্যভাবে এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে।

এরপর কাজী সাহেব বাংলার ইতিহাসে যতটুকু মুসলমানের দান আছে তার গৌরব কথা তুলে ধরেছেন। মুসলমান নবাব - বাদশাহদের দান অপরিসীম। তাই তাঁদের দানের কথাকে প্রাবন্ধিক আলাদাভাবে ধরতে চাননি। বরং সেই মুসলমানের কথাই তুলে

ধরেছেন যারা সাধারণ মুসলমান, দরিদ্র মুসলমান, বাংলার মাটিতে যাদের জন্ম, আবার বংলার মাটিতেই যাদেদর দেহ সমাধিস্থ তাদের কথা। তিনি স্মরণ করেছেন নীল বিদ্রোহের কথা, যেখানে প্রধানত মুসলমান চাষীরাই লড়েছিল। প্রসঙ্গত দীনবন্ধুর নীলদর্পন এর তোরাপ চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে মোহসাধনের দানের কথা উল্লেখ করেছেন। 'ধনবান মুসলমানেরা ধনকে কোনোদিন বহুমূল্য' মনে করেননি। তাই ঢাকানগরীর শ্রীবৃদ্ধিতে ঢাকার নবাবদের দান আছে , চাঁদ মিড়াঁ, ফাজেল মোহম্মদ, মোহম্মদ হোসেনের দানের কথাও স্মরণীয়।

এরপরে দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজী সাহেব মুসলমানদের সাহিত্যে কোনো দান আছে কিনা তা আলোকপাত করেছেন। ওদুদ সাহেব বলেছেন, 'সাহিত্য জীবনবৃষক্ষেদর ফুল, জাতি বা সমাজ বিশেষেচর মগ্নচৈতন্যের রসের যোগানে তার বিকাশ ঘটে'। কিন্তু দেখা যাচ্ছ বাংলার মুসলমান সমাজের অন্তরে সেই সঞ্চিত নই। তাই তাদের দ্বারা সাহিত্যের তেমন ফুল ফোটেনি। কাজি সাহেব লেছেন, 'বাংলার মুনসলমান সমাজে এ পর্যন্ত কোনো নউল্লেখযোগ্য সাহিত্যের উদগম হয়নি শুধু এই ব্যাপারটিই তার আত্মসম্মানের পক্ষে হয়ত মারাত্মক নয়'। কারণ ইসলামেদর সংযম ও পবিত্রতা, পরিশ্রম ও করুণপ্রাণতা এবং সুন্দর ও মহনীয়ের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা' এটা কম গৌরবের নয়। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে 'বাংলার মুসলমানের জীবনযোজন মারাত্মক ত্রুটিতে পরিপূর্ণ'। বর্তমানের ইসলাম 'নারীর অবরোধ সমর্থন করেছে, সুদের আদান প্রদানের উপর অভিসম্পাত জানিয়ষেছে, ললিত কলার চর্চায় আপত্তি তুলেছে, আর চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়কণ্ঠে বলে দিয়েছে, তোমাদের সমস্ত চিন্তা সবসময়ে যেন সীমাবদ্ধ থেকে কোরান ও হাদিসের চিন্তার দ্বারা'। কিন্তু মনে রাখতে হবে বর্তমানের ইসলামের এই একপ্রকার মানুষের উপর অত্যাচার। ইসলামের শ্রেষ্ঠ সত্যই তো তৌহীদ মানব চিত্তের চিরমুক্তির বাণী'। চিরমুক্তির বাণী অনেকটা নদীর প্রবাহের মত। স্বচ্ছন্দে তার চলাফেরাতাই স্বাভাবিক। নিয়মের এই অতিরিক্ত বেষ্টন নদীর কূলের বাঁধের সমাজ। - 'কিন্তু কূলের বাঁধের পত্তন করে তো নদীর সৃষ্টি হয় না, নদীর প্রবাহ আপন প্রয়োজনে কূলের বাঁধের সৃষ্টি করে চলে। জোর করে বিধি নিষেধ ও অবরোধ চাপিয়ে চাপিয়ে চিত্তের যে স্বাভাবিক স্ফূর্তি বাধা পাচ্ছে, তাতেই মানুষ 'অর্ধ বিকশিত হয়ে পড়ছে। সেখানে সাহিত্য সৃষ্টি হবেই বা কী করে?

কাজী সব লক্ষ্য করেছেন যারা নিজেদের স্বাভাবিক স্ফূর্তিতে বাঁধ দিয়েছেন তারা অর্থাৎ 'উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের' বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কোনো দান নেই। বরং যারা নিজেদের স্বাভবিকতাকে মুক্ত করে দিয়েছেন, তথাকথিত সেই 'নিম্ন শ্রেণীর

টিপ্পনী

মুসলমানদের দান সদরে গৃহীত হয়েছে' - বিশেষত লোক সঙ্গীতে। পাগলা কানাইয়ের গান, লালন ফকিরের সগাণে সকলেই তাই মুগ্ধ হয়েছে। ইসলামের যে মহানুভবতা, যাকে পাওয়ার জন্য উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা নিয়মের বেষ্টনীতে বেঁধে রেখেছেন, তা এই নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের গাণে বিনা প্রচেষ্টায় মঞ্জরিত হয়েছে - ইসলামের একেশ্বরতত্ত্ব' স্থান পেয়েছে। পরিপূর্ণ ইসলাম মানুষের জন্য কল্যান ও শান্তি বহন করে আনে। ''ধর্মে বলপ্রয়োগ নিষেধ' - কোরানের এই মহতী বাণী - মুসলমানের জীবনে সত্য হয়ে উঠুক প্রাবন্ধিক তা প্রার্থনা করেছেন । মুসলমান সমাজের কর্মকর্তারা জবরদস্তি করে অন্যসমাজের লেকেদের ধর্মান্তরিত করছেন । তারা মানুষের মধ্যে কতকগুলো বিধি নিষেধ চাপিয়ে দিয়ে আল্লাহর সৈনিক হওয়ার গৌরব লাভ করছে।

এরপরেই কাজী সাহেব বললেন, 'সাহিত্য জ্ঞানের সুরভি' । কিন্তু মুসলমান সমাজে সে জ্ঞানের পথ রুদ্ধ। চিন্তার স্বাধীনতা ও বুদ্ধির মুক্তি যা 'বিধাতার দেওয়া পাথেয়', তাকেই তারা অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তাই কাজী সাহেব আক্ষেপের সুরে স্বীকার করছেন, 'সুন্দর ও সবল জীবনের জন্য যত কিছুর প্রয়োজন তার এত অভাব বাংলার মুসলমান কি করে পুরণ করবে, একথা ভাবতে গেলে সত্যিই অবসন্ন হয়ে পড়তে হয়, । কিন্তু তারই মধ্যে আবার তিনি আশারও বাণী শুনিয়েছেন । বলেছেন এই সঙ্কটের সময়ে একদিন বীরপুত্রদের জন্ম হবে, যারা সমস্ত অভাব বন্ধন ঘুচিয়ে দিয়ে তৌহীদের যোগ্য বাহনরূপে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের জয়গান গাইবে। বর্তমানে মুসলমাণেরা অকারণে ভীত হয়ে মনুষ্যত্বের 'সেই অমূল মানিককে অন্ধবিশ্বাসের গুহায় লুকিয়ে রেখেছে । প্রাবন্ধিক জানাচ্ছে, 'কালের ভান্ডারে আনন্ত রত্ন রয়েছে, কিন্তু প্রাণপণে না চাইলে তার কাছ থেকে কিছুই আদায় করা যায় না।' 'সমস্ত দেহমন দিয়ে তাকে চাইতে হয়। বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সমস্যার আরেকটি প্রধান সমস্যা 'উর্দু - বাংলা সমস্যা' । কিন্তু প্রাবন্ধিক জানাচ্ছেন এই 'উর্দু - বাংলা' সমস্যা'র ইগো নিয়ে বসে থাকলে মুসলমানদের সাহিত্যচর্চা দিনে দিনে খর্ব হবে। বরং শব্দ নিয়ে ছুতমার্গ ভাব না দেখিয়ে চলাই শ্রেয়। শব্দ উর্দু না বাংলা - সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা সেই শব্দ বর্ণ ও গন্ধযুক্ত শব্দ কিনা, শব্দেদর গায়ে বর্ণ ও গন্ধ মাখিয়ে সেই শব্দ চিত্তকে রসানুভূতি দান করছে কিনা। সত্যকারের মুসলমান হলে চিত্ত প্রশস্ত হয় । তাই 'বাংলার মুসলমানকে সত্যকার মুসলমান হতে হবে'।

তবে কাজী আবদুল ওদুদ অধুনা বাংলা সাহিত্যিকে অভিযোগের কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন যে বাংলা সাহিত্য এখনো খুব বেশী পরিমাণে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। মানুষের দুৎখ ও আনন্দের প্রকাশের চাইতে এটা দারিদ্র্য

অবস্থা। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, 'বাংলা সাহিত্য হিন্দুর যে চিত্র ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পাওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তা অনেকখানি অস্বাভাবিক রকমে হিন্দু'। এই অস্বাভাবিক রকমের হিন্দুত্ব বলতে 'চন্ডীমন্ডপের দাওয়ায় বসে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার কূটতর্কে সময় 'কাটানো' উগ্র হিন্দুত্বের কথা বলেছেন। এই হিন্দুত্বের প্রতি প্রাবন্ধিকের কোনো সমবেদনা নেই। বরং তিনি বলেছেন এই উগ্র হিন্দুর হিন্দুত্বের কারণেই 'তার প্রতিবেশী মুসলমানের অন্তরে শুধু সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাই জেগেছে'।

কিন্তু ইসলাম এমন নয়, 'ইসলাম সুন্দর ইসলাম মহান'। কিন্তু তার যোগ্য প্রকাশ সাহিত্যে নেই কোনো - এটাই প্রশ্ন প্রাবন্ধিকের। সাহিত্যিকের কোনো ধর্ম হয় না। সাহিত্যিক 'সাম্প্রদায়িক হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের' মত এক চেহারার নন। সাম্প্রদায়িক হিন্দু অথবা মুসলমান, আগে হিন্দু অথবা মুসলমান, তারপরে মানুষ। কিন্তু সাহিত্যিক হিন্দু অথবা মুসলমান আগে মানুষ, তারপরে হিন্দু অথবা মুসলমান। সাহিত্যে জাতি ও ধর্মভেদ আসলে একটি 'ফুলের দেশ ও কালের ভেদ - ভেদ, শুধু পাপড়ির বিন্যাস ও রঙের গাঢ়তার বৈচিত্র্যে'। তবে সাম্প্রদায়িক মুসলান বাংলার সাহিত্যিক মুসলমানদের সাহায্য করতে পারেন কোরাআন হাষদিস ও প্রাচীন মুসলমান গ্রন্থাকারদের ভালো বইয়ের বাংলা তর্জমা প্রকাশ করে। অনেক সময় দেখা যায় এই সামান্য উপকরণ থেকেও সত্যকার কোনো বড় সৃষ্টি হতে পারে সাহিত্য স্রষ্টাদের হাত ধরে। আগুণ ধরিয়ে দেবার জন্য একটি ফুলকিই তাদেদর কল্পনায় যথেষ্ট। আজকাল অবশ্য অনেক সাহিত্যিক উর্দু সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছচেন। কোনো সন্দেহ নেই এতে চিত্তের মঙ্গলই হচ্ছে। কিন্তু এর ভিতর দিয়ে যেন 'একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাংলা সাহিত্য মুসলমানের অনুপ্রেরণা দেবার মতো কিছু নেই'। কিন্তু ওটিও দেখার ভুল। কারণ বাঙালী মুসলমানদের অন্তরে প্রেরণা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্য নিঃস্ব নয়। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখায় বাংলা সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতার পথে হাঁটেনি। সত্য ও কল্যাণের পথে চলা এই অগ্রজ সাহিত্যেকরা চিরকালই শ্রদ্ধা পাবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি উর্দু সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের মত এই যে - বাংলা সাহিত্যের ' সমস্ত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও এতে ভাল যেটুকু সম্ভবপর হয়েছে তাকে ডিঙিয়ে যাবার মতো কিছু উর্দুতে পাইনি'। তাছাড়া চিন্তার জগতে বাংআলী মুসলমানেরা 'শুধু টুপি দেখে আত্মীয় ঠাওরাবে এ মনোভাব' যত শীগগির দূর হয়ে যায় ততই আমাদের লজ্জা কমবে। কোনো সন্দেহ নেই বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত এলাকা হিন্দুদের দ্বারা অধিকৃত। কিন্তু মুসলমানদেরও 'সত্য ও কল্যাণের সন্ধানী' হয়ে ভাবা উচিত যে সে আমার আরেক ভাই। ইসলামের যে সাম্য ও একেশ্বরতত্ত্বের অঙ্কার তা

টিপ্পনী

এই ভাবনাতেই স্বীকৃতি পাবে। বাঙালী মুসলমানেরা এটিকে যতদিন না স্বীকার করে নিতে পারবে, ততদিন বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য সমস্যা থেকে যাবে।

'রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষাসমস্যা' : অশোক মিত্র

টিপ্পনী

অশোক মিত্রের 'রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধটি ১৯৯৭ লেখা। জোড়াসাঁকোর পুন্য প্রাঙ্গণে পবিত্র সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সে বছর প্রধান অতিথি রূপে আমন্ত্রণে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তারই প্রকাশিত রূপ এই প্রবন্ধ। প্রসঙ্গত স্মরনীয় এই বক্তৃতার তিন বছরআগে ১৯৯৪ সালে অশোকমিত্র রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। অশেওক মিত্র এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাধের শিক্ষাদর্শন, স্বাধীনতা উত্তর কালে সেই শিক্ষাভাবনা সম্প্রসারণে সমস্যা কোধায় ও তার সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। প্রবন্ধের সুচনাতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কী সে সম্পর্কে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টিকর্মকে সনম্রচিত্তে অধ্যয়ন করার প্রধান উদ্দেশ্যে মেনে নিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।" বাঙালী জাতি ও আ-বিশ্বের কাছে রবীন্দ্রনাথ যে একজন দিগ্‌নির্দেশক ও পরম নির্ভরতা - সেকথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন।

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ পড়ে দুটি প্রসঙ্গ বারবার উল্লিখিত হতে দেখেছেন। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা শিক্ষার্থিদের মধ্যে একপ্রকার আনন্দ সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন প্রাণসঞ্চার করে, তা ছাত্র - ছাত্রীদের অন্তঃকরণকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়।" দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা "জীবনচর্যার সঙ্গে অন্বিত"। তাঁর শিক্ষা পন্ডিতিয়ানার জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যে শিক্ষা সমাজের সর্ববৃহৎ অংশকে জীবনের দৈনন্দিন সমস্যার মুখোমুখি হতে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা জীবনকে বুঝতে সাহায্য করে , জীবনসংগ্রামে সাফল্যের উপকরণ জোগায়, মনের ভিতরে আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করে। পুঁথিগত ও প্রথাগত শিক্ষার বাইরে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে এইভাবে হৃদয়ের পারিজাতভূমিতে আনন্দের সঙ্গে স্থাপন করলেন।

কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাভাবনায় জীবনযাপিত হলে আমাদের জীবন বর্ণময় হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রাবন্ধিক লক্ষ ককরেছেন স্বাধীনতা উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা জীবনযাপনের ও জীবনধারনের সমস্যাগুলিকে জাদুবলে তো মিলিয়ে দিতে পারেই নি, বরং তা আরও হাজারগুণ জটিলতর করেছে। কিন্তু কেনো ? প্রাবন্ধিক তার উত্তর খুঁজেছেন এইভাবে যে প্রাক্ - স্বাধীনতা পর্বে সমাজ ও জীবনযাত্রা ততখানি জটিল নয়, যতখানি স্বাধিনতা উত্তর কালে বর্তমান। প্রাবন্ধিক লক্ষ করেছেন

স্বাধীনতা উত্তরকালের আঞ্চলিক অসাম্যকে, "যা ক্রমশ কুটিল হ্রিংস্রতার রূপ নিচ্ছে।" এই টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও খন্ড বিখন্ড হয়ে যাচ্ছে। প্রাবন্ধিক তাই বললেন, "ভারতবর্ষ এই পোশাকি নামটি কোনোক্রমে বজায় আছে, 'রবীন্দ্রভারতী; এই মন্ত্রের উচ্চারণে যে দ্যোতনা, তা থেকে অথচ বহুদূরে আমরা সরে এসেছি। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কিংবা প্রণালীর মধ্যে অখন্ডভারতীকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

টিপ্পনী

এরপরেই প্রাবন্ধিক স্বাধীনতা উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবভাবনা কোনো ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি, শিক্ষার মহতী উদ্দেশ্য কীভাবে আরও জটিলতার হয়ে উঠল, তার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন, 'ভারতী এখন দ্বিধা - বহুদা - বিদীর্ণ, ... চূর্ন - বুইচূর্ণ - পরস্পরের প্রতি বৈরিতায় .... একাধিক ভারতবর্ষে বিরাজ করছি। শিক্ষার আদর্শও তাই কোনো স্থির কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকতে এখন অসমর্থ।" শিক্ষার প্রাঙ্গণ এখন রণক্ষেত্রে পর্যবসিত। অপাপবিদ্ধ শিশুরা শিক্ষাক্ষেত্রে এসে যেন ত্রাসের আবর্তে খাবি খাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আনন্দের কথা বলেছিলেন তা আমরা যেন ভুলে যেতে বসেছি। শিক্ষার সাথে আনন্দের আজ কোনো সম্পর্ক নেই।

শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করার যে প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছিলেন সেটাও স্বাধীনতা উত্তরকালে ভিন্ন আদল পেয়েছে। জীবনের প্রয়োজনে শিক্ষা - রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আজ অপ্রাসঙ্গিক। আজ শিক্ষা কেবলই আমাদের জীবিওকায় স্থিত হতে সাহায্য করে। শিক্ষার সঙ্গে এখন বৃত্তির ব্যবহারিক ও ব্যবসায়িক গাঁটছড়া। অধ্যায়ন এখন উপলক্ষ্যে পর্যবসিত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আনন্দ নির্বাসিত হয়ে আতঙ্ক এসে হাজির হয়েছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন আগে দেশ পরাধীন ছিল, শিক্ষাকে বর্ণময় ও ফলপ্রসূ করে তোলকার অনেক বাধা ছিল। এখন তো আর পরাধীনতার দোহাই দেওয়া যাবে না, অনেক সুযোগ পেয়েও সদব্যবহার করা হয়নি শিক্ষাক্ষেত্রে। প্রাবন্ধিক বলেছেন, "বিগত পঁয়তাল্লিশ বছর জাতীয় নেতাদের ইচ্ছা - অনিচ্ছার প্রচ্ছায়ে অবারিত সুযোগ নিহিত ছিল, দেশে প্রাকৃতক সম্পদের প্রাচুর্য, প্রতিভাবান - প্রতিভাসবতীর প্রকট অভাব সেদিনও ছিল না, আজও নেই; .....স্বাধীনতা উত্তর মূহূর্তে সর্বস্তরের সর্ব অঞ্চলের নাগরকদের হিতসাধনের যে অঙ্গীকারকে রষ্ট্র - কর্তৃক সর্বোচ্চ অধিকার বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, শোষণহীন ব্যবস্থার, সকলের কাছে সবরকম সুযোগ সমানভাবে পৌঁছে দেওয়ার যে পূর্বশর্ত বারবার উচ্চারিত হতো তখন, আজ তা ফিকে মিলিয়ে গেছে।"

এই সমস্যার সমাধানের পথ একমাত্র দেশের আর্থিক প্রগতি। আর্থিক বঞ্চনা ও

টিপ্পনী

অভাবগ্রস্ততা দূর করে ফেলতে পারলেই এত অসাম্য ও অসন্তোষ আর থাকবে না। কিন্তু এই আর্থিক প্রগতির জন্যেও দরকার রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শণ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শণ স্বনির্ভরতার কথা বলে। কিন্তু আশচর্যের বিষয় সেই স্বনির্ভরতাও আজ দূর্বল। সাগ্রিক জাতিয়সম্পদের সুপরিকল্পিত ব্যবহার ঘটলে, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদদের সুপরামর্শ মিললে দেশের নব্বই কোটি মানুষের পরিশ্রমে দেশ "একটি সুখী, সচ্ছল, সাম্যমুখর আর্থিক ব্যবস্থায়" উত্তীর্ণ হতে পারত। কিন্তু দেখা গেছে দেশ স্বাধীনতাচর পরে 'স্বনির্ভয়তার প্রাথমিক শর্তগুলি রাষ্ট্রনায়করা সর্বপ্রান্তরে মানুষের মধ্য ছড়ীয়ে পড়েনি । সমাজ সচেতনতা য়ৃদ্ধি পায়নি, মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি পায়নি, মানুষেদর উৎপাদনে - উৎসাহেও তাই ভাটা পরিলক্ষিত সর্বত্র। দেশ তখনই প্রগতিশীল হয়ে যখন প্রতিটি শ্রেণীর কাছে আমরা স্বাক্ষরতার জাদুমন্ত্র ছড়ীয়ে দিতে পারবো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা বিষয়ক নানা প্রবন্ধে এই কথাগুলিই বলতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, যেকোনো জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে মনুষ্যত্বার মহিমা প্রতিষ্ঠার উপর। কিন্তু তার জন্য দরকার শিক্ষাকে সর্বত্রগামী করা, ধনী-দরিদ্র দ্রাবিড় - মুসলিম - খ্রিষ্টান উচ্চবর্গীয় - নিম্নবর্গীয় সকলের কাছেই শিক্ষার সুযোগ সমমাত্রায় পৌঁছেদেওয়া। রুশ দেশে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মোহিত হয়েছিল, সে দেশে শিক্ষার সুযোগকে অবাতিরদ্বার করে দেওয়ার কারণেই।

প্রাবন্ধিক অশোক মিত্র তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনাকে সমর্থন করে বললেন, "গোটা জাতিকে যদি মাথা তুলে দাঁড় করাতে হয়, তবে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিকার দিতেই হবে।" রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় শিক্ষাদান হওয়া উচিত মাতৃভাষায়। প্রাবন্ধিক এখানেও সেই রবীন্দ্রনাথকেই সমর্থন করে বললেন "যদি সকলের জন্য শিক্ষা জাতীয় উদ্দেশ্য হয়, তা হলে প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষার মুখাপ্রেক্ষিতার বিকল্প নেই।" রবীন্দ্রনাথই তাই স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের বহু সমস্যার একমাত্র সমাধান। প্রাবন্ধিক তাই বলেছেন, "আমি সবিনয়ে অনুরোধ করবো তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে যদি অনুগ্রহ করে আর একবার চোখ বুলান।" হতদরিদ্র দেশে শিক্ষাকে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে গেলে শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে সরলতা অবলম্বন করতে হবে। যতটা সম্ভব বভয়কে সংকুচিত করতে হবে। বিদ্যালয় নির্মাণ কার্য বভায়বহুল কার্য। তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনাই এখানে পরম আশ্রয়। ভৌগলিক পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করে খোলা আকাশের নীচে গাছের স্নেহস্নিগ্ধ ছায়ায় বিদ্যাদানের বভবস্থাই শিক্ষাদানকে ব্যায়সংকোচ করতে সাহায্য করবে। রবীন্দ্রত্তর ভারতবর্ষের যে শিক্ষাসমস্যা তার সমাধান রবীন্দ্রনাথই।

আজকের ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বিষময়। নৈরাজ্যের কালো হাতের থাবায় নিষ্পেষিত শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাকে প্রেক্ষাপটে রেখে জীবনা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার ধূর্ত ও কুটিল চতুরালি চলছে চারদিকে। শিক্ষা গ্রহণ মহান ব্রত। তার সাথে বৃত্তির ঠিক খাপ খায় না। কিন্তু এটাও ঠিক কর্মহীনতা কোটি কোটি ভারতবাসীর কাছে একটা অভিশাপ। শিক্ষার ব্রত ও বৃত্তির এই দ্বিমেরুর সহাবস্থান রবীন্দ্রনাথেই মেলে।শিক্ষাকে আনন্দের সথে গ্রহণ করে স্বনির্ভর হওয়াই একমাত্র উপায় এখানে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের যে শিক্ষাসমস্যার কথা প্রবন্ধিক বলেছেন, তার চমৎকার সমাধান রবীন্দ্রনাথেই মেলে। প্রাবন্ধিক তাই বলেছেন-

> "রবীন্দ্র ভারতীয় মতো শত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে স্নাতককুল চোখে স্বপ্নের অঞ্জন মেখে জীবনের পূর্বপ্রান্তে প্রতিবছর জড়ো হচ্ছেন, তাঁর ব্রতের সঙ্গে তাঁদের বৃত্তির সন্তোষজনক কোনো সংশ্লেষণ যদি ঘটাতে চাই, কর্মহীনতার অভিশাপ থেকে কোটি কোটি দেশবাসীকে যদি উদ্ধার করত চাই, রবীণ্দ্রনাথ নোইর্দেশিত আদর্শেই আমাদের স্থিত হওয়া প্রয়োজন।"

পরিশেষে প্রাবন্ধিক পরোক্ষভাবে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনাকে উপলব্ধি করতে হৃদয়কে প্রসারিত করা দরকার।আজকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের imput করা একপ্রকার invesmkent। এখানে সমানুপাতিক হারে output এর প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু এভাবে বস্তুবাঈ দৃষ্টিকোণে রবীন্দ্রনাথেদর 'শেষসপ্তক' কাব্যগ্রন্থের একটি বিশেষ কবিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। একটি সাঁওতাল মেয়ে রোজ ঝর্ণাতলায় যায় জল ভরবার উদ্দেশ্য নিয়ে। যথা নীয়মে কলসী স্থাপন করে। কলসীটি খুব ছোট মাপের - মুহূর্তের মধ্যে ভরে গিয়ে জল উপচে পড়ে। মেয়েটি আনমনা হয়ে তা দেখে, প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়। পাড়ায় যখন ফেরে কেনো বিলম্ব হল সেই প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়। কিন্তু এই "উপচে - পড়া জলের কথা তো তাদের বোঝা অসাধ্য"। প্রাবন্ধিক তাই বলেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন চর্চাও এই উপচে পড়া জলের কাহিনী। একটু অপচয় না ঘটলে মহত্ত্ব আমাদের অধরা থেকে যাবে।"

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টিতে নারী : আনিসুজ্জামানের

একবিংশ শতাব্দীর বাঙালি জাতি নারীর য সমানাধিকারেদর কথা উচ্চারণ করে তা উনিশ শতক জুড়ে দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল। উনিশ শতকের কিছু পাশ্চাত্য শিক্ষায়

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

টিপ্পনী

শিক্ষিত কুসংস্কার মুক্ত মানবতাবাদী বাঙালির প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গোটা উনিশ শতক জুড়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালির যে লড়াই তার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন আনিসুজ্জামান তাঁর উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙ্গালির দৃষ্টিতে নারী' প্রবন্ধে। প্রাবন্ধিক সুবিধার্থে উনিশ শতক নয়, আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্ব ভারতচন্দ্রের কাল থেকে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। প্রাবন্ধিক 'অন্নদামঙ্গল' - এর প্রসঙ্গ ধরে বলেছেন - অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যাবে যে শারীরিক মিলনের কথা উত্থাপিত হয়েছে তাতে নারীর মহিমা নেই , বরং নরীকে কামনার মূর্তিরূপে দেখা হয়েছে - "কামসূত্ররূপেই অন্নদামঙ্গল আদৃত হয়েছিল" । নারী সে যুগে ভোগ্যবস্তু। নারীকে পণ দিয়ে কিনতে হয়, নারী ভোগ ছাড়া জীয়ন অতিবাহিত করা অসম্ভব -

"মরি তাতে দুখ নাই নারী রৈল কোন ঠাই
বিধাতা ফেলিল একি ফাঁদে।।
কুড়ি টাকা পণ দিয়া নূতন করিনু বিয়া
এক দিনো শুতে না পাইনু।

অর্থাৎ স্পষ্ট বোঝা যায় নারীর অর্থ আঠারো শতকে নারীর পাশে শয়ন করার মনোবাঞ্ছা। পুরুষদের এই ভোগাকাঙ্খা থেকে একাধিক বিবাহের প্রবতাও দেখা দিত। প্রসঙ্গত মুসলমানদের নারীবভাবনা ও হিন্দুদের নারীভাবনার পার্থক্য ও উল্লেখ করেছেন প্রাবন্ধিক। মুসলমান মেয়েরা বহুবিবাহ করতে সক্ষম, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে সেকালে বহুবিবাহ নেই, এমনকি বিধবা - বিবাহ নেই। অন্নদামঙ্গলে ভবানন্দ মজুমদার "স্বামী ত্যাগ করে আরেকজনকে বিয়ে করা কিংবা বিধবার বিবাহ - নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন।" সেই সাথে সেকালে সহমরণ প্রথার চল ছিল। ভবানন্দের মূজুতে তাঁর দুই পত্নী সহমৃতা হয়েছিলেন।

আঠারো শতকের এই হিন্দুনারী সম্পর্কিত সামাজিক মনোভাব - সতীদাহ প্রথা, বিধবাবিবাহের অপ্রচলণ ও নারীকে ভোগ্যবস্তুরূপে দেখা উনিশ শতকেও জারি রইল। কিন্তু উনিশ শতকে কিছু শক্ষিত মানবতাবাদী মানুষেদর প্রচেষ্ঠায় এই মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠল। সচতীদাহ প্রথা নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন রামমোহন রায়। তবে রামমোহনের পূর্বেও কিছূ শিক্ষিত মানুষ সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে মত দেন। আলেকজান্ডার ডাউ তাঁর 'The History of Hindostan' (1972) এ বলেছিলেন যে সহমরণের মতো অমানবিক প্রথা কিছুতেই চলতে দেওয়া উচিত নয়। উইলিয়াম কেরী সতীদাহ প্রথাকে

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে আখ্যা দেন। পন্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পৌত্র পন্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা শাস্ত্র বিচার করে বলেন যে 'শাস্ত্র - অনুযায়ি' কখন সহমৃতা হওয়া যায়, কখন হওয়া যায় না।' ১৮১৮ সালে রামমোহন রায় লিখলেন সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ'। রামমোহন সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে লিখলেন, " ..... বাংলাদেশের বাইরে বন্ধনাদি দ্বারা সতীদাহ কোথাও প্রচলিত নয়; বাল্যকালাবধি পশুহত্যা দেখার ফলে তাদের মরণকালীন কাতরতা যেমন শাক্তদের চিত্ত স্পর্শ করে না, তেমনি দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হওয়ার সতীর মৃত্যুকালীন আর্তনাদ আমাদের দয়ার উদ্রেক করে না।" শুধু তাই নয়, স্ত্রীলোককে সমাজে অবজ্ঞার চোখে দেখা হত। স্ত্রীলোক সেকালে অল্পবুদ্ধি, বিশ্বাসের অপাত্র ধর্মজ্ঞানশূন্য বলে পরিগণিত হত। কিন্তু রামমোহন ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় পুস্তকে বললেন:

প্রথমত, বুদ্ধির বিষয় স্ত্রিলেকের বুদ্ধির কোন কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পোবুদ্ধি কহেন ? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যাক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রিলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাআরা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?

রামমোহনের এই যুক্তিবাদী ও মানবিক দৃষ্টিকোন সেকালের সমাজের কাছে চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল। এমনকি সেকালের কিছু শিক্ষিত মানুষও প্রচলিত দেশাচার, সতীর ইচ্ছা, পারলৌকিক লাভ ইত্যাদি কুসংস্কারে আস্থা রেখেছিলেন। তাঁরা প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে আসতে পারেননি। যেমন প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'রামারঞ্জিকায় (১৮৬০) সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার কত পরেও সহমরণ বিষয়ে গৌরব প্রকাশ করেছেন।

১৮২৯ - এ সতীদাহ প্রথা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে বিধবাবিবাহের প্রশ্নটা সামে চলে এল। আঠারো শতকের শেষ দিকে ঢাকার রাজা রজবল্লভ সেন নিজের মেয়ের বৈধব্যযন্ত্রণা দেখে বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি তাই বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য পন্ডিতদেদর কাছে শাস্ত্রীয় বিধান চেয়েছিলেন। উনিশ শতকে নবদ্বীপের আরেক রাজা শ্রীশচন্দ্র রায়ও বিধবাবিবাহ প্রচলনে ইচ্ছুক হন। রামমোহনের আত্মীয়সভার সদস্যরা বালবিবাহ ও বালবৈধব্য নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়েদর তরুণের বিধবাবিবাহ নিয়ে লেখালিখি শুরু করে। ১৮৩৭ সালে ভারতীয় ল - কমিশন বিধাবিবাহের অনুকূলে আইন পাশের বিষয়ে মত প্রকাশ করে। ১৮৪২ সালে ইয়ংবেঙ্গলের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মুখপাত্র 'বেঙ্গলস্পেক্টেটর' বিধবাবিবাহের অনুকূলে শাস্ত্রীয় প্রমান দিতে থাকে। এ নিয়ে 'সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সাথে তর্কযুদ্ধ লেগে যায়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ছিলেন। তিনি সহমরণের পক্ষে থাকলেও বিধবাবিবাহের পক্ষে মত দেন। তবে বিধবাবিবাহ নিয়ে ১৮৫৫ সালে যথার্থ আন্দোলন গড়ে তোলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবিচার - পরাশরবচনের ভিত্তিতে দাবি করেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। তিনি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবে (১৮৫৫) বলেন "বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত"। বিদ্যাসাগর শুধু এইটুকুই বলে ক্ষান্ত হননি, বৈধবযন্ত্রনার প্রতি সহমর্মীতাও দেখিয়েছেন। ঐ গ্রন্ধের দ্বিতীয় পুস্তকে (১৮৫৫) বলেন, "হা অবলাগণ ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, চলিতা পারি না!" প্রাবন্ধিক আনিসুজ্জামান বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলেছেন :

বিদ্যাসাগর শুধু লিখে ক্ষান্ত হননি, তিনি আন্দোলন করেছেন,ন সরকারকে দিয়ে আইন পাশ করিয়াছেন, এজন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন এবং বিধবাবিবাহ দিয়ে পাত্রপাত্রীর ভরণ - পোষণের ভার নিয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে প্রাবন্ধিকের এটি একটি অতিসংক্ষেপে যথার্থ মূল্যায়ন। বিদ্যাসাগর যে দয়ারসাগর তার প্রমাণ এই সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ার ঘটনায়। তবে বিধবাবিবাহ আইন স্বীকৃতি পাওয়ার কুফলও লক্ষ করা গেল। কেউ কেউ বিধবাবিবাহের নামে বহুবিবাহ করে বসল। তাছাড়া বিধবাদের সামাজিক সম্মান লাভ করতে অনেক সময় লেগেছিল। বিধবা মাত্রই ভ্রষ্টা, বাঁড় শব্দ মূলে বিধবা বোঝাতো - তা একই সঙ্গে বেশ্যারূপেও পরিগণিত হত। অনেক শিক্ষিত বাঙালিও বিধবাবিবাহের আইন স্বীকৃতির পরেও বিধবাবিবাহ নিয়ে সঙ্কোচ ও দ্বিধাবোধ দেখিয়েছেন। তার প্রমাণ মেলে বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) উপন্যাসের কুন্দনন্দিনী, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাসের রোহিনী।

সহমরণ ও বিধবাবিবাহের মত বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ উনিশ শতকের বাংলাদেশের আরও দুটি প্রধান সামাজিক সমস্যা। অষ্টবর্ষে গৌরিদান, নবম বর্ষে পৃথ্বিদান, দশম বর্ষে পবিত্রলোক প্রাপ্তি ইত্যাদি বাল্যবিবাহের পুরোনো প্রথা বেশ ভালোভাবেই চলে আসছিল। বাল্যবিবাহ বৈধব্যযন্ত্রণা সৃষ্টি করে। আর বিধবাবিবাহ আইনস্বীকৃতি পাওয়ার পর বহুবিবাহের কুফল তরান্বিত হয়।বাল্যবিবাহ নিয়ে ইয়ংবেঙ্গল ও শিক্ষিত সমাজে তর্ক তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু বিরুদ্ধাপক্ষের প্রবল চাপে সেই তর্ক স্তিমিত হয়ে পড়ছিল। তবুও তারই মধ্যে "আইন করে মেয়েদের জন্যে সহবাস সম্মতির বয়স ১৮৬০ সালে দশ বছর ও ১৯৮১ সালে

বারোবছর বলে স্থির করা হয়।" কৌলিন্য প্রথার সামাজিক ভিত্তি বহুবিবাহ। শাস্ত্র অণুযায়ী কুলীনকে স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে হয় না। আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে একজন কুলীণ দু - তিন শর অধিক বিবাহ করতেন। এই বহুবিবাহের কুফল ভোগ করতে হত কুলীনের স্ত্রীদের। তাদের পিতামাতার গলগ্রহ হয়ে থাকতে হতো, দাসীবৃত্তি করতে হত, কখনো কখনো বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করত হত। কৌলীন্যপ্রথার এই কুফলের কথা চিত্রিত আছে রামায়ণ তকডরত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকে।

বহুবিবাহ নিয়ে ইয়ংবেঙ্গলরাই প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু করে ১৮৩০ সালে। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রযত্নে প্রকাশিত 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা ১৮৪২ সালে বহুবিবাহ প্রথার বিরোধী জনমত গড়ে তোলে।এই সময় গড়ে ওঠে বহুবিবাহ বিরোধী বহু সমিতি। এইসব সমিতির পক্ষ থেকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কাছে বহুবিবাহ নিরসনের জ্য ১৮৫৫ সদালে আবেদনও করা হয়। ১৮৫৫ সালেই বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। বিধবাবিবাহের প্রচলন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধের জন্য ব্রাহ্মসমাজেদর সদস্যরাও এগিয়ে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় রাজনারায়ন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা। বঙ্কিম ও বহুবিবাহ প্রথার বিরোধী। তিনি বঙ্গর্শন এ একবার বলেছিলেন "বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জ্জনীয় এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এদেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।" উনিশ শতকে স্ত্রীলোক সম্পর্কিত ধ্যানধারনা বদলে অনেকেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেলন। হিন্দুবিবাহের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে উনিশ শতকের শেষের দিকে আলোচনা প্রকাশ পাচ্ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় চন্দ্রনাথ বসুর কথা। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৭ সালে লিখলেন 'হিন্দুবিবাহ' পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ মনুসংহিতার উদ্ধৃতি তুলে বলেছেন "শয্যা , আসন, অলংকার, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা ও কুৎসিত আচার স্ত্রিলোক হইতে হয়..... ।" তবে এই উদ্ধৃতি মনুসংহতির, রবীন্দ্রনাথেরনয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন "স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে যাহাদের এরূপ বিশ্বাস তাহারা স্ত্রীলোককে যথার্থ সম্মান করতি অক্ষম।" রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন," বিবাহের যত কিছু আদর্শের উচ্চতা সে কেলমাত্র পত্নীর বেলায়, পতিকে সে আদর্শ স্পর্শ করিতেছে না।"

এরপরেই প্রাবন্ধিক নারীশিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। নারীর ভূমিকা সেকালে ছিল বিবাহে ও সন্তানপালনে। লেখাপড়াটা ছিল গৌণ। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী যে কতখানি অন্ধকারে ছিল তার প্রমাণ মেলে ১৮২৪ সালে গৌরবমোহন বিদ্যালঙ্কারের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' (১৮২২) পুস্তিকায় তৃতীয় সংস্করণে "দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথোন" অধ্যায়ে:

(১) সেকালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে লেখা পড়া যদি স্ত্রীলোক করে তবে সে বিধবা হয়।

(২) স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কার্য রাঁধাবাড়া ছেলেপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষ করিবে।

রাসসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন' (১৮৬৮) বইতেও স্ত্রীলেকের শিক্ষা বিষবে নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ করা যায়। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'রামারঞ্জিকায়' (১৮৬০) পদ্মাবতী তাঁর স্বামীকে বলেন, "মেয়ে মানুষ লেখা পড়া শিখে কি করবে? সে কি চাকরি করে টাকা আনবে?" অশিক্ষার অন্ধকারে থাকতে থাকতে নারীরাই মেনে নিয়েছে লেখাপযা তাদের কাজ নয়। তাদের কাজ বিবাহে ও সন্তান পালনে।

স্ত্রি শিক্ষার ব্যাপারে একটা বড় কৃতিত্ব অবশ্যই রাধাকান্ত দেবের। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপতী ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করে বালিকাদের পড়াশোনার জন্যে পাঠাতে পারেননি। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৫৯ সালে হিন্দুবালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, পরে সেটির নাম হয় বেথুন স্কুল। মদনমোহন নিজের দুই মেয়েকে শিক্ষার জন্য ঐ স্কুলে পাঠান। সেকালে নারীশিক্ষার বহু অন্তরায় ছিল। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার মতে নারীশিক্ষার প্রধান অন্তরায় গৃহকর্ম ও রান্নাবান্না। এছাড়া আরও পাঁচটি অন্তরায়ের কথা বলেছে - (১) স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, (২) বাল্যবিবাহ (৩) অল্প চেতনের শিক্ষক (৪) বিবাহ উত্তর শ্বশুরবাড়িতে শিক্ষার পরিবেশ না পাওয়া (৫) গৃহকর্ম ও রান্নাবান্নায় মনোনিবেশ। নারীশিক্ষার অগরগতির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা অপরিসীম। রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র মেয়েদের জন্য ১৯৫৪ তে প্রকাশ করলেন 'মাসিক পত্রিকা'। উমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৬৩ তে প্রকাশ করলেন 'বামাবোধিনী' পত্রিকা। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৫ তে স্থাপন করলেন ব্রাহ্মিকা সভা। স্ত্রীদের সংসারের যে অবরোধ প্রথা তাকে ভঙে দিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন। এছাড়া ১৮৭৮ এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া উনিশ শতকের নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে একটা উল্লেখযোগ্য সোপান।

প্রবন্ধটির সমাপ্তিতে প্রাবন্ধিক উনিশ শতকের দীর্ঘ আন্দোলনে নারীরা যে সুফল

পেয়েছেন তার পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক মূলত উনিশ শতকের শেষ চার দশকের ও বিংশ শতকের ডকুমেন্টগুলি নমুনারূপে ব্যবহার করেছেন। কেশবচন্দ্র দম্পতি ও সত্যেন্দ্রনাথ দম্পতি দাম্পত্য সম্পর্কের নতুন বিন্যাস দিয়েছিলেন। তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। নারীর নতুন ভাবমূর্তি ও দাম্পত্য সম্পর্কের নতুন দিকের সূত্রপাত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তার প্রমাণ মধুসূদনের 'মেঘনাথবধ আব্য' (১৮৬০) ও 'বীরাঙ্গণা কাব্য' ৯১৮৬২)। নারীর চন্দনা মিলন বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০) ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' (১৮৮০) কাব্যে। বঙ্কিমের উপন্যাসেও প্রনয় ও দাম্পত্যের নতুন আদর্শ গৃহীত হল। 'দুর্গেশনন্দিনী'র আয়েষার উক্তি প্রসঙ্গত স্মরণীয় - "এই চন্দী আমার প্রাণেশ্বর"। কৃষ্ণকান্তের উইল এর স্বামীর উদ্দেশ্যে বলা ভ্রমরের উক্তিটি স্মরণীয় - "যতদিন তুমি ভক্তি যোগ্য ততদিন আমরও ভক্তি।" রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসের কুমুদিনীর মনেও জেগেছিল নতুন উপলব্ধি - "স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন্ জাতের লোক?" পরিশেষে প্রাবন্ধিক বলেছেন বর্তমানে "সংসার থেকে রাজপথ পর্যন্ত নারীর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। শীক্ষা, চিকিৎসা ও সেবার জীবিকায় সবে তাঁরা যোগ দিয়েছেন ; সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে এসেছেন ; দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করেছেন।" আজকের এই নারীর বৃহত্তর ভূমিকার মূলে আছে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির নারী - প্রগতির জন্য সংগ্রাম। নারী প্রগতির মূলে থাকা এই উনিশ শতকের সংগ্রামকে প্রাবন্ধিক একপ্রকার পরোক্ষে প্রণতি জানিয়েছেন। পরিশেষে বলেছেন নারীকে মানুষ হিসাবে ভাবতে হবে। পরিবর্তন করতে হবে দৃষ্টিভঙ্গীর। নাহলে "ইতিহাসের চাকা পেছনে ঘুরিয়ে দিতে উন্মুখ' ব্যাক্তির কিছু অভাব নেই।"

টিপ্পনী

প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী :

ক. শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা - প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু আলোচনা কর।

খ. শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা অর্ধেক দেসদিমোনা - ব্যাখ্যা করো।

গ. শকুন্তলা এবং দেসদিমোনা দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া এবং অতুলনীয়া - আলোচনা কর।

ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাংলার রেনেসাঁস - প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ লোখো।

ঙ. 'শব্দের পবিত্র শিখা' প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ যে মতাম ব্যক্ত করেছেন তা আলোচনা করো।

চ. নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টিই কবির অভিপ্রায় শব্দের নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষের অভিপ্রায় আলোচনা কর।

ছ. শব্দকে ধরে রাখে তার ছন্দ বা স্পন্দন অথবা একই সঙ্গে বলা যাক ছন্দস্পন্দ - এই বিষয়টি আলোচনা করো।

জ. কাজী আবদুল ওদুদের 'বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সম্ভার' গ্রন্থের সারকথা নিজের ভাষায় লেখো।

টিপ্পনী

ঝ. 'রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষা সমস্যা' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক অশোক মিত্র যে সমস্যার কথা আলোচনা করেছেন তা উল্লেখ করো।

ঞ. 'উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টিতে নারী প্রবন্ধের মর্মকথা লেখো।

তৃতীয় একক : রম্যরচনা

চাচাকাহিনী : সৈয়দ মুজতবা আলী

টিপ্পনী

সৈয়দ মুজতবা আলী : জীবন ও সাহিত্য

এক অর্থে লেখকের লেখার মধ্যেই তাঁর আত্মজীবনী থাকে । লেখক তাঁর চেনা পৃথিবী থেকে উপাদান নিয়ে কীভাবে তাঁর আখ্যানের আলেখ্য গড়ে তোলেন- এ নিয়ে সাধারণ পাঠকের কৌতূহলের অন্ত নেই । লেখকের যাপিত জীবন শিল্পের আঙিনায় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমরা এও জানি, যে মানুষ দুঃখ ভোগ করেন আর যে মানুষ লেখেন তাঁরা এক নন! তবু কোনো প্রতিভাকে বুঝতে তাঁর জীবনের কাছে যেতেই হয়। বাধ্যবাধকতা নেই কোথাও, 'চাচা কাহিনী'র সূত্রে সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবন কাহিনী হয়তো আমাদের পৌঁছে দিতে পারে বহুমাত্রিক পাঠ অনুভবে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবনী লিখতে গিয়ে বেশিরভাগ আলোচক নির্ভর করেছেন মুজতবা সহোদর সৈয়দ মুর্তজা আলীর 'মুজতবা কথা'- য়। সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম ১৯০৪ খৃস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর সিলেট জেলার করিমগঞ্জ শহরে। বাবার নাম সৈয়দ সিকান্দার আলী, যিনি ছিলেন সৈয়দ আহ্মদ মতওয়াককালীর বংশধর। মতওয়াককালী শব্দের অর্থ হল যিনি আল্লাহ্র ওপর নিজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। মুজতবা আলীর মা আমতুন মান্নান খাতুন ছিলেন জমিদার মোহেসন চৌধুরীর কন্যা। ধর্মপ্রাণ পারিবারিক পরিমন্ডলে মুজতবা আলীর বেড়ে ওঠা। বাবার যেহেতু বদলির চাকরি, ১৯০৫ সালে চলে আসেন হবিগঞ্জ মহকুমার চাড়ডাঙ্গা গ্রামে। ১৯০৮- এ সুনামগঞ্জ, তারপর ১৯১২ সালে বাবার সঙ্গে মৌলবীগঞ্জে বাস করেন। ১৯১৫ সালে মৌলবীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। এর পর তাঁর বাবার আবার বদলি হওয়ার কারণে সিলেট শহরে চলে আসেন। ১৯১৮ সালে সিলেটের সরকারি হাই স্কুলে ভর্তি হলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা বিপিন চন্দ্র পাল, দেশপ্রেমিক গুরুসদয় দত্ত, শিক্ষাবিদ আব্দুল করিম প্রমুখ। ১৯১৯ সালে গোবিন্দ্র নারায়ণ সিংহের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেটে যান এবং দুদিন বক্তৃতা দান করেন 'বাঙ্গালীর সাধনা' ও ' আকাঙ্ক্ষা' বিষয়ে। বক্তৃতা শুনে কিশোর মুজতবা রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করতে গেলে কী করতে হবে প্রশ্ন নিয়ে। এরপর কী হল মুজতবা- অগ্রজ মুর্তজা আলীর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি- “ সিলেট ছাড়ার সপ্তাহ খানেক পরে আসমানী রঙের খাম ও আসমানী রঙের চিঠির কাগজে মুজতবার কাছে কবির নিজের হাতের

টিপ্পনী

লেখা জবাব এল। দশ বারো লাইনের এই চিঠির মর্মার্থ ছিল, 'আকাঙ্ক্ষা' উচ্চ হতে হবে এই কথার মোটামুটি অর্থ; স্বার্থ যেন মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গল ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ কামনাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। তোমার কি করা উচিত তা এত দূর থেকে বলে দেওয়া যায় না। তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে। " কবির এই চিঠি উৎসাহিত করেছিল সন্দেহ নেই, ১৯২১ সালে বাবা মায়ের আপত্তি উপেক্ষা করে সৈয়দ মুজতবা আলী চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। ' গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন' বইতে তিনি লিখছেন – " গুরুদেবের সঙ্গে তখন সাক্ষাত হত ইংরেজি ও বাংলা ক্লাসে। তিনি শেলি,কীটস আর 'বলাকা' পড়াতেন।" তখনকার সময় একমাত্র বিশ্বভারতীতেই ফরাসী, ফারসী, জার্মান ভাষা শেখানো হত। বহুভাষাবিদ মুজতবার ভাষাশিক্ষার শুরু এখান থেকেই। আমরা জানি বাচ্চুভাই শুক্লা এবং সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রথম স্নাতক। ১৯২৭ এ বিশ্বভারতীর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় চলে যান কাবুলে। দুশো টাকা থেকে তাঁর বেতন অচিরেই একশো বেড়ে যায়, যেহেতু কর্তৃপক্ষ আবিস্কার করেন তিনি জার্মান ভাষাও জানেন। কাবুলে তাঁর মাইনে বৃদ্ধি পেলে কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হন এবং শিক্ষামন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেন। তাদের অভিযোগ ছিল মুজতবা 'অনরেকগনাইজড্' বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারী। আর তারা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ, এম.এ। বেতনে এমন বৈষম্য অন্যায়। এর উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন-" বিলকুল ঠিক! কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, তোমাদের ডিগ্রীতে দস্তখত রয়েছে পাঞ্জাবের লাটসাহেবের। তাঁকে আমরা চিনি না, দুনিয়াতে বিস্তর লাটবেলাট আছেন- আমাদের ক্ষুদ্র আফগানিস্থানেও গোটাপাঁচেক লাট আছেন। কিন্তু মুজতবা আলীর সনদে আছে রবীন্দ্রনাথের দস্তখত,- সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি সমস্ত প্রাচ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।"(গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন) যাহোক কাবুলে থাকার সময় বিভিন্ন অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে 'দেশে বিদেশে' কিংবা' শবনম্' বই- এ। কাবুল থেকে তিনি ১৯২৯ সালে জার্মানিতে যান হুমব্লট্বৃত্তি নিয়ে। 'The Origin of the khojas and their religious life today'- এই বিষয় নিয়ে ডি.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৩ এ জার্মান থেকে ফিরে কোলকাতায় বাবা মায়ের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে ১৯৩৪ সালে অজিত বসুর সঙ্গে আবার যান ইউরোপে। মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করে দেশে ফিরে আসেন বরোদার মহারাজার সঙ্গে। ১৯৩৫-৪৪ সাল পর্যন্ত মুজতবা আলী বরোদায় অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯৪৫ সালে দেশ পত্রিকায় সত্যপীরের কলাম প্রকাশিত হতে

থাকে ধারাবাহিকভাবে। ১৯৪৮ – এ দেশ পত্রিকায় লেখেন দেশে বিদেশে'। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত এই বইটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নরসিংহদাস পুরষ্কারে সম্মানীত হয়। ১৯৫১ সালে রাবেয়া খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আনন্দবাজার পত্রিকায় সত্যপীর ও রায়পিথৌরা, এছাড়া ওমর খৈয়াম, প্রিয়দর্শী, দারা শিকো প্রভৃতি ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায় অনবরত লিখে চলেন এবং ফিচারধর্মী রম্য রচনাগুলি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়। এই সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কৈশোর থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যুক্ত থাকার সুবাদে তাঁর লেখার মধ্যে সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে। কোনও বিশেষ জায়গার অনুপুঙ্খ বিবরণ স্বাদু ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

১৯৫৫ সালের ২৪ জানুয়ারি পাটনা বেতারকেন্দ্রে স্টেশন ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দেন। দিল্লি বেতারকেন্দ্রে যোগ দেন ১৯৫৬-র মার্চ মাসে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পুরোনো কর্মস্থল বরোদায় আমন্ত্রিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। এই বছরই বিশ্বভারতীতে ইসলামি সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ও জার্মান ভাষার অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৬২-র ৭ পৌষ উৎসবে আচার্যের আসন গ্রহণ করে মন্ত্রপাঠ করেন। ১৯৬৫-র জুন মাসে বিশ্বভারতীর অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। '৬৭ পর্যন্ত বোলপুরে বাস করেন। এরপর কোলকাতায় চলে আসেন। ১৯৭০-এ শেষবার জার্মানিতে যান। সৈয়দ মুজতবা আলীর শেষজীবন কষ্টের। আর্থিক অসচ্ছলতা, অসুস্থতা সব মিলিয়ে করুণ অবস্থা। ১৯৭৩-র অক্টোবর মাসে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। নিজের হাতে লেখালেখি বন্ধ হয়ে আসে। এই বেদনাবহ জীবনেও স্বভাবসিদ্ধ রসবোধ অটুট ছিল। ১৯৭৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তাঁর জীবনাবসান ঘটে। আমরা জানি লেখকের মৃত্যু নেই। মানুষের মৃত্যু হলে যেভাবে মানব থেকে যায়, সেভাবেই আমাদের প্রাণ আলো করে রয়েছেন আখ্যানের যাদুকর সৈয়দ মুজতবা আলী।

এবারে সৈয়দ মুজতবা আলীর গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করা যাক-

গ্রন্থ	**প্রকাশকাল**	**প্রকাশক**
দেশে বিদেশে	বৈশাখ ১৩৫৬	নিউ এজ পাবলিশার্স
পঞ্চতন্ত্র	আষাঢ় ১৩৫৯	বেঙ্গল পাবলিশার্স
চাচা কাহিনী	আষাঢ় ১৩৫৯	নিউ এজ পাবলিশার্স
ময়ূরকণ্ঠী	চৈত্র ১৩৫৯	বেঙ্গল পাবলিশার্স
অবিশ্বাস্য	জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১	ঐ
পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা	বৈশাখ ১৩৬০	বইঘর, চট্টগ্রাম

টিপ্পনী

জলে ডাঙ্গায়	মাঘ ১৩৬০	বেঙ্গল পাবলিশার্স
ধূপছায়া	পৌষ ১৩৬৪	ত্রিবেণী প্রকাশন
দ্বন্দ্ব-মধুর	বৈশাখ ১৩৬৫	ঐ
চতুরঙ্গ	ভাদ্র ১৩৬৭	বেঙ্গল পাবলিশার্স
শবনম্	রাখী পূর্ণিমা, ১৩৬৭	ত্রিবেণী প্রকাশন
শ্রেষ্ঠ গল্প	অগ্রহায়ণ ১৩৬৮	বাক্সাহিত্য
ভবঘুরে ও অন্যান্য	জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯	ঐ
বহু বিচিত্র	আষাঢ় ১৩৬৯	গ্রন্থ প্রকাশ
শ্রেষ্ঠ রম্য রচনা	ভাদ্র ১৩৬৯	মিত্র ও ঘোষ
টুনি মেম	চৈত্র ১৩৭০	ঐ
প্রেম(অনুবাদ)	শ্রাবণ ১৩৭২	আনন্দ পাবলিশার্স
বড় বাবু	ফাল্গুন ১৩৭২	মিত্র ও ঘোষ
দু-হারা	চৈত্র ১৩৭২	আনন্দ পাবলিশার্স
পঞ্চতন্ত্র(২য় পর্ব)	আষাঢ় ১৩৭৩	বেঙ্গল পাবলিশার্স
হাস্য মধুর	অগ্রহায়ণ ১৩৭১	গ্রন্থ প্রকাশ
পছন্দসই	আশ্বিন ১৩৭৪	মিত্র ও ঘোষ
রাজা উজির	বৈশাখ ১৩৭৬	ঐ
শহর- ইয়ার	ভাদ্র ১৩৭৬	আনন্দ পাবলিশার্স
হিটলার	রথযাত্রা ১৩৭৭	বিশ্ববাণী
কত না অশ্রুজল	নববর্ষ ১৩৭৮	ঐ
মুসাফির	অগ্রহায়ণ ১৩৭৮	ঐ
তুলনাহীনা	বৈশাখ ১৯৭৪	ঐ
পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়	ফাল্গুন ১৩৮২	মিত্র ও ঘোষ
গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	চৈত্র, ১৩৮৮	ঐ

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

চাচা কাহিনীঃ সারসংক্ষেপ

'চাচা কাহিনী'-তে মোট এগারোটি রচনা আছে। 'স্বয়ংবরা', ' কর্নেল', 'মা-জননী', 'তীর্থহীনা', 'বেলতলাতে দু-দুবার' রচনাগুলির পটভূমি হল জার্মানি। এই গল্পগুলির কথক হলেন চাচা। 'কাফে-দে-জেনি', 'বিধবা বিবাহ', 'রাক্ষসী', 'পাদটীকা', 'পুনশ্চ'এবং 'বেঁচে থাকো সর্দি-কাশি' এই ছ'টি রচনার তিনটি রচনা ভারত, দু'টি রচনা ফ্রান্স ও একটি জার্মানির পটভূমিতে লেখা যদিও এই রচনাগুলির কথক চাচা নন। লেখক এখানে স্বয়ং কথক। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আখ্যানের আলেখ্য গড়ে

তুলেছে। 'চাচা কাহিনী'র মধ্যে কথনের দিক থেকে এই ফারাকটুকু পাঠকের রসভোগে কোনও বিঘ্ন ঘটায়নি। সৈয়দ মুজতবা আলীর অনবদ্য প্রকাশে এই রচনাগুলি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আমরা জানি কোনও গল্পে পরপর ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা থাকে, এ ঘটনাগুলি গল্পকে তৈরি করে কিন্তু গল্পের গল্পত্ব শুধুমাত্র এর ওপর নির্ভর করে না। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা রচনাগুলি সংক্ষেপে উপস্থিত করছি। মূল পাঠের সবটুকু স্বাদ পাওয়া না গেলেও এই রচনাগুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা গড়ে উঠবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

টিপ্পনী

স্বয়ংবরা :

'চাচা কাহিনী'র এই প্রথম রচনাতেই আমরা পেয়ে যাই বার্লিনের 'হিন্দুস্থান হৌসে'র কথা। এখানেই বসে তুমুল আড্ডা আর যার পুরোধা হলেন চাচা, সহযোগী ভূমিকায় আরো গুটি ছয় বাঙালি । জার্মানি দেশের এই আড্ডায় সাধারণভাবে অবাঙালিরা যোগ দিতেন না । এর কারণ চাচা স্বয়ং । এমনি বাংলায় কথা বললেও অবাঙালিরা থাকলে এমন তুখোড় জার্মান ভাষা বলতেন যে তারা সে কথার রস উপলব্ধি না করতে পেরে দুদিনেই ছিটকে যেত। একদিন 'জব্বলপুরের ঔপনিবেশিক বাঙালি' শ্রীধর মুখুয্যে বলেছিল বাঙালি বড্ড প্রাদেশিক আর পাঁচজন ভারতবাসীর সঙ্গে মিলেমিশে ভারতীয় নেশন গড়ে তুলতে চায় না। এর মোক্ষম জবাব দিয়েছেন চাচা। তাঁর মতে বাংলাদেশ প্রদেশ নয়, দেশ। অন্য প্রদেশের নেশন বলে চিৎকার করলেও বাঙালিদের তা করতে হয় না। এর পরেই পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ পুলিন সরকার বলতে চেয়েছেন অন্যান্য প্রদেশের লোক বেশি হলেও আড্ডা দিতে পারতো না কেননা আড্ডা জমাবার জায়গা হচ্ছে চণ্ডীমণ্ডপ, কাছারি-বাড়ি, বৈঠকখানা; এককথায় জমিদারী প্রথা। এই ভাবেই আড্ডার সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা টেনে আনলেন লেখক। এরপর আড্ডার সূত্রেই আমরা পরিচিত হই সূর্য রায়ের সঙ্গে, বেশিরভাগ সময় যিনি বিয়ারে ডুবে থাকতেন। এই আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলাকে উপস্থিতি লক্ষ করি আমরা। কথোপকথনে উঠে আসে যা সূর্য রায় কাউকে বিয়ের কথা দিয়ে ফেলেছেন। সূর্য রায় নারীজাতির থেকে নিজেকে সন্তর্পণে দূরে রাখতেন, তিনি যে বিয়ের ফাঁদে পা দেবেন এমন অসম্ভব কল্পনা কেউ কোনোদিন করতে পারেননি, কিন্তু সবাই যখন খুব খুশি হয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তখন চাচা 'ভাবিত' হলেন এবং এই ভাবনার হাত ধরেই আমরা পেলাম মূল গল্পের খোঁজ।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

সময়টা ১৯১৯ সাল। জার্মানিতে নাৎসীবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, চাচা সবে বার্লিনে এসেছেন। বয়স আঠারো পেরোয়নি। সাইনবোর্ডে 'গ্রেটেঙ্কে' অর্থাৎ

টিপ্পনী

পানীয় দেখে বিয়ারখানায় ঢুকে দুধ চেয়েছেন। সবাই যখন হাসছে, হিম্মৎ সিং রাস্তা রাস্তা থেকে তাড়িখানায় এলেন। চাচার সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি যখন বুঝতে পারলেন চাচা দুধের কথা বলতেই চারদিকে এত শোরগোল, তখন চাচাকে বসিয়ে একটু ক্ষণ পরে নিজেই এক গ্লাস দুধ নিয়ে এলেন। উভয়ের বন্ধুত্ব স্থাপন হল এই ঘটনার মধ্য দিয়ে। হিম্মৎ সিং নিজের আস্তানায় চাচাকে নিয়ে গিয়ে বাড়ির কর্ত্রী মিসেস্ক্রবেন্সের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। এর পরের এক মাস বার্লিন শহরের সব হোমরা চোমরা পরিবারের সঙ্গে চাচাকে পরিচয় করিয়ে দেন হিম্মৎ সিং। হিম্মৎ সিং এর সম্বন্ধে যা জানা যায় তা হল তিনি একসময় ভারতীয় ফৌজের বড় অফিসার ছিলেন। ১৪১৪-১৯১৮ সময়সীমায় যুদ্ধ বন্দী হয়ে জার্মানদের যুদ্ধ নিয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ফলে বার্লিনের সমাজের সকলের সঙ্গেই তাঁর মেলামেশা গড়ে ওঠে। হিম্মৎ সিং একসময় নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

তিন মাস কেটে গেছে ততদিনে, ফ্রাউ রুবেন্স একদিন টেলিফোন করে চাচাকে কাফেতে আসতে বলেন, চাচা সেখানে গিয়ে দেখেন বিপজ্জনক সুন্দরী ফ্রলাইন ভেরা গিব্রিয়াডফকে। ফ্রাউ রুবেন্স ভেরার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছিলেন হিম্মৎ সিং এনার সঙ্গে ছমাস ছিলেন। হিম্মৎ সিং কে যেহেতু চাচা ভালোবাসেন, তাই এই দুই মহিলা অনুরোধ করলেন ভেরার ব্যাপারে। ভেরা অত্যন্ত বিপদের কারণে মস্কো থেকে বার্লিনে পালিয়ে এসেছেন, এদিকে ভেরার পাস পোর্ট নেই। যে কোনও মুহূর্তে বার্লিন পুলিশ ভেরাকে জেলে পাঠাতে পারে, এই পরিস্থিতিতে একটাই উপায় আছে যদি চাচা এঁকে বিয়ে করেন তবে ইনি ভারতীয় অর্থাৎ ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন এবং প্যারিসে যেতে পারবেন। মাস তিনেক পর অবশ্য ডিভোর্সের মোকদ্দমা আনা যাবে। হিম্মৎ সিং এর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার একমাত্র পন্থা যদি হয় ফ্রলাইন ভেরাকে বিয়ে করা, চাচা তবে সে কর্তব্য এড়াতে চান না, এদিকে চেনা পরিচয় নেই এমন মেয়েকে বিয়ে করাই সমস্যা— পরিস্থিতি যখন জটিল হয়ে উঠেছে, চাচার আলাপ হয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্রী, হকি টিমের ক্যাপ্টেন ফ্রম্বাখেলের সঙ্গে। তিনি চাচার মুখে সমস্ত কাহিনি শুনে চাচাকে বাঁচিয়ে দেন।

চাচার কথা শুনেই তিনি চলে যান ফ্রাউ রুবেন্সের কাছে। সেখান থেকে গিব্রিয়াডফের আস্তানায় গিয়ে দুজনকেই জানিয়ে দেন যে চাচার সঙ্গে ফ্রন ব্রাখেলের বিয়ে স্থির। এসব কথা চাচা কিছুই জানতে পারেননি প্রথমে। পরে ব্রাখেল সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করেন এবং চাচা এও বুঝতে পারেন যে মস্কোতে এ গিব্রিয়াডফের বাড়িতে হিম্মৎ সিং কখনও বসবাস করেননি। গিব্রিয়াডফ বর নয়

একজন শ্রীখণ্ডী খুঁজছিল, যার আড়ালে সে ব্যভিচার চালাতে পারে।

চাচা এইভাবেই বোকা বনে যাবার গল্প করলেন। গোলাম মৌলা শেষ ট্রেনের সময় মনে করিয়ে দিলেন। সবাই আড্ডা ভেঙে দৌড় দিলেন স্টেশনের উদ্দেশ্যে। প্রথম গল্পটি থেকেই আমরা 'চাচা কাহিনী'র বৈঠকি মেজাজকে চিনে নিতে পারি।

কর্নেল :

এই রচনার প্রথমেই আমরা পাই হিন্দুস্তান হাউসের কথা । লেখক এই রেস্তোরা খোলার প্রসঙ্গেই নিয়ে এসেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দার কথা। চাচাও আড্ডায় বলছিলেন জার্মান মুদ্রা মার্কের মূল্য হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি। সেই সর্বনাশের সময়ে খুব অল্প দামে জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল। আড্ডার সবাই যখন সেই 'সর্বনাশী পৌষ মাস' নিয়ে ভাবছেন, চাচা তখন বিবৃত করতে লাগলেন তাঁর কাহিনি। দেশের দুর্দিনে বৈদেশিক মুদ্রার আশায়, নিজেদের সংসার চালাবার তাগিদেই বিদেশী পেয়িং গেস্ট রাখতে চাইত স্থানীয় মানুষেরা। এমন সময় ফ্রলাইন ক্লারা ফন্ব্রাখেল তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের পরামর্শ দেন। অবশ্য তাকে জানাতে হবে যে, চাচা তাঁর কাছে জার্মান ভাষা শিখতে চান তাই তাঁর বাড়িতে এসেছেন। কেননা এক কালে বড়লোক, অভিজাত এই কর্নেল কিছুতেই পেয়িং গেস্টের প্রস্তাবে রাজি হবেন না। যাহোক, চাচা কর্নেল ডুটেনহফারের বাড়ি পৌঁছুলেন, বাড়ি নয় যেন রাজপ্রাসাদ। কিন্তু সর্বাঙ্গে অভাবে ছাপ। আসবাব নেই। দরজা জানলায় পর্দা পর্যন্ত নেই। খাবার পাতে ফ্রাউ ডুটেনহফার জানালেন কর্নেলকে যে চাচা জার্মান ভাষা বলতে পারেন, সে কথার পর কর্নেল আর কোনও দিন ইংরেজি বলেননি। মিলিটারি কায়দায় লেখাপড়া শুরু হল। পড়ার শর্ত ছিল তিনি কোনও পারিতোষিক নেবেন না এবং পড়া তৈরি হোক বা না হোক চাচা কামাই করতে পারবেন না। এক বছর তিনি চাচাকে গ্যেটে পড়িয়েছিলেন। জার্মান দৃষ্টিবিন্দু দিয়ে ইউরোপের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস সুন্দরভাবে পঠিত হল। পুরো একবছর রোজ দুঘন্টা করে চাচা এই গুণীর সাহচর্য পেলেও তাঁর জীবন বা পরিবার নিয়ে একটি কথাও শুনতে পারেননি। তবে চাচা বুঝতে পেরেছিলেন কর্নেল প্রাশান কৌলীন্য নিয়ে গর্বিত। এবং রক্তসংমিশ্রণ ঠেকাতে তিনি প্রাণবিসর্জন দিতেও রাজি! একদিন কথায় কথায় কর্নেলের স্ত্রীর থেকে চাচা জানতে পারেন যে তাঁদের ছেলে ফ্রান্সের লড়াইয়ে মারা গেছে।

কর্নেলকে দেখে বোঝা যেত না পুত্রশোক । চাচা একদিন কলেজ থেকে ফিরছেন, দেখলেন এক যুবতী অঝোরে কাঁদছেন। কর্নেল শিশুসন্তান কোলে তাঁর কন্যাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন চাচা। এদিকে ঘরে এসে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দেখেন যে ঘর ছাড়ার নির্দেশ। চাচা পরদিন সকালবেলায় ডুটেন্ফারদের বাড়ি ছাড়লেন। আড্ডার সবার কৌতুহল যে মেয়েটির কী দোষ ছিল। চাচা তারপর বললেন যে একবছর পর তিনি কর্নেলের শেষকৃত্যে অংশ নিতে গিয়ে শোনেন যে, কর্নেলের মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে বিয়ে করেছিলেন, যিনি জাতিতে ফরাসী। আমরা বুঝতে পারলাম যে জার্মান জাতির বিশুদ্ধতার প্রশ্নে কর্নেল নিজের মেয়েকে ছাড় দেননি। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে নাৎসিদের মতই তিনিও বর্ণ সঙ্করের বিপক্ষে ছিলেন। আর এর জন্য নিজের প্রাণও প্রকারান্তরে বিসর্জন দিলেন। এই গল্পটির মাধ্যমে লেখক জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের এক রকমের সমালোচনা তৈরি করলেন কর্নেল চরিত্রের পরিণতি দেখিয়ে।

মা- জননী :

'চাচা কাহিনী'- এর বাকি দুটি রচনার মতো এ গল্পও আমরা পাই 'হিন্দুস্তান হৌসে'র আড্ডা থেকেই। জমাটি আড্ডায় লাজুক গোলাম মৌলা তাঁর ল্যান্ডলেডি ও তাঁর মেয়ের ঝগড়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই আড্ডার সবাই বিষয় পেয়ে যায়। একদল বলেন বাচ্চার জন্য ভালোবাসা অনুন্নত সমাজেই পাওয়া যায় বেশি আবার অন্যেরা বলেন, ভারতের একান্নবর্তী পরিবার সভ্যতার পরাকাষ্টা আর তা অবলম্বন করে আছে মা- জননীকে। চাচা বলতে থাকেন জার্মানির বেশিরভাগ ল্যান্ড লেডিই বিধবা। কুরুক্ষেত্রের শত বিধবার রোদনের কথা নিয়ে আসেন চাচা। এরপর তিনি বাৎসল্য রসের একটি গল্প আড্ডায় পরিবেশন করেন।

আমরা 'কর্নেল' গল্পে চাচার বাড়ি ছাড়ার কথা জেনেছিলাম। যাহোক এরপর চাচা কোথায় থাকবেন এ নিয়ে কিছু ভেবে উঠতে পারছিলেন না, এমন সময় আবার মুশকিল আসান হয়ে আসেন ফন্ত্রাখেল। ক্লারা বললেন পয়সা কামাতে হলে তিনি বন্দোবস্ত করে দিতে পারবেন। এক 'হঠাৎ- নবাবে'র ছেলের যক্ষা হয়েছে। একজন সঙ্গীর দরকার। থাকা খাওয়ার সঙ্গে ভালো মাইনে দেবে। টেলিফোনে যোগাযোগ করে চাচা পৌঁছে গেলেন রাইনল্যান্ডে। কর্তা গিন্নির সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনার পর চাচা রোগাক্রান্ত কার্ল- এর ঘরে গেলেন। ঘরে আরেকটি প্রাণী উপস্থিত ছিলেন তিনি হলেন রোগীর নার্স। মেয়েটির নাম সিবিলা। সে সমস্ত প্রাণ দিয়ে কার্লকে আগলে রাখছে। মাঝেমাঝে সিবিলা উদাসীন হয়ে যান, চাচা লক্ষ্য করেছেন। হঠাৎ একদিন বাড়ির গিন্নি চাচাকে জানালেন যে সিবিলা অন্তঃসত্ত্বা ও অবিবাহিতা। গিন্নির অনুরোধে চাচা সিবিলার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলেন। সিবিলা টেবিলের ওপর মাথা রেখে অঝোরে কাঁদছিল। কর্তা গিন্নিও আন্তরিকভাবে সিবিলার বিপদ সম্বন্ধে ভাবছিলেন। স্থির হল যে সিবিলা কাজ করতে থাকুক, প্রসবের সময়ে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হবে।

এরপর সিবিলার বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হল। যেন একমুঠো জুঁইফুল! কিন্তু এবার আরেক বিপদ ঘটল। সিবিলা কিছুতেই তার বাচ্চাকে অনাথ আশ্রমে দিতে রাজি নয়। তার ইছে কোনও পরিবারে থেকেই তাঁর সন্তান বড় হয়ে উঠুক। অনেক চেষ্টা করে এমন এক দম্পতিকে পাওয়া গেল কিন্তু তাঁরা শর্ত দিলেন সিবিলা কিংবা অন্য কেউ জানার চেষ্টা করবে না কারা সিবিলার বাচ্চাকে গ্রহণ করলেন। সিবিলা রাজি হল। তার দুদিন সময় লেগেছিল। সিবিলাকে নিয়ে চাচা চলেছেন স্টেশনের পথে। পথ যত এগোচ্ছে, সিবিলা ততই অস্থির। গাড়ি থামিয়ে শিশুর জন্য সিবিলা খেলনা, জামাকাপড় কিনতে থাকে। তার জমানো অর্থ শেষ হয়ে গেলে চাচার কাছ থেকে পাঁচ মার্ক নিয়ে এক মাসের শিশুর জন্য বই কেনে। এই সব করে যখন স্টেশনে পৌঁছয়, গাড়ি আসতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

গাড়ি চলে এসেছে। পোর্টার সিবিলার সুটকেস তুলে দিয়েছে। চাচার হাটু জড়িয়ে সিবিলা বলছে চাচা কথা দিন যে তার সন্তানের খবর নেবেন। চাচা নিরুপায় হয়ে কথা দিলেন যদিও তিনি জানতেন না যে এরপর আদৌ খবর পাওয়া যাবে কিনা। সিবিলা গাড়িতে গিয়ে বসে। এমন সময় চাচা আর সিবিলার কামরার মাঝখান দিয়ে এক মহিলা ধীরে সুস্থে ছোট্ট একটি ছেলের হাত ধরে চলে গেল। সিবিলা তাদের লক্ষ্য করেছিল কিনা জানা যায় না, দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল আর চাচার কাছ থেকে বাচ্চা কেড়ে নিতে গাড়িতে উঠলো। শেষে চাচা বলছেন – " আমি বাধা দিলুম না। " পাঠকের হৃদয় মথিত করা টানটান বাৎসল্য রসের গল্প এটি। মায়ের মনের সূত্রে এই গল্পের নামকরণ সার্থক।

তীর্থহীনা :

'হিন্দুস্তান হৌসে'র আড্ডা সেদিন ভালো করে জমছিল না। কোত্থেকে এক পাদ্রীসাহেব এসে হাজির। পাদ্রীর সঙ্গে আড্ডার সদস্যদের তর্ক- বিতর্ক চলছে। ওয়েট্রেস বড় টেবিলে খাবার সাজিয়ে ফেলেছে। চাচা পাদ্রীকে আহ্বান করতেই তিনি কেটে পড়লেন। এরপর ধর্ম, মিশনারি প্রভৃতি প্রসঙ্গ এল। তারপর চাচা ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে তাঁর অল্পবিস্তর পরিচয়ের কথা ব্যক্ত করতে লাগলেন। 'আভে- মারিয়া' হল মা- মেরির উপাসনা মন্ত্র। যে প্রার্থনায় সাড়া দেয় সর্ব নাস্তিক, সর্ব আস্তিক। একদিন চাচা এই সংগীতে বিভোর, এমন সময় শুনতে পেলেন একটি মেয়ের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। চাচা মেয়েটিকে চিনতে পারলেন। কার্ল- কে এক্স রে করাতে গিয়ে এই মেয়েটির মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এই মেয়েটির ও যক্ষ্মা হয়েছে। এরপর একমাস কেটে গিয়েছে। চাচার সঙ্গে উইলির দেখা হয়েছে। য়ুডাস টাডেয়াস তীর্থের কথা উল্লেখিত হল। রাইন নদীর ওপারে হাইস্টারবাখার রোট। সেখান থেকে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আধ মাইল দূরে টাডেয়াস তীর্থ। নাস্তিক উইলি বারবার বুঝিয়ে দিয়েছে তীর্থ না করে কেউ ক্যাথলিক ধর্মে প্রবেশ করতে পারেনি। আর ক্যাথলিক ধর্ম যে কতটা কুসংস্কারাচ্ছন্নতা এই তীর্থে না গেলে বোঝা যাবে না। যাহোক, পাদ্রীসাহেবের নেতৃত্বে জনা তিরেশেক দল বেধে রওনা দিলেন তীর্থের উদ্দেশ্যে। চাচা যখন তীর্থ যাত্রার প্রারম্ভিক পর্বে পালাই পালাই করছেন পাদ্রী সাহেবের তৎপরতায় আলাপ হল সেই যক্ষারোগিণী আর তার মায়ের সঙ্গে। উইলির মাসির থেকে গ্রেটের কান্নার কারণ জানা গেল। এই মেয়ে বাল্যবিধবার থেকেও হতভাগিনী, এর বল্লভ হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায়। পয়সার লোভে অন্যত্র বিয়ে করার জন্য সে গ্রেটকে ত্যাগ করে। দুবছর গ্রেট কাউকে কিছু বুঝতে দেয়নি। হাসিখুশি মেয়েটির এরপর যক্ষ্মা হয়। দুরারোগ্য ব্যাধি যখন তাকে কাবু করে ফেলছে, পাদ্রী এবং মায়ের ইচ্ছেয় সে রাজি হয় তীর্থে যেতে। গ্রেটের মায়ের শেষ আশা ছিল যে টাডেয়াসের দয়ায় যদি মেয়ের বর জোটে। পথের মাঝেই প্রকৃতি বাদ সাধে। তুমুল বৃষ্টি আর ঝড়। রাস্তার পাশের শরাইখানায় আশ্রয় নেওয়া গ্রেট ও সঙ্গীরা ঝড়ের মধ্যেই শুনতে পেল বারোটা বাজার ঘন্টা অর্থাৎ পরব শেষ হল। জীবনের শেষ আশাটুকু ফুরিয়ে গেল গ্রেটের।

মাস দুই পরে চাচা গির্জায় গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুনলেন। দেখলেন গ্রেটের মা। পরনে কালো পোশাক। এই রচনায় অসুস্থ গ্রেটের তীর্থে না পৌঁছুতে পারা এবং তার মৃত্যু এই গল্পটিকে করুণ পরিণতি দান করেছে।

বেলতলাতে দু'- দুবার :

এই রচনার শুরুতেই পাই নাৎসিদের প্রতাপ দিন দিন বেড়ে যাওয়ার কথা। হিন্দুস্তান হৌসের আড্ডার সদস্যদের তাতে কোনও আপত্তি করার কথা নয়। নাৎসিরা যদি ইংরেজদের বিপদে ফেলতে পারত, তবে আড্ডার সদস্যরা খুশি হত। কিন্তু বেদনার বিষয় এই যে দু-একজন মূর্খ নাৎসি জাতিবিদ্বেষের ভুল বশবর্তী হয়ে আক্রমণ করত ভারতীয়দের। আড্ডার নবীন সদস্য গোলাম মৌলা নাৎসিদের সম্বন্ধে অসহিষ্ণু। পুলিন সরকার, সূয্যি রায় নিজেদের মত পোষণ করছিলেন। ইংরেজ ও নাৎসিদের পরাধীন ভারতবাসীর প্রতি ব্যবহার চিনিয়ে দেয় ইংরেজরা অনেক বেশি চালাক। আড্ডার ধর্মেই রঙ্গ- রসিকতার মধ্য দিয়ে আড্ডা উঠছিল।

চাচা গলাবন্ধ কোটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন। ভক্ত গোঁসাই জিজ্ঞেস করলেন কেন চাচা কিছু বলছেন না। চাচা বললেন- " আমি ওসবেতে নেই। আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। " আর এর সূত্র ধরেই আমরা পাচ্ছি চাচার অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনি, ঘটনাস্থল মিউনিখ। চাচার কথা থেকে জানতে পারি তিনি আর সূয্যি রায় মিউনিক থেকে পনেরো মাইল দূরে ছোট্ট একটি গ্রামে পাশাপাশি বাড়িতে

থাকতেন। চাচা থাকতেন এক মুদির সংসারে। এই সংসারে প্রত্যেকের রসবোধ ছিল প্রবল এবং সকলেই ওস্তাদি সংগীতে আসক্ত। মুদির বড় ছেলে অস্কার বেহালা বাজাতো। অস্কার প্রচুর পরিমাণে মদ খেত। সে ছিল পাঁড় নাৎসি। ভারতীয় হিসেবে চাচা মদ খায় না বলে প্রশংসা করতো অথচ অন্ধ নাৎসিভক্তিতে অমানবিক কথা বার্তা বলতো। তার মতে ইহুদীরা যতদিন এদেশে থাকবে ততদিন বর্ণ সঙ্করের সম্ভাবনা। জার্মানীর নর্ডিক জাতির পবিত্রতা রক্ষা করতেই হবে। চাচা তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষেও আর্য জাতি রয়েছে এবং তারা জার্মানদের চেয়েও ঢের বেশি প্রাচীন এবং কুলীন। ভারতবর্ষ তার প্রাচীন যে সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করে, তা আর্য ও অনার্য সভ্যতার অর্থাৎ বর্ণসঙ্করের ফলে। এরপর আলোচনা ভেস্তে যায়। চাচার সঙ্গে অস্কারের সম্পর্কে অবনতি হয়। এর পর বছর খানেক কেটে গিয়েছে। র্যোনডর্ফের বাৎসরিক মেলা উপস্থিত। বুড়োবুড়ি ও মারিয়া চাচাকে নেমন্তন্ন করে গেলেন মেলা দেখতে যাবার। এখানে এটাই রেওয়াজ।

মেলায় রাত্রি হলে শরাবখানায় চাচা আর মারিয়াকে রেখে বুড়োবুড়ি বাড়ি চলে গেলেন। তাদের জায়গায় এসে বসলো এক কপোত- কপোতি। মেয়েটি চাচার প্রতি অনুরক্ত হতে শুরু করেছে। মারিয়ার কাঁধে তখন শ্যাম্পেনের ভূত নাচছে। ওদিকে কপোত বাজপাখির মূর্তি ধরতে আরম্ভ করেছে। মেয়েটির হাত থেকে রক্ষা পেতে চাচা শরাবখানার মুখোমুখি ছোট বিয়ার ঘরে পালালেন যেখান থেকে মারিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা যায়। এটাই হল আরেক ভুল। কপোতি সেখানে ঢুকেই বললো- ' একটু দেরি হলো। কিছু মনে করোনি তো?' চাচার কাছ থেকে টেলিফোন নম্বর টুকে নিল। এমন সময় তার প্রেমিক এসে হাজির। অবস্থা চরমে। চাচা যতই বলছেন ফ্রলাইনের প্রতি তার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই, কিন্তু শোনে কে? এর মধ্যে ছেলেটি বর্ণসঙ্কর নিয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছে। এর মধ্যে কোত্থেকে হাজির হল অস্কার। সে চাচার কাছে জানতে চায়- ' কী হয়েছে? আবার নাৎসিদের গালাগাল দিয়েছিস বুঝি?' বেহেড মাতাল অবস্থাতেই অস্কার যা বোঝার বুঝল এবং ঐ কপোতিকে জড়িয়ে ধরলো। তার প্রেমিককে আহ্বান করল রোগা চাচাকে ছেড়ে তার সঙ্গে লড়তে। চাচা পুলিশকে ডেকে আনলেন। কপোত কপোতি বিদায় নিল। এরপর অস্কারের বান্ধবী জিজ্ঞেস করেছে যেই চাচা কোন দেশের লোক, চাচা দিলেন চম্পট কেননা পয়লা কপোতিও এই প্রশ্ন দিয়েই আরম্ভ করেছিল। অস্কার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করছিল- 'যাচ্ছিস কোথায়?' চাচা বললেন- ' আর না বাবা! এক রাত্তিরে দু-দুবার না।

কাফে-দে-জেনি :

প্যারিসের প্রেক্ষাপটে এই রম্যরচনাটি লেখা হয়েছে। আকারে অন্যান্য

টিপ্পনী

টিপ্পনী

রচনার চেয়ে ক্ষীণ কলেবর হলেও প্রসাদগুণে পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই গল্পের কথক চাচা নন, ইরশাদ চৌধুরী। কথকের স্বরে অবশ্য কোনও পার্থক্য ঘটেনি। যাহোক, কথক রাত বারোটায় প্যারিসে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে ভাবছেন কোথায় যাবেন। তারপর কাফেতে গেলেন। মাঝারি ভিরের কাফেতে কথক স্বস্তি অনুভব করলেন। দেখলেন একটি টেবিলে জায়গা ফাঁকা আছে। শুধু একজন খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা, কালো টুপিতে সোনালি হরফে 'ল্য মাঁতা' লেখা, চোখ বন্ধ করে দম নিচ্ছেন। কথক তাকে বললেন মোলায়েম সুরে-" মসিয়ো যদি অনুমতি করেন-" খুব সাধারণভাবেই বোঝা যায় কথক বসবার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। কিন্তু ল্য মাতা অদ্ভুত কথাবার্তা বললেন। এবং চলেও গেলেন। প্রাথমিকভাবে অবাক কথক কাফেতে বসে ওয়েটারকে ডাকলেন খবর কাগজ দেবার জন্য। তখন ওয়েটার বলার চেষ্টা করলেন এই 'কাফে দে জেনি'- তে সবাই এত জিনিয়াস যে কেউ খবরের কাগজ পরেন না। ওয়েটার গ্রীক ভাষার একটি সাপ্তাহিক দিতে চেয়েছিলেন, কথক তাকে নিরস্ত করলেন।

এরপর সেই টেবিলে এসে বসলেন এক ভদ্রলোক, নাম পল রনাঁ। কথকের সঙ্গে ধীরে ধীরে তাঁর ভাব জমে উঠল। এবং জানা গেল আগে এই টেবিলে যিনি বসেছিলেন তাঁর নাম ফের্না রুমোর। তিনি লেখালেখি করেন। এই সূত্রেই লেখক জানতে পারেন যে পল রনাঁ ছবি আঁকেন। ছবি আঁকার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতিতে লোপ করে দিতে বলে তিনি লেখা পড়া ভুলে গিয়েছেন। ভাষা ভুলতে দশ বছর সময় লেগেছে। তিনি রাস্তার নাম ও পড়তে পারেন না, সই করতেও অক্ষম । জীবনের প্রথম প্রভাতে মানুষ কী দেখেছিল চোখ মেলে, যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সভ্যতার বর্বর কালিমামুক্ত জ্যোতির্দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাই তাঁর ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে চান। কথক স্বাভাবিকভাবে ছবি দেখার জন্য আকৃষ্ট হলেন। সেখানে গিয়ে ছাত থেকে মেঝে পর্যন্ত দেখলেন অদ্ভুত সব ছবি। সামঞ্জস্যহীন, তালগোল পাকানো। বলা বাহুল্য কথকের মনকে তৃপ্তি দিতে পারে নি এই সমস্ত ছবি।

পল রনাঁ কথকের সঙ্গে আলাপ করিয়েছিলেন তাঁর মডেল, ফিয়াসেঁ, বন্ধু নানেৎ- এর সঙ্গে। কথক ছবি দেখার সময় শুনতে পেলেন রনাঁ নানেৎ কে বলছেন- "…আমার আসন চিরকাল তোমার পায়ের কাছে।" কথক নিঃশব্দে যখন বাইরে এলেন, সকালের সূর্য উঠে গেছে। স্বপ্ন কেটে গেল। ' নিশার প্যারিসে কভু, হাবা ওরে,বলি তোরে, কাফে ছেড়ে বাহিরিতে নাই'- কথার মধ্য দিয়ে এই রচনা শেষ হলেও পাঠক পেয়ে যায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও নানা রকম মানুষের আস্বাদ।

বিধবা-বিবাহ :

আমাদের পুজো সংখ্যা ক্রিসমাস স্পেশালের অনুকরণে জন্ম নিয়েছিল কিনা এই ভাবনার সূত্রে এই কাহিনির শুরু। বরোদার ভূতপূর্ব মহারাজা তৃতীয় সয়াজী রাও-এর বলা হয়েছে। ইনি ছিলেন আসলে রাখাল ছেলে, বরোদার শেষ মহারাজা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে গদিচ্যুত হলে তাঁর আত্মীয় বলে এঁকে মহারাষ্ট্রের মাঠ থেকে ধরে এনে গদিতে বসানো হয়। তখন তাঁর বয়স ষোলো। এরপর তিনি বাষট্টি বছর রাজত্ব করেন। নিজের রাজ্যে আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী খোলার ব্যবস্থা করেন এবং আরও জনহিতকর কাজ করে রাজ্যের জন্য ত্রিশ কোটি তাকা রেখে যান। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। বরোদার বিখ্যাত ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট এর অধ্যক্ষ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছেলে শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। সয়াজী রাও-এর অনুরোধেই নন্দলাল বসু বরোদার কীর্তিমন্দিরের চারটি বিরাট ছবি এঁকেছিলেন। সয়াজী রাও-এর সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিচয় দিয়ে পুব বাংলার এক মৌলবী সাহেবের কাছে শোনা এক গল্প লেখক নিবেদন করেছেন।

খাস বাঙাল ভাষায় আরবী- ফারসী শব্দ মিশিয়ে মৌলবী নস্যিতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো টান দিয়ে জানালেন সয়াজী রাও কেন যে চিড়িয়াখানা বানালেন তা বলা মুশকিল। বহু দেশ থেকে ঘুরে ঘুরে জানোয়ার নিয়ে এসেছেন চিড়িয়াখানায়। একবার বিলেত যাবার সময় তাঁর পরিচয় ঘটে হাবশী দেশের রাজা হাইলে সেলাসিসের সঙ্গে। তিনি সয়াজী রাও-কে খুব খাতির করলেন। জাহাজে সয়াজী রাও হাবশী রাজাকে কাশ্মীরি শাল উপহার দিলেন। প্রত্যুত্তরে অনেক ভাবনা চিন্তার পর হাবশী রাজা এক জোড়া সিংহ- সিংহী পাঠালেন তোফা হিসেবে। তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হল। অনেক দূর থেকে লোকেরা এসে ভিড় করল। এরপর হঠাৎ করেই একদিন সিংহ মারা যায়। সিংহী কিছু বুঝতে না পেরে সিংহের চারপাশে চক্কর কাটাচ্ছে। সিংহের মৃতদেহ বের করতে ম্যানেজারের দফারফা। এদিকে সারা বরোদাতে শোকের ছায়া নেমেছে। সিংহের বিহনে সিংহী খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। দুর্বল শরীর নিয়ে খাঁচা ভাঙার চেষ্টা চালাচ্ছে। এরপর সয়াজী রাও হাবশী সিংহ যোগাড় করবার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু সাবধান থাকতে হবে হাবশীরাজ যেন খবর না পান তাঁর দেওয়া উপহারের সিংহ মারা গেছে।

এক মাস পর কাঠিয়াওয়াড় থেকে 'বর' এল। দেশি সিংহ। খাঁচার দরজা দিয়ে যখন সে ঢুকছে হঠাৎ সিংহী এক হনুমানের মত লাফ দিয়ে পড়ল সিংহের ঘাড়ে। সঙ্গে তিন কিংবা চার খানা বিরাশি শিক্কার থাবড়া। কাঠিয়াওয়াড়ী দামাদ একেবারে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ঠাণ্ডা। বোঝাই যাচ্ছে সিংহী একে মেনে নিতে পারেনি। এরপর মৌলবী সাহেব যখন চলে যাচ্ছেন, কী মনে করে থামলেন এবং জানালেন যে; সয়াজী রাও- কে বহু সাহস করে যখন দেশী সিংহের পরিণতি বলা হল, তিনি কোনওরকম চোটপাট করলেন না। মুচকি হেসে বললেন- " আমি যখন বিধবা- বিবাহের জন্য একটা নয়া আন্দোলন আরম্ভ করতে চেয়েছিলুম, তখন তোমরাই না গর্ব করে বলেছিলে, এদেশের খানদানী বিধবা—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—নতুন বিয়ে করতে চায় না? হাবশী সিংগিনী এদেরও হার মানাল যে! ''

রাক্ষসী :

এই কাহিনি গড়ে উঠেছে লেখকের বরোদা বাসকালীন সময়ে অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে। বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও গাড়কোয়াড়-এর দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে সৈয়দ মুজতবা আলি বরোদায় অধ্যাপনা করতে যান এবং ১৯৩৫- ১৯৪৪ অব্দি সেখানে থাকেন। 'চাচা কাহিনী' গ্রন্থের এই রচনাটি রস আবেদনের দিক থেকে একদম আলাদা। এটি মূলত বীভৎস রসের গল্প। পার্সী সম্প্রদায়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া রয়েছে গল্পের কেন্দ্রে।

পার্সীদের মৃত্যুর পর পোড়ানো হয় না, সমাধিস্থ করা হয় না, মৃতদেহকে রেখে দিয়ে আসা হয় টাওয়ার অফ সাইলেন্স বা মৌন শিখরে। দেওয়ালের ভিতরের দিকে বড় শেলফের কুলুঙ্গি থাকে। সেগুলোর মৃতদেহকে বিবস্ত্র করে শুইয়ে দেওয়া হয়। শকুন ওত পেতে থাকে। তারপর যা হয় বলাই বাহুল্য। এই প্রথাটি বীভৎস। রৌশন গল্পকারকে বলেন- " বোম্বায়ে টাওয়ার অফ সায়লেন্সের আশপাশের কোনো বাড়িতে কখনো বাসা বাঁধলে জানতেন। একটা শকুনি হয়তো একটা মরা বাচ্চার মাথাটা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে আপনার বাড়ির উপর দিয়ে, আরেক শকুনির সঙ্গে লাগলো তখন তার লড়াই। ছিটকে পড়ল মুন্ডুটা আপনার পায়ের কাছে, কিংবা মাথার উপরে। " গল্পের মূল বীভৎসতার কাহিনিতে পরে আসছে।

রৌশনের কথার থেকে জানা যায় গ্রীষ্মকালে এক অস্থিচর্মসার আশি বছরের বুড়িকে অনেক কষ্টে শববাহক জুটিয়ে নিয়ে যায়। এর তিন মাস পরে আবার কথকের টাওয়ার অফ সাইলেন্সে যেতে হয় তার বিধবা পিসির জন্যে। শববাহকেরা ক্লান্ত হয়ে মড়া নিয়ে ঢুকেছে, এমন সময় চিৎকার। তারা পাগলের মত ছুটে গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য। টালমাটাল। এরপর কর্তব্যবোধে দস্তুরজী এবং কথক গিয়ে দেখেন সেই হাড্ডিসার বুড়িকে। শেলফের ভেতর পা ছড়িয়ে বসে আছে। চোখের কোটর দুটো ফাঁকা। কালো দুই গর্ত। কথক অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফেরে বৃষ্টিতে। চারপাশে স্কুলের ছেলেরা, শববাহকদের পাগলের মত ছুটে যাওয়া দেখে কথকদের

খোঁজে এসেছিল। পরে বোঝা গেল তিন মাসে বুড়ির মৃতদেহ গরমে এমনভাবে বেঁকে গিয়েছিল যেন পা দুটো ছড়িয়ে বসে আছে। চোখ উবে গিয়েছে। কিন্তু সারা শরীর অক্ষত কেননা শকুনেরা আর নেই। এই ঘটনার বীভৎসতা এমন ছিল যে বাকি দুজন শববাহক ভেতরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তাদের আর জ্ঞান ফেরেনি, বাইরে যারা এসেছিল তাদের মাথায় ধরেছে, একজন পাগলা গারদে। দস্তুরজী এই ঘটনা সামলে উঠলেও অকালে বৃষ্টি নামলে কথকের মনে এই ছবি আসে ও তা ভুলতে নেশার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গা শিরশিরে এই কাহিনি পাঠককে বিহ্বল করে তোলে। আমরা অবগত আছি জুগুপ্সা বীভৎস রসের স্থায়ীভাব। ব্যাধি, মরণ, উদ্বেগ, ভয় প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব এই গল্পে সুন্দর ধরা পড়েছে। টাওয়ার অফ সাইলেন্স, বুড়ির বিকৃত শব এই গল্পটিকে এরকম রসপরিণতি দান করেছে।

পাদটীকা :

কোনো জাতিকে শাসন করতে হলে শুধু গায়ের জোর ফলালেই চলে না, শাসিত জনগণের মন এবং মাথায় পরাধীনতার বোধ প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়। তারা যাতে মেনে নিতে বাধ্য হয়, এই শৃঙ্খল তাদের অনিবার্য নিয়তি। ইংরেজ তাদের শাসনের সুবিধার জন্য যেমন ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল, তেমনি সেইসঙ্গে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার মরণ ঘনিয়ে তুলেছিল। এই গল্পের 'পন্ডিতমশাই' চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক ঔপনিবেশিক সময়ে ইংরেজি শিক্ষার জয়জয়কারে দেশীয় শিক্ষার ধারক –বাহক কাব্যতীর্থ- বেদান্তবাগীশদের মর্মান্তিক অবস্থার কথাই ফুটিয়ে তুলেছেন।

লেখক বাল্যকালের স্মৃতি থেকে তুলে এনেছেন নামচরিত্রকে। গল্পের প্রথমে তাঁর স্বভাব বর্ণনা করছেন- " কিন্তু পন্ডিতমশাই যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশি, এবং টেবিলের উপর পা দুখানা তুলে দিয়ে ঘুমুতেন সব চেয়ে বেশি। " পন্ডিতমশাই হেডমাস্টারকে একদম পরোয়া করতেন না যেহেতু হেডমাস্টারমশাই ছেলেবেলায় তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়তেন। পন্ডিতমশাই-এর রং ছিল শ্যাম, মাসে মাত্র একদিন তিনি দাঁড়ি- গোঁফ কামাতেন, পরতেন হাঁটু- জোকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একটি দড়ি প্যাঁচানো থাকত- অজ্ঞেরা বলত এটি দড়ি নয়, চাদর। গল্পের প্রথমে পন্ডিতমশাই –এর বর্ণনার মধ্য দিয়ে হাস্যরসের উদ্রেক হতে থাকে, কিন্তু পাঠক অপ্রস্তুত হয়ে যায় গল্পের পরবর্তী অংশে।

লাটসাহেবের স্কুল পরিদর্শন ছিল সে সময়ের বড়ো ঘটনা। সাহেবের মর্জির ওপরেই যেহেতু স্কুলের অনুদান নির্ভর করতো, তাঁকে খুশি করার মরিয়া প্রয়াস নিত্য নতুন ঘটনার জন্ম দিত। শাস্ত্রে সেলাই করা কাপড় পরা নিষেধ বলে পন্ডিতমশাই

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পাঞ্জাবি- শার্ট না পরলেও লাটসাহেবের আগমন উপলক্ষ্যে লম্বা হাতা আনকোরা হলুদ গেঞ্জি পরে এসেছেন, এ নিয়ে সকলে মস্করা করছে। এদিকে পন্ডিতমশাই-এর সারা শরীর চুলকোচ্ছে। কথকের বুদ্ধিতে খানিক সময়ের জন্য এটি ছেড়ে রাখলেও লাটসাহেবের পরিদর্শনের সময় তিনি গেঞ্জি পরে যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। যাহোক, লাটসাহেবের সাথে সাক্ষাৎপর্ব মিটেছে। তিন দিন ছুটির পর আবার ক্লাস বসেছে। পন্ডিতমশাই আগের মতই টেবিলে পা তুলে ঘুমুচ্ছেন না চোখ বুজে আছেন, বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ কথককে জিজ্ঞেস করলেন- ' লাটসাহেবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বল তো রে। ' কথক সবার কথা বললেও কুকুরের কথা বলেনি। পন্ডিতমশাই এই রকমের পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে খোঁচা দিলেন। অনেকক্ষণ চোখ বুজে বলতে লাগলেন যে, শুক্রবার দেরিতে ঘাটে গিয়ে দেখেন নৌকার মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছে, লোকটা লাটসাহেবের আরদালি। সাহেবের সঙ্গে এসেছে, দিদিকে দেখতে যাবে বলে সেই দিন ছুটি নিয়েছে। তার থেকেই জানা গেল কীভাবে লাটসাহেবের কুকুরের ঠ্যাং ট্রেনে কাটা গেল। আরো একটি তথ্য জানা গিয়েছিল সেটি হল, সাহেবের কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়। পন্ডিতমশাই ক্লাসে জিজ্ঞেস করলেন- ' বলতো দেখি, যদি একটা কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের তিনটে ঠ্যাং হয়, তবে ফি ঠ্যাঙের জন্য কত খরচ হয়?' কথকের উত্তর - 'পঁচিশ টাকা'। এরপর পন্ডিতমশাই বলে চললেন- ' উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসী, দাসী একুনে আটজন, আমাদের সকলের জীবনধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বল তো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাটসাহেবের কুকুরের কটা ঠ্যাঙের সমান?' এর উত্তর কেউ দিতে পারেনি। পারার কথাও নয়। ক্লাসের প্রত্যেকটি ছেলেই বুঝতে পারছিল আত্মঅবমাননার নির্মম পরিহাস। নিস্তব্ধতা কখন কেটেছিল ক্লাস শেষের ঘন্টায় তার হিসেব ছিল না। 'নিস্তব্ধতা হিরন্ময়' – এই প্রবাদ মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছিল। পন্ডিতমশাই- এর এই প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ঔপনিবেশিক আমলে টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষক শ্রেণীর সমবেত কণ্ঠস্বর, অসহায়তার চালচিত্র।

পুনশ্চ :

এই গল্পটি লেখকের প্যারিসের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। প্যারিসের চেনা লোকজন গ্রীষ্মের অন্তিম নিশ্বাসের দিনগুলোয় ছুটি কাটাতে গিয়েছেন। লেখকের একাকীত্ব কাটছে প্লাস দ্য লা মাদলেনের জনতরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে। এমন সময় একজন বললেন- ' বাঁ সোয়ার মসিয়ো ল্য দক্তর'। লেখক প্রাথমিকভাবে এই যুবতীকে চিনতে

না পারলেও পরে মনে করতে পারলেন প্যারিস আসবার ট্রেনে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। লেখক এটিকেট অনুযায়ী ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। মাদমোয়াজেল কথককে জিজ্ঞেস করলেন- 'মা- হারা শিশুর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন যে?' উত্তরে 'ললাটঙ্ক লিখন' শুনেই প্রস্তাব দিলেন সিনেমায় যাবার। কথকের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা কিন্তু কিছুতেই এড়াতে পারলেন না যখন মাদমোয়াজেল বললেন তাঁর কাছে সিনেমার দুটি টিকিট আছে। সিনেমার ঘন্টাখানেক দেরি থাকায় তাঁর কাফেতে গেলেন। বিল মেটাতে হল কথককেই। সময় তখনও কিছু বাকি থাকতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে হল রেস্তোরায়। এক কোর্স খাবার কথা বলে ক্লের এককথায় সাড়ে বত্রিশ ভাজা খেলেন। তারপর ওয়েটার এসে বলল এক চালান তাজা শুক্তি এসে পৌঁচেছে। ব্যস, ক্লের সেটাও অর্ডার করলেন। কথক রসিকতার সুরে বলছেন- 'ক্লের ঢেকুর তোলেননি। না জানি কত যুগ তপস্যা করার ফলে ফরাসী জাতি এক ডজন শুক্তি বিনা ঢেকুরে খেতে শিখেছে। ফরাসী সভ্যতাকে বারংবার নমস্কার।' সেই সঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন- ' প্রায় শেষ কপর্দক দিয়ে বিল শোধ করলুম।' সে রাত্রে সিনেমায় গিয়েছিলেন তাঁরা, পাঁচ সিকের সিকের সিটে বসে বন্দুক- কামানের শব্দের মধ্যেও ক্লের ঘুমের শব্দ করছিল, 'নাক ডাকা' বলতে চাননি কথক কেননা সেটা গ্রাম্য শোনায়। এরপরও ক্লের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে নিরস্ত করে লেখক বাসে করে হোটেলে ফিরছেন। বিধি বাম। বাসের টায়ার ফেটে যাওয়ায় আধ মাইল পথ হাঁটতে হবে। এমন সময় লেখক আরেক রমণীর সাহচর্যে এলেন তাঁকে নিয়েই কাহিনীর দ্বিতীয় ভাগ।

প্যারিসে রাত্রে নারীবর্জিতাবস্থায় চললে কানে আসবে- 'বঁ সোয়ার মসিয়ো- আপনার সন্ধ্যা শুভ হোক'। উত্তর দিলেই মুশকিল। কিন্তু আনমনা লেখক সেই ভুলটিই করলেন। ক্ষমা চেয়ে বললেন- 'অপরাধ নেবেন না, কিন্তু আপনাকে ঠিক প্লেস করতে পারছিনে।' এদিকে মেয়েটি কথকের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেছে। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। মেয়েটি তাঁর ক্লান্তির কথা বললে লেখক জানালেন তাঁর কাছে তিনটি কফি, একটা স্যানডুইচ আর পাঁচটি সিগারেটের পয়সা আছে। কাফেতে কড়া আলোতে মেয়েটির চেহারা দেখে কথকের মনে হল মেয়েটি না খেতে পেয়েই দুর্বল হয়েছে। কথায় কথায় মেয়েটি জানালো সেই রাত্রে তাকে খদ্দের যোগাড় করতেই হবে। মেয়েটির দুঃখ বেদনার কথা কথকের মন ছুঁয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বৃথা সময় গেলে মুশকিল। মেয়েটিকে বিদায় দিয়ে কথক অপলক দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখছিলেন- ' তার সমস্ত দেহটি আপন অসীম সৌন্দর্য বহন করে চলেছে রাজধানীর মতো সোজা হয়ে, আর মাথাটি ঝুঁকে পড়েছে বেদনা আর ক্লান্তির ভারে।'

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পরদিন সকাল হতেই লেখকের অনুশোচনা বোধ জাগ্রত হল। মেয়েটির নামটি যে জিজ্ঞেস করা হয়নি! সন্ধান করতে যাবার মুহূর্তে হাতে এল একটি ছোট পুলিন্দা, চিঠির মধ্যে মেয়েটি গ্রামে যাবার কথা বলেছে। আর সেদিন কফি খাবার প্রতিদান স্বরূপ পাঠিয়েছে সুয়েটার। পুনশ্চ শব্দটি চিঠির শেষে লেখা হয়। কাহিনীর শেষে মেয়েটির চিঠি রচনাটিকে মানবিক মর্যাদা দান করেছে। আখ্যানের দুটি অংশে দুজন নারী চরিত্র আসলে বহুমাত্রিক বাস্তবতার স্বার্থেই। প্যারিসের ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনের অন্তরালে মেয়েটির দুর্দশা আমাদের অনুভবকে স্পর্শ করে বইকি।

বেঁচে থাকো সর্দি – কাশি :

সৈয়দ মুজতবা আলীর কলমের জোর এই লেখা থেকে পাঠক নতুন করে অনুমান করতে পারবেন। কথকের ভয়ংকর সর্দি হয়েছে। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কথক জানাচ্ছেন, যা জল বেরোচ্ছে তা সামলানো রুমালের সাধ্য নয় ফলে ডবল সাইজের বিছানার চাদর নিয়ে বসতে হয়েছে। শীতের দেশ জার্মানি, দরজা জানলাও বন্ধ। হঠাৎ কথকের মনে হল মিউনিক শহরের এক ডাকসাইটে ডাক্তারের কথা, অপেরাতে গিয়ে যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁর বাড়িতে গিয়ে বললেন- " সর্দির ওষুধ আছে? আপনার প্রথম এবং খুব সম্ভব শেষ ভারতীয় রোগীর একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমার এক নাক দিয়ে বেরুচ্ছে রাইন, অন্য নাক দিয়ে ওডার।" জার্মান ডাক্তার সর্দির হাজার রকমের ওষুধ আছে জানিয়ে নিয়ে গেলেন বিশাল এক আলমারির কাছে। কথককে ওষুধ বেছে নিতে বললেন। এখানেই শেষ নয়। বললেন- " যে ব্যামোর দেখবেন সাতান্ন রকমের ওষুধ, বুঝে নেবেন সে ব্যামো ওষুধে সারে না।" কথক হেঁচেই যাচ্ছেন। ডাক্তার মিটমিট করে হেসে বললেন- " সর্দি-কাশির গুণও আছে।" সেই সূত্রেই গল্পের মধ্যে গল্প করতে লাগলেন ডাক্তার।

বার্লিনে ডাক্তারি শিখে বছর তিনেক প্র্যাকটিস করার পর স্টেশনে গিয়েছেন বন্ধুকে বিদায় দিতে, ফেরার পথে স্টেশন রেস্তোরায় ঢুকে ডাক্তার থমকে গেলেন এক অপরূপ সুন্দরীকে দেখে। ডানয়ুব নদীর প্রশান্তি যেন মুখে। লজ্জার ভাবের ওপর জোর দিয়েছেন এই গল্পের কথক ডাক্তার। প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়েই তিনি ভাবছেন কোন অছিলায় কথা বলবেন। কিছুতেই মধ্যেখানের তিনখানা টেবিলের দূরত্বকে পেরিয়ে যেতে পারছেন না- " প্রবাদ আছে, প্রেমে পড়লে বোকা নাকি বুদ্ধিমান হয়ে যায়—প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য তখন তাঁর ফন্দি- ফিকির আর আবিষ্কার কৌশল দেখে পাঁচজনের তাক লেগে যায়, আর বুদ্ধিমান নাকি প্রেমে পড়লে হয়ে যায় একদম গবেট—" মেয়েটি উঠে দাঁড়াতেই ডাক্তার পিছু নিলেন। মিউনিকের ট্রেনে খানা-কামরায় উঠলেন। ওয়েটাররা হয়ত ভাবল স্বামী- স্ত্রী , নাহলে মুখ গোমড়া করে এই

কামরায় তরুণ- তরুণী ঢুকবেই বা কেন? ডাক্তার নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবলেও কোনোভাবেই আলাপ জমাতে পারছেন না। এমন সময় জানলা দিয়ে কয়লার গুঁড়ো টেবিলে পড়ায় দ্রুত জানলা বন্ধ করতে গিয়ে নিজের আঙুল থেতলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত। ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন কেননা মেয়েটি তড়াক করে উঠে ব্যান্ডেজ নিয়ে আসার কথা জানাল। ক্ষতের সূত্রে স্পর্শ পেলেন ডাক্তার। সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল। ধীরে ধীরে জমে উঠল আলাপ। ডাক্তার যখন লেখককে এই গল্প করছিলেন তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে জানাল রোগী এসে গেছে। ডাক্তার এক্ষুনি আসছি বলে গল্পটি কমিয়ে শেষ করতে চাইছিলেন। লেখক বললেন তাল দ্রুত করে দিতে। আবার শুরু হল সেই মেয়েটির কথা। দুঃখিনী মেয়ে। বাবা- মা নেই। পিসির বাড়িতে মানুষ। কলেজের ফি যোগাড় করে মাস্টারি করে। যাইহোক মেডিক্যাল কলেজের রেস্তোরায় দেখা হতে লাগল তাঁদের। সুন্দরী এভাকে ছেড়ে তিনি বার্লিন চলে এলেন। চিঠি লিখলেন। এভা জানাল পিসি যতদিন আছেন নিভৃতেই দেখা হবে। অভিসারের দিন হিসেবে কোনো বুধবার ডাক্তার মিউনিকে পৌঁছুলেন। এদিকে পাবলিক বুথে স্নান করে বাইরে বেরিয়েই ঠাণ্ডা লেগে গেছে। এভার বাড়ির সামনের রাস্তায় যখন দাঁড়ালেন টেম্পারেচার তখন শূন্যেরও নীচে। রাস্তায় এক ফুট বরফ। তিন মিনিট যেতে না যেতেই সর্দি শুরু হল। আর ডিনামাইট ফাটার শব্দের মতন হাঁচি। ডাক্তার কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, এমন সময় এভা নিঃশব্দে এসে হাত ধরল। নিজের কামরায় নিয়ে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় ডাক্তারের শুরু হল বিকট হাঁচি। পাশের ঘরে পিসি শুনলেই বিপদ। ডাক্তারের মাথার ওপর বালিশ কম্বল চাপিয়েও হাঁচির শব্দ আটকানো গেল না। দরজায় পিসির ধাক্কা। এভা ভয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে বিছানায়। দরজা খুলে ডাক্তার শুনতে পেলেন পিসির তান্ডব বকুনি। থাকতে না পেরে ডাক্তার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন " আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করতে চাই"। জানালেন এতদিন বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে পারেননি যদি 'না' বলে বসে। পিসি প্রাথমিকভাবে দু'মিনিট নিয়েছিলেন ব্যাপারটা বুঝতে, তারপর জড়িয়ে ধরে চিৎকার করলেন। ইভা তখনো অচৈতন্য। বুড়ি বুড়োকে নিয়ে এলেন। দুপুর রাতে উৎসব শুরু হল। এভা কানে কানে ডাক্তারকে বলল- " জীবনে এই প্রথম শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তুমি আমার উপর একটু নজর রেখো।"

ডাক্তার উৎসাহিত হয়ে লেখককে গল্প শোনানোর মধ্যে দরজা খুলে ঢুকলেন এক সুন্দরী। লেখক বুঝতে পারলেন ইনি সেই মেয়ে। লাজুক হাসি হেসে হাত বাড়ালেন সুন্দরী। ডাক্তারের মুখে শোনা সব বিশেষণগুলো সত্যি বলে প্রতিভাত হচ্ছিল লেখকের। ফরাসি কায়দায় 'চম্পক করাঙ্গুলি প্রান্তে ওষ্ঠ স্পর্শ করে' মনে মনে

টিপ্পনী

বললেন- " বেঁচে থাকো সর্দি- কাশি/ চিরজীবী হয়ে তুমি।" ডাক্তার দেখাতে এসে রোগের সূত্রে এক অনবদ্য মিলনান্তক প্রেমকাহিনি পেলাম আমরা। আর 'চাচা কাহিনী' বইটির সমাপ্তি হল মধুর রসের মধ্য দিয়ে।

চাচা কাহিনী :- বৈঠকি সাহিত্য, আড্ডার আঙিনায় :

টিপ্পনী

" ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর সহিত বৈঠকি আলাপে যাহারা বসিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া কেবলমাত্র শুনিয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছু করা বা বলা নিরর্থক। সময় কেমন করিয়া প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে লইয়া গিয়া কেবলই আরও জানিবার, শিখিবার ও বুঝিবার জন্য নিজেকে তৈরী করিতে থাকে, তাহা ডঃ আলীর বৈঠকে যাহারা যোগ একবারও অন্ততঃ দিয়াছেন, তাহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। কাহাকেও একটি ব্যাপার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ডঃ আলী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাষা, সমাজ, ধর্ম ও রীতি-নীতির যে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলীর অবতারণা করিতেন, তাহা তুলনারহিত এবং বিরলও বটে। " আমীনুর রশীদ চৌধুরী তাঁর 'মুজতবা কথা'- য় এভাবেই তুলে ধরেছেন লেখকের কথক সত্তাকে। সৈয়দ মুজতবা আলি ক্লাসিক মননের অধিকারী ছিলেন, তিনি নিজেও চাইতেন সৃজনশীল ব্যক্তিরা মতপ্রকাশের পূর্বে ব্যাপক পড়াশুনো করবেন। একটি পাঠের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অবতারণা নিয়ে ইদানিং কালে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। আমরা আশ্চর্য হতে পারি সৈয়দ মুজতবা আলি সেই সময়েই তাঁর পাঠকে করে তুলেছিলেন আঙ্গিকভাঙ্গা, অন্তর্বয়নে সমৃদ্ধ। রম্যরচনার প্রচলিত ছাঁচে 'চাচা কাহিনী' কে বিচার করা মুশকিল। যে কোনও প্রচলিত আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হয়েছেন, এবং এই প্রথাবিরোধী অবস্থান তাঁর কাহিনীকে করে তুলেছে রসসাহিত্য।

আড্ডা সাহিত্য বা বৈঠকি সাহিত্যের নিরিখে 'চাচা কাহিনী'-কে আড্ডা সাহিত্য বা বৈঠকি সাহিত্য হিসেবে দেখা যায় কিনা এ বিষয়ে আলোচনায় আসা যেতে পারে। বুদ্ধদেব বসুর 'আড্ডা' প্রবন্ধটির কথা এক্ষেত্রে মনে পড়তে বাধ্য। তিনি লিখছেন- " আড্ডা স্থিতিশীল নয়, নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপের বদল হয়। মন যখন যা চায়, তা-ই পাওয়া যায় তাতে। কখনো কৌতুকে সরস, কখনো আলোচনায় উৎসুক, কখনো প্রীতির দ্বারা সুস্নিগ্ধ। বন্ধুতা ও অন্তর্বীক্ষণ, হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধির চর্চা, উদ্দীপনা ও বিশ্রাম- সব একসঙ্গে শুধু আড্ডাই দিতে পারে, যদি সত্যি তা ঐ নামের যোগ্য হয়।" 'চাচা কাহিনী' বইটির মধ্যে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেব বসুর আড্ডা প্রবন্ধটি যেন আড্ডার ইস্তেহার। এই লেখাটিকে যদি আমাদের পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাই, তবে আমাদের পাঠ এক অন্যমাত্রা পাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

" বার্লিনের বড় রাস্তা কুরফুর্স্টেন্ডাম্যেখানে উলান্ডস্ট্রাসের সঙ্গে মিশেছে, সেখান থেকে উলান্ডস্ট্রাসে উজিয়ে দু-তিনখানা বাড়ি ছাড়ার পরই ' Hindustan Haus' অর্থাৎ 'Hindustan House' অর্থাৎ ' ভারতীয় ভবন'। আসলে রেস্তোরা, দা-ঠাকুরের হোটেল বললেই ঠিক হয়।..... রেস্তোরার যে দিকে কাউন্টার তার আড়াআড়ি ঘরের অন্য কোণে কয়েকখানা আরামকেদারা আর চৌকী কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। এ কুন্ডলীর চক্রবর্তী চাচা, উজির-নাজির গুটি ছয় বাঙালি। " 'চাচা কাহিনী' বই-এর প্রথম আখ্যান 'স্বয়ংবরা' র শুরুতেই পেয়ে যাই আমরা আড্ডা-স্থানের কথা। অনুপুঙ্খ বিবরণে পাঠক নিজেই যেন হাজির হয়ে যান সেই স্থানে। বার্লিনে আড্ডা হচ্ছে অথচ সেখানে কোনও অবাঙালি নেই- এই তথ্যটিও আমরা জেনে যাই। অবশ্য এর মূলে রয়েছেন চাচা। অবাঙালি থাকলে তিনি এমন জার্মান ভাষায় কথা বলেন যে তা খুব কম জনেই বুঝতে পারে। অবাঙালিরা চলে গেলেই চাচা আবার বাংলায় ফিরে আসতেন। প্রবাসে বাঙালিমাত্রই সজ্জন, এ কথা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। বাঙালির আত্মপরিচয়ের সঙ্গে আড্ডাপ্রীতির সম্পর্ক সৈয়দ মুজতবা আলি খুব সচেতন ভাবেই তুলে ধরেছেন। মনের দিক থেকে চাচাকাহিনী লালন করে চলেছে বাঙালিয়ানাকে, ঘটনা সংস্থানের পটভূমি যে ভূখণ্ডই হোকনা কেন। আমরা আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই যে লেখক সচেতনভাবে তাঁর আখ্যান কাঠামোর মধ্যে বুনে দিয়েছেন আড্ডা বিষয়ক কথাবার্তা। যেমন প্রথম 'স্বয়ংবরা' রচনাতেই দেখি 'পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ' পুলিন সরকার বলেছেন- " আড্ডা জমাবার বুনিয়াদ হচ্ছে চন্ডীমন্ডপ, কাছারি- বাড়ি, টাঙ্গিঘর, বৈঠকখানা- এক কথায় জমিদারী প্রথা। " এর পর চাচার প্রশ্নের সূত্র ধরে পুলিন সরকার জানিয়েছেন তাদের জমিদারি গেলেও আড্ডাটি বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমরা চকিতে বুঝে যাই আড্ডা ও অবসরের এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা। অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে যদি সংস্কৃতির যোগ থাকে, তবে আড্ডা সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে জমিদারি প্রথার প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর চণ্ডীমণ্ডপ বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্যতম দলিল। আড্ডার স্থান আসলে এক পরিসরের কথা বলে। যে পরিসর আত্মস্থ করে থাকে দেশ – কাল কে। আড্ডার আয়নায় তৈরি হয়ে যায় জীবনের সমালোচনা।

'মা- জননী' গল্পে আবার পাই হিন্দুস্তান হাউসের কথা। লন্ডন ভারতীয় ছাত্রদের সম্পর্কে উদাসীন হলেও বার্লিন যেহেতু ভারতীয়দের খাতির করতো, ফলে যুদ্ধে অর্থাভাব সত্ত্বেও এই হাউস টিকেছিল। এর পর আসছে নাৎসি আন্দোলনের প্রসঙ্গ, পাঠক হিসেবে আমরা পাচ্ছি এই তথ্যটি- " ১৯২৯- এ হৌসের যখন পত্তন হয় তখনো হিটলার বার্লিনে কল্কে পাননি।" কী সুন্দর ভাবে হাউসের জন্মসময়ের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পাশাপাশি হিটলারের কথা এল। এর পর আমরা পাচ্ছি বাঙালিদের আড্ডার কথা- " সে –আড্ডার ভাষাবিদ সুয্যি রায়, লেডি- কিলার পুলিন সরকার, বেটোফেনজ্ঞ মদনমোহন গোস্বামী বার্লিন সমাজের অশোক-স্তম্ভ কুতুব- মিনার হয়ে বিরাজ করতেন। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা।" এই লেখাতেই লেখক বলছেন- " এঁদের সকলকেই লুফে নেবার জন্য বার্লিনের বিস্তর ড্রইং- রুম খোলা থাকা সত্ত্বেও এঁরা সুবিধে পেলেই 'হিন্দুস্থান হৌসে' এসে আড্ডা জমাতেন। এ- স্বভাবটাকে বাঙালির দোষ এবং গুণ দুইই বলা যেতে পারে।" বাঙালিকে বাঙালি হিসেবে যে সমস্ত জিনিস গড়ে তুলেছে তার মধ্যে একটি হল আড্ডা। আড্ডা বাঙালির সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান। আড্ডা বাঙালির আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। সৈয়দ মুজতবা আলী বহুভাষাবিদ। বহু দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন। তিনি যেখানেই গিয়েছেন লালন করে গিয়েছেন বাংলা ও বাঙালিকে। আর তাই জার্মানির পটভূমিতে লেখা গল্পে আড্ডার মধ্যে বিশেষ ভাবে উপস্থিত বাঙালির পারিবারিক চালচিত্র। 'মা-জননী' গল্পে সিবিলার দুঃখের কথা বলতে গিয়ে চাচা বলেন- " দেশে আমার বোন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে বাড়ি ফিরেছে। মা খুশি, বাবা খুশি। দু'দিন আগে নির্মমভাবে যে- বোনের চুল ছিঁড়েছি তার জন্যে তখন কাঁচা পেয়ারার সন্ধানে সারা দুপুর পাড়া চষি। তার শরীরের যত্ন নেওয়ার কথা উঠলেই সে মিস্টি হাসে- কী রকম লজ্জা, খুশি আর গর্বে মেশানো। ছোট বোনরা কাঁথা সেলাই করে, আর বাবার বন্ধু কবরেজ মশায় দু'বেলা গলা খাঁকারি দিয়ে বাড়িতে ঢোকেন। " 'তীর্থহীনা' রচনায় গির্জার মেয়েটির কান্না দেখে বুঝতে পারেন 'রাধার কান্না, বাঙালি মেয়ের কান্না কত নিরন্ধ্র অসহায়তা থেকে বেরোয়।' বৈঠকি সাহিত্যের সূত্রেই 'চাচা কাহিনী'র মধ্যে বাঙালির মনন ও আবেগ যেভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে, তা নিশ্চয়ই গভীর অভিনিবেশের বিষয়।

আড্ডায় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে খুব সহজেই যাওয়া যায়। শিল্প কৌশল হিসেবে আড্ডাকে বেছে নেওয়ার মূলে এই বিষয়টি কাজ করেছে বলে বোধ হয়। প্রচলিত ঢঙে কোনও গল্প বলতে গিয়ে অন্য গল্প বলা এবং তা পাঠক প্রিয় হওয়ার চেয়ে আড্ডার মধ্যে দিয়ে একাধিক ঘটনা ও অনুভূতির মিশেল ঘটানো অপেক্ষাকৃত সহজ। সবচেয়ে বড় কথা লেখক পাঠকের সংযোগস্থাপনের ক্ষেত্রে এই আড্ডা বিশেষ মাত্রা রাখে। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন তাঁর আড্ডা প্রবন্ধে- " নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে যাওয়ার মতো নির্দিষ্ট দিনে যেখানে যেতে হয়, তাকে, আর যা-ই হোক, আড্ডা বলা যায় না। কেননা আড্ডার নিয়মই এই যে তাঁর কোনো নিয়মই নেই; সেটা যে অনিয়মিত, অসাময়িক, অনায়োজিত, সে বিষয়ে সচেতন হ'লেও চলবে না। ও যেন বেড়াতে যাবার জায়গা নয়, ও যেন বাড়ি; কাজের শেষে সেখানেই ফিরবো,

এবং কাজ পালিয়ে যখন-তখন এসে পড়লেও কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না। '' আড্ডা যেমন প্রশ্নাতীত আশ্রয়, শিল্পও তাই। আমরা সৈয়দ মুজতবা আলীর ব্যক্তিগত জীবনে আশ্চর্য কথক সত্তার পরিচয় পেয়েছি। 'চাচা কাহিনী'তে তাই যখন আড্ডার কথা আসে, আমরা খুব বেশি আশ্চর্য হই না, বরং লেখকের যাপিত জীবনের সূত্রে শিল্পকে মিলিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে বইকি। যেকোনও আড্ডার পেছনে ' কোনো –একজনের প্রছন্ন কিন্তু প্রখর রচনাশক্তি'-র উল্লেখ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, বলা বাহুল্য 'চাচা কাহিনী'র কথক চাচা আর সৈয়দ মুজতবা আলী কখনও অভিন্ন হয়ে ওঠেন। তবে কোনও চরিত্রের সঙ্গে লেখককে হুবহু মিলিয়ে পড়তে আমরা রাজি নই। প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে লেখক উপস্থিত, তবে কোনও বিশেষ চরিত্র তাঁর প্রতিনিধি হয়ে ওঠে, এটাও ঠিক। 'আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া' সদস্য গোলাম মৌলাকে সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে চেয়েছেন কেউ কেউ। তাঁদের যুক্তি হল গোলাম মৌলা ছদ্মনামে আলী সাহেব আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখতেন। ১৯২৯ সালে জার্মানীতে গবেষণার জন্য যখন সৈয়দ মুজতবা আলী যান, তখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর। আর 'স্বয়ংবরা' রচনায় পাই চাচার মুখে- "১৯১৯- এর কথা। আমি তখন সবে বার্লিনে এসেছি। বয়স আঠারো পেরয়নি। '' বুঝতেই পারছি লেখক আর তাঁর চরিত্র আলাদা হয়ে যাচ্ছেন। তবে সৈয়দ মুজতবা আলীর মজলিশী ও মনস্বী ব্যক্তিত্বই যে 'চাচা কাহিনী'কে আড্ডা সাহিত্য কিংবা বৈঠকি সাহিত্য হিসেবে গড়ে তুলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সঙ্গেই আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'চাচা কাহিনী' গল্প বলার প্রাচ্য ঘরানাকে অবলম্বন করেছে। 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', 'কথাসরিৎসাগর' প্রভৃতি রচনায় আখ্যানের নির্দিষ্ট প্রকরণ ছিল, বন্ধন নয় সবরকম মুক্তি ছিল সেখানে। বাংলা মঙ্গলকাব্যে নিহিত উপন্যাসের সম্ভাবনাকে যখন খতিয়ে দেখতে চান দেবেশ রায়, তখন দেশীয় যে কথন শৈলীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি, সেখানে কথকতা বিশেষ গুরুত্ব রাখে। উপনিবেশের আধুনিকতা আমাদের গল্প বলার যে ভঙ্গিতে অভ্যস্ত করেছিল, তার বাইরে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম প্রমুখরা মাটির শেকড়ের ঘ্রাণ নিয়ে ভারতীয় কথাভুবন নির্মাণের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। সৈয়দ মুজতবা আলীকে মনে হয় এঁদেরই সার্থক উত্তরসূরী। চাচা নামক কথকের সৌজন্যে একটি প্রধান গল্প বা চরিত্রের সূত্রে গ্রথিত গল্পমালা, গল্পের মধ্যে গল্প, আখ্যানের সূত্রে আখ্যান, কথকের কণ্ঠে খোশ গল্পের আমেজ- সব মিলিয়ে আখ্যান কথক ও শ্রোতার পারস্পরিকতায় যে রূপ লাভ করে তা একান্তই দেশজ ঐতিহ্য থেকে উঠে এসেছে। বৈঠকি চালে লেখা রচনাগুলি তার অন্তর্গত ধর্মেই আড্ডা সাহিত্য হয়ে উঠে প্রাচ্য সাহিত্য নন্দনের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখো

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পাধ্যায়ের গল্পে আমরা পেয়েছিলাম হিউমার, কখনও শ্লেষ এবং ব্যঙ্গ। প্রমথ চৌধুরী বীরবলী ভঙ্গিতে আড্ডার মেজাজেই কথা বলেছেন লেখায়। সৈয়দ মুজতবা আলী এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন অভিজ্ঞতা সঞ্জাত মননের মধু।

আমরা আমাদের আলোচনার প্রথমেই বলেছিলাম 'চাচা কাহিনী'তে আড্ডা প্রসঙ্গের কথা। গোটা বই জুড়ে সচেতন ভাবেই আড্ডা ঘুরে এসেছে বারবার। স্থান, কাল, পাত্রের আলোচনা সূত্রেই মনে হয় যে বুদ্ধদেব বসু কথিত আড্ডার সদস্যদের উর্দ্ধসংখ্যা দশ কিংবা বারো এ ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়নি। আড্ডা যেহেতু স্থিতিশীল নয়, নদীর স্রোতের মত তা পালটে যায়, সে কথা মাথায় রেখেই সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর লেখাকে ভিন্নতায় ভরিয়ে তোলেন অফুরান প্রাণস্পন্দনে। চাচার গল্পের মধ্যে চরিত্রেরা কথা বলছে। স্থান, কাল, পাত্রের বিষয়টি সব সময় লেখক মনে রেখেছেন। তেমনই পাঠক যাতে আড্ডার মেজাজ মেতে পারেন, মনে করতে পারেন নিজেও তিনি ঐ আড্ডায় উপস্থিত সে হিসেবে গোলাম মৌলার মুখে ' শেষ ট্রেন মিস করেছি' কথাটাও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

বৈঠকি সাহিত্যের মধ্যে পেয়েছি বিভিন্ন রসের অবতারণা। 'তীর্থহীনা' গল্পটি করুণ রসের, 'স্বয়ংবরা' রচনায় হাস্যরস প্রাধান্য পেয়েছে। 'বেলতলাতে দু-দুবার' আখ্যানে কৌতুকধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। আড্ডায় যেমন কথার ভূমিকা আছে, তেমনই নীরবতাও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। ' চাচা থামলে পর অনেকক্ষণ ধরে কেউ কিছু বলল না'(তীর্থহীনা)- এই জাতীয় বাক্য আড্ডার আবহকে অন্য মাত্রায় উত্তীর্ণ করে তোলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, 'চাচা কাহিনী' গ্রন্থটির নামকরণেও এই আড্ডাসাহিত্যের প্রভাব স্পষ্ট। সৈয়দ আলী আহসান খুব সুন্দরভাবে মুজতবা আলীকে নিয়ে বলেছিলেন " তাঁর কোনও রচনাতেই তিনি নিঃসঙ্গ নন। তিনি আসর জমিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন, তাঁর লেখাতেও সেই আসরের আমেজ এসেছে। তাঁর রচনায় ব্যবহৃত শব্দ এবং তাদের বিন্যাস এমন স্বভাবের যে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মানুষের কলরব সেখানে শোনা যায়। " আমরা 'চাচা কাহিনী'কে যে কোনও বিচ্ছিন্নতাকামী বয়ানের প্রতিবাদ হিসেবে পড়তে পারি। আড্ডার মেজাজ এক ধরণের যৌথ যাপনের কথা বলে। এই যৌথ প্রতিবেদন আজকের পাঠকের কাছে সৈয়দ মুজতবা আলীকে অনন্য করে তোলে।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও পাদটীকার পন্ডিতমশাই :

'পাদটীকা' আখ্যানের প্রথমেই লেখক বলেছেন ইংরেজ রাজত্বে দেশের টোলগুলি ধংস হয়ে যাওয়ার কথা। পাঠান- মোগল আমলেও আমাদের দেশের

শিক্ষাব্যবস্থা সচল ছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলে ইংরেজি শিক্ষার দাপটে কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশদের বেঁচে থাকাটাই কষ্টকর হয়ে উঠলো। নতুন সময়ে বাধ্য হয়েই তাঁরা সংস্কৃত ও বাংলার শিক্ষকতার চাকরি নিলেন হাইস্কুলে। কাব্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের পাণ্ডিত্য অন্যান্য শিক্ষকদের থেকে বেশি হলেও মাইনে ছিল কম। নতুন ব্যবস্থায় তাঁরা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। জীবনযাপনের সংগ্রাম এবং মানসিক কষ্ট তাঁদের চরিত্রে অন্য মাত্রা যোগ করেছিল। এমনই এক পন্ডিতমশাই-এর কাহিনির মাধ্যমে লেখক সমাজ রাজনীতির পট পরিবর্তনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। বলা বাহুল্য এখানে একজন পন্ডিতমশাই হয়ে উঠেছেন আরও অনেকের প্রতিনিধিস্বরূপ।

সুরমা নদীর পারে ছিল সৈয়দ মুজতবা আলীর স্কুল। সেই স্কুলের পন্ডিতমশাই এই গল্পের মূল চরিত্র। তিনি যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশি এবং টেবিলের ওপর পা দিয়ে ঘুমোতেন সব চেয়ে বেশি। হেডমাস্টারকে তিনি পরোয়া করতেন না কেননা হেডমাস্টার তাঁর কাছে ছোটবেলায় সংস্কৃত পড়েছিলেন। পন্ডিতমশাইকে খুশি করতে চেয়ে ছেলের দল এ প্রসঙ্গ ইচ্ছে করেই উত্থাপন করত এবং পন্ডিতমশাই বেফাঁস মন্তব্য করে বসতেন। পন্ডিতমশাই- এর গায়ের রঙ ছিল শ্যামলা, মাসে একদিন দাড়ি- গোঁফ কামাতেন। পরতেন হাঁটু- জোকা ধুতি। দেহের ওপরে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকত- অজ্ঞেরা সেটিকে চাদর বলত। ক্লাসে এসে যে কোনও অজুহাতে এক চোট ছাত্রদের বকাঝকা করে ঘুমোনোর প্রসঙ্গে লেখক যমপত্নী যমীর কথা টেনে এনেছেন। পন্ডিতমশাই-এর টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই যেন ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। এই গল্পের প্রথমে পণ্ডিতমশাই চরিত্রটি আমাদের হাসির উদ্রেক করে। কিন্তু গল্পের ক্লাইম্যাক্সে পরিহাসের মধ্য থেকে প্রকাশিত হয় বেদনার অশ্রুজল।

একদিন 'ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে' পদ্মলোচন খবর নিয়ে এল লাটসাহেব আসবেন স্কুল পরিদর্শন করতে। হেডমাস্টারের মেজাজ সপ্তমে, এদিকে অন্যান্য মাস্টারমশাইদের থেকেও জুটছে কিল চাপড়। যাইহোক যেদিন লাটসাহেবের আসবার কথা, পণ্ডিতমশাইকে দেখা গেল লম্বা হাতা আনকোরা হলদে রঙের গেঞ্জি পরে বসে আছেন। বাকি মাস্টারমশাইরা প্রশংসা করছেন। সে গুণগান হাসি ঠাট্টার সামিল। ক্লাসে এসে সেই গেঞ্জি তিনি গায়ে রাখতে পারলেন না। এখানে একটি তথ্য জানিয়ে রাখা ভালো যে, গেঞ্জি যেহেতু বোনা জিনিস, সেলাই- করা কাপড়ের পাপ থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন। লাটসাহেব ক্লাসে এলেন। প্রথমে 'বিহঙ্গ' শব্দের মানে ছাত্রেরা একসঙ্গে বললেও লাটসাহেব যখন বললেন-'ওয়ান অ্যাট এ টাইম, প্লিজ';

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ভাষা বুঝতে না পেরে ছেলেরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। এদিকে লাটসাহেব পণ্ডিত শব্দ নিয়ে হেডমাস্টারের সঙ্গে আলোচনা করছেন। পণ্ডিতদের জড়শীলতার প্রতি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ নাকি একবার বলেছিলেন যার সব কিছু পন্ড হয়ে গেছে সেই পন্ডিত। মুজতবা আলি মন্তব্য করেছেন ইংরেজ শাসনের ফলে পন্ডিতদের সর্বনাশের কথা যদি রবীন্দ্রনাথ জানতেন, তাহলে হয়ত ব্যঙ্গ করার আগে একটু ভাবতেন। এইভাবে এই গল্পটি পন্ডিতের ধারণা নিয়েও ভাবনাচিন্তার হদিশ দেয়। আসলে গল্পের ছলে পন্ডিতমশাইদের অতীত বর্তমানের বদলে যাওয়া অবস্থার রূপচিত্রণই লেখকের কাম্য। সেই সঙ্গে এর কারণগুলিও চিহ্নিত করা দরকার। ইংরেজ শুধু রাষ্ট্রব্যবস্থার দখল নিতে চায়নি। বরং চিন্তার ঔপনিবেশীকরণ করতে চেয়েছিল। যার ফলশ্রুতি দেশীয় শিক্ষার বদলে পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা। আমাদের স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসটার কথা মনে পড়তে পারে। যেখানে অবস্থার দায়ে পন্ডিতমশাই পারিবারিক বৃত্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এদিকে 'পাদটীকা' গল্পে দেখি, লাটসাহেব চলে যাবার তিনদিন পর ফের বাংলা ক্লাস বসেছে। কথকের সঙ্গে কথাবার্তায় লাটসাহেবের কুকুরের কথা উঠল। যার একটা ঠ্যাং ট্রেনের চাকায় কাটা গিয়েছিল। এই কুকুরের জন্য খরচ হয় মাসে মোট পঁচাত্তর টাকা। তাহলে প্রতি ঠ্যাঙের জন্য পঁচিশ টাকা। এদিকে পন্ডিতমশাই-এর বেতন পঁচিশ টাকা। স্ত্রী, বৃদ্ধা মা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, একজন দাসী সহ মোট আটজনের সংসার। ক্লাসে তিনি জানতে চান- " এখন বল তো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাটসাহেবের কুকুরের কটা ঠ্যাঙের সমান?" বলা বাহুল্য কথক এই প্রশ্নে হতবাক হয়েছিলেন। মাথা নিচু করে বসে রয়েছেন। সারা ক্লাস নিস্তব্ধ- " ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে—কেউ বাদ যায়নি—পন্ডিতমশাই আত্মঅবমাননার কী নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে। " জগদ্দল নিস্তব্ধতা ভেঙে ক্লাস শেষের ঘন্টা কখন বেজেছিল সে হিসেব নেই। তবে সেই নিস্তব্ধতার নিপীড়ন স্মৃতি মুজতবা আলী ভুলতে পারেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সবসময় নিস্তব্ধতা হিরন্ময় নয়।

'চাচা কাহিনী' গ্রন্থের 'পাদটীকা' রচনাটি করুণ রসের। গল্পের অনেকটা জায়গা জুড়ে পণ্ডিতমশাই চরিত্রে কমিক উপাদান থাকলেও গল্পের শেষে ট্রাজেডি ঘনিয়ে ওঠে। গল্পটি ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যায় পন্ডিতমশাই- এর ব্রাহ্মণ পরিবারকে লাটসাহেবের কুকুরের পায়ের সঙ্গে তুলনা করবার মধ্য দিয়ে। শ্রেণীগত পরিচয়, বিদ্যানুশীলন সব কিছু নতুন সময়ে বিপন্ন। এ আসলে আত্মপরিচয়ের বিপন্নতা। ধুতি চাদর পরিহিত মানুষ এ সমাজে গেঞ্জি পরতে বাধ্য হন। যদিও এর সাথে মানিয়ে

উঠতে পারেন না। গল্পের শেষে আমরা বুঝতে পারি পন্ডিতমশাই কেন ক্লাসে পড়াতেন না, কেন বিড়বিড় করতেন, ঘুমোতেন। গল্পটিতে সংলাপের ব্যবহার এক আলাদা মাত্রা এনেছে। এই সংলাপ শুধু শিক্ষক ছাত্রের সংলাপ নয়, এই সংলাপ এক সময়ের সঙ্গে অন্য সময়ের। পরাধীন ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের স্বর, আত্মগ্লানির পরিচয় পাই আমরা। 'পাদটীকা' নামকরণটি লাটসাহেবের কুকুরের ঠ্যাঙের প্রসঙ্গে যেমন, তেমনি কোনও পড়া সার্থক হয় না তার পাদটীকা না পড়লে। সূত্রসংকেত। কিংবা চাবিকাঠি। টীকা শব্দটির মধ্য দিয়ে তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা জানি মুজতবা আলী বহুভাষাবিদ হলেও তাঁর হৃদয় ছিল খাঁটি বাঙালি। সেই লেখক শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁর লেখায় সমকাল ও চিরকালকে একসঙ্গে ধরতে পারেন। ইংরেজ আমলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিনিধি পন্ডিতমশাই-এর দুর্দশার মধ্য দিয়ে তিনি ছুঁয়ে ফেলেন সব সময়ের সংকটকেই। কোন পরিস্থিতিতে ক্লাসে একজন পন্ডিতমশাই এরকম কথা বলেন, তা ভাবা কষ্টসাধ্য নয়। এই লেখা আমাদের নিজেদের অতীতের দিকে, ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য করে। 'চাচা কাহিনী' গ্রন্থে এই লেখাটি ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠে না কেবল, কথকের শৈশবস্মৃতির সূত্র ধরে এমন এক বাস্তবতার জন্ম দেয়, যাকে অস্বীকার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আর তাই আমরা পাঠকেরাও পাঠসমাপ্তিতে বিচলিত হয়ে উঠি। একজন পণ্ডিতমশাই অস্তিত্বের যে পাঠ শেখান আমাদের, তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শাসক-শাসিতের শ্রেণীসম্পর্ক। এভাবেই 'পাদটীকা' হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক সময়ের অন্যতম দলিল।

চাচা কাহিনী ও নাৎসিবাদ :

'চাচা কাহিনী' এমন এক রচনা যাতে সমকালীন দেশ কালের ছাপ যেমন আছে, তেমনই সাহিত্যের শর্ত মেনেই তা চিরন্তন আবেদন বজায় রেখেছে। সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন বহু ভাষাবিদ এবং পৃথিবীর প্রচুর জায়গায় তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন জায়গার অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়। কাবুলে অধ্যাপনার সুবাদে তিনি লিখে ফেলেন 'দেশে- বিদেশে'র মতন বই। আমরা জানি জার্মান বৃত্তি নিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রথমে বার্লিন এবং পরে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। সময়কাল ১৯২৯- ১৯৩২। ১৯৩৩ সালে তিনি জার্মানি থেকে ফিরে এসেছিলেন। এই সময়ের প্রতিফলন আমরা পাই আলোচ্য গ্রন্থে। সবচেয়ে বড়ো কথা তিনি যে সময়ে জার্মানিতে ছিলেন সে সময়ে জার্মানীতে জাতীয়তাবাদ চরম আকার নিয়েছে। সৌজন্যে অ্যাডলফিহটলার। জন্ম ২০ এপ্রিল, ১৮৮৯। জন্মসূত্রে অস্ট্রিয়ান এই রাজনীতিবিদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

যোগদান করেছিলেন। বিশ্বযুদ্ধ শেষে প্রতিষ্ঠিত হয় National Socialist German Workers' Party সংক্ষেপে NAZI বা নাৎসি। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সময়কালে জার্মানি নাৎসি পার্টির অধীনে ছিল এবং ফিউরার বা নেতা হিসেবে ছিলেন হিটলার। এইসময় জার্মানি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়। নাৎসি দলের ২৫ দফা কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম ছিল বর্ণবাদ- বিশেষত ইহুদী বিদ্বেষ। জার্মান জনগণ নিজেদের আর্য জাতির বংশধর হিসেবে ভাবতে থাকে। অন্য জাতিদের ওপর আঘাত নেমে আসে। হিটলারের বিরুদ্ধ স্বর যে কোনো মূল্যে স্তব্ধ করা হতে থাকে। ভার্সাই সন্ধির তীব্র নিন্দা করে, চরম ইহুদি বিরোধিতার মধ্য দিয়ে, জার্মান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনার মাধ্যমে হিটলার ও নাৎসি দল মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক ও ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধাচারণ এবং ইহুদি বিতাড়ন ছিল তাদের লক্ষ্য। নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য রক্তমিশ্রণকে তারা এড়িয়ে চলতো সচেতনভাবেই। জাতির পবিত্রতা বজার রাখার একরকম সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা কাজ করেছিল সেসময়। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'চাচা কাহিনী'-তে নাৎসিদের কথা এসেছে স্বাভাবিকভাবেই। দেশপ্রেমের যে ধ্বজা উড়িয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচার ও প্রসার তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে 'কর্নেল' রচনায়।

এই লেখার প্রথমেই লেখক বার্লিনের দুরবস্থার কথা বলছেন- " ১৯১৪- ১৮-এর শ্মশান-ফেরত বার্লিন ১৯২৯-এও পৈতে উল্টো কাঁধে পরছে, এবং তাই গরীব ভারতীয়দের পক্ষেও সম্ভবপর হয়েছিল কুরফুর্স্টেন্ডামের গা ঘেঁষে উলান্ডস্ট্রাসের উপর আপন রেস্তোরা 'হিন্দুস্তান হৌস' পত্তন করার। " আর এই 'হিন্দুস্থান হৌসের সবচেয়ে বড় আড়কাঠি ছিলেন চাচা'। একদিন আড্ডায় শ্রীধর মুখুজ্যে জানান- বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপকের গীতা পড়ানোর সময় বলেছেন বর্ণসঙ্কর না হলে কোনো জাতির উন্নতি হয় না। এই থেকে প্রমাণ করা যায় গীতার প্রথম অধ্যায় গুপ্তযুগে লেখা। কেননা বর্ণসঙ্করের জুজু নাকি বৌদ্ধ যুগের আগে ছিল না। বর্ণসঙ্করের জুজুর সূত্র ধরেই এরপর চাচা মূল গল্পে প্রবেশ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। এইসময় ফন্ব্রাখেল কর্নেল ডুটেন্হফারের পরিবারকে সাহায্য করবার মনোবাসনা নিয়ে বিদেশি মুদ্রা উপার্জনের জন্য চাচাকে পেয়িং গেস্ট হবার পরামর্শ দেন। সঙ্গে এটাও জানিয়ে দেন যে চাচার উপকার করবার ভাব যেন প্রকাশ না পায়। চাচা যেন বলেন তিনি প্রাশান কর্নেলের কাছে উচ্চাঙ্গের জার্মান ভাষা পড়বার জন্যে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছেন। কর্নেল যখন জানতে পারলেন চাচা জার্মান বলতে জানেন, তারপর থেকে আর ইংরেজি বলেননি কোনোদিন। এক

বছর ধরে কর্নেল গ্যেটে পড়ালেন জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে- "এককথায় জর্মান দৃষ্টিবিন্দু থেকে তামাম ইয়োরোপের সংস্কৃতি- সভ্যতার সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস। পূর্ণ এক বৎসর ধরে গ্যেটের গোষ্পদে ইয়োরোপের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়েওঠা ইতিহাস-ঐতিহ্য বিম্বিত হল।" শুধুমাত্র গ্যেটে পড়াবার মধ্যে কর্নেলের জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের আভাস পাওয়া যায়। তিনি চাইতেন প্রাশান কৌলীন্য যাতে বজায় থাকে। অথচ তা যেন দম্ভপ্রসূত না হয়। সবার সঙ্গে পার্থক্য বজায় রাখার মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ধারণা যেমন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তেমনই তিনি চাইতেন যাতে রক্তসংমিশ্রণ না ঘটে। রক্তসংমিশ্রণ ঠেকাবার জন্য প্রাণবিসর্জন চাচার কাছে বাড়াবাড়ি ঠেকলেও আমরা এর থেকে নাৎসি জার্মানির খোঁজ পেতে পারি। কর্নেলের কথার মধ্যে ফ্রান্স বিরোধিতা স্পষ্ট হয়েছে। কাহিনির পরত খুলতে খুলতে চাচা জানিয়ে দেন ফ্রাউ ডুটেন্হকার-এর মর্মান্তিক জবানিতে- " আমাদের পরিবারের কথা কখনো পাড়বেন না। আমাদের ষোল বছরের ছেলেটি ফ্রান্সের লড়াইয়ে মারা গেছে, আমাদের মেয়ে--"। যে সমস্যা মানুষের মনকে আন্দোলিত করে তা নিয়ে মানুষ সাধারণভাবে আলোচনা করে কিন্তু হের ওবের্স্ট কখনো সে বিষয়ে কথা বলেননি।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে চাচা দেখলেন একটি যুবতী পেরেমবুলেটরের হ্যান্ডেলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছেন। চেহারা কর্নেলের মত ভারি সুন্দর। কথায় বুঝতে পারলেন এই মেয়েটি তাঁদের কিন্তু কর্নেল তাঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন ফরাসি অধ্যাপককে বিয়ে করার অপরাধে। চাচা সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করে মেয়েটির পক্ষ নিয়ে কর্নেলের স্ত্রীকে অনুরোধ করলেও কোনো কাজ হয় না। তিনি পাথরের মত বসে আছেন। প্রাশান এটিকেট লঙ্ঘন করেই যেন চাচা মেয়েটিকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন এবং তাঁর ঠিকানা টুকে নিয়ে এলেন। এসে টেবিলের ওপর যে চিঠি দেখতে পেলেন তাতে অবিলম্বে বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ। চাচা কর্নেলের বাড়ি ছাড়ার এক বছরের মধ্যে কর্নেল মারা যান। আর এই সময় তিনি কোনো পেয়িং গেস্ট রাখেননি, প্রায় উপবাসে মৃত্যু বরণ বলা চলে। জাতিগত বিদ্বেষের কারণে তিনি মেয়েকে কাছে রাখলেন না। এদিকে পুত্র যুদ্ধে মারা গিয়েছিল। দেশ ও জাতির প্রশ্নে নিজের সন্তান বিসর্জন এবং সন্তানশোক সহ্য করবার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের এক ছবি ফুটে ওঠে। রক্তের বিশুদ্ধতা বজার রাখার সংকল্প সেখানে মানবিকতাকে হারিয়ে দেয়। নাৎসি দলের আদর্শ কীভাবে একটি পরিবারের জীবনে ছাপ ফেলেছিল, এই গল্পটি তাঁর প্রমাণ হতে পারে। চরম এবং মর্মান্তিক সে আখ্যান। হৃদয় থাক আর নাই থাক, প্রতিজ্ঞার যেখানে অন্যথা হয় না।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

'কর্নেল' গল্পে নাৎসিবাদ প্রকাশের মধ্যে একজন মানুষের দেশপ্রেমের পরিচয় পেয়েছি আমরা। আর যেসময় এই গল্পটি লেখা সে সময় নাৎসিবাদ তার স্বরূপ নিয়ে ভয়ার্ত করেনি পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষকে। 'কর্নেল' গল্পের রক্ষণশীল দেশপ্রেম যেন পরবর্তীকালের নগ্ন জাতীয়তাবাদের রূপ ধারণ করেছে 'বেলতলাতে দু-দুবার' গল্পে। এই গল্পের প্রথমে লেখক জানাচ্ছেন- " নাৎসিদের প্রতাপ দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আড্ডার তাতে কোনো আপত্তি নেই, বরঞ্চ খুশি হবারই কথা। নাৎসিরা যদি একদিন ইংরেজের পিঠে দু-চার ঘা লাগাতে পারে তাতে অন্তত এ আড্ডার কেউ বেজার হবে না। বেদনাটা সেখানে নয়, বেদনাটা হচ্ছে দু- একটা মূর্খ নাৎসিকে নিয়ে। ফর্সা ভারতীয়কে তারা মাঝে মাঝে ইহুদি ভেবে কড়া কথা বলে, আর এক নাক- বাঁকা নীল- চোখো কাশ্মীরীকে তারা নাকি দু- একটা ঘুষিঘাষাও মেরেছে। " ১৯২৯ –এর অর্থনৈতিক মন্দা জাতির জীবনকে যে তছনছ করে ফেলেছিল সে কথা আমরা আগেই জেনেছি। ইহুদি বিতাড়ন করলেই এ দেশের মানুষেরা স্বর্গরাজ্য পেয়ে যাবে এই ভাবনা গ্রাস করেছিল যুবসমাজকেও। দলে দলে তারা নাৎসি সমর্থক হয়ে যাচ্ছিল। এই গল্পের মূল চরিত্র অস্কারের কথা এনেছেন লেখক সেদিনের আড্ডায়। ইংরেজ এবং জার্মানরা যুদ্ধে পরস্পরের বিরোধী ছিল, আবার লেখক ইংরেজের উপনিবেশের মানুষ। এই গল্পে সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং উপনিবেশের মানুষের অভিজ্ঞতার এক আশ্চর্য রসায়ন ফুটে ওঠে লেখকের মুন্সিয়ানার মধ্য দিয়ে, রম্য রচনার আড়ালে অন্ধ জাতীয়তাবাদের বিপদজনক দিকটিও অবলীলায় ধরা দেয় পাঠকের চোখে। মিউনিকের মাইল পনেরো দূরে এক ছোট্ট গ্রামে যে বাড়িতে লেখক থাকতেন, সেই মুদির সংসারের বড়ো ছেলে অস্কার। অস্কার শিল্প রসিক এবং মাতাল। আঠারো বছর বয়সে চাকরি পেয়ে প্রতি রাতেই বিয়ার খেয়ে সকালে মদ ছাড়ার শপথ নিয়েছে। এইভাবেই বয়স বাইশে ঠেকেছে। অস্কার ছিল পাঁড় নাৎসি। চাচা একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেন- 'নাৎসি পার্টিতে টাকা ঢালছো কেন?' এর উত্তরে সে জানায়–'তাই দিয়ে বন্দুক- পিস্তল কিনে বিদ্রোহ করবে, তারপর ফাঁসিতে ঝুলবে বলে।' কিংবা চাচার মনে হয়েছিল মিশনারিদের আফ্রিকায় ধর্মপ্রচার বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু অস্কার বলে বসে- "তাহলে দুর্ভিক্ষের সময় বেচারী নিগ্রোরা খাবে কী? মিশনরির মাংস উপাদেয় খাদ্য!" অস্কারের কথাবার্তা থেকেই স্পষ্ট বিদ্বেষবোধ। চাচার সঙ্গে অস্কারের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সে সম্পর্কে ছেদ পড়ে। একদিন রবিবার সকালে অস্কারের বোন চেঁচিয়ে খবর কাগজ পড়ছিল যেই অংশে নাৎসি পতাকা দেখে মাথা নত না করায় এক ইহুদিনীকে নাৎসিদের প্রহারের কথা বর্ণিত হয়েছে। নাৎসি গুন্ডাদের সম্পর্কে লেখক বিরক্তি প্রকাশ করলে অস্কার

জিজ্ঞেস করে- " জাতির পতাকার সম্মান যারা বাঁচাতে চায় তারা গুন্ডা?" চাচা কিছু বলার আগেই অস্কারের বুড়ো বাবা উত্তর দিয়ে দেন – " ওটা জাতির পতাকা হল কী করে? ওটা তো নাৎসি পার্টির পতাকা।' দু- এককথাতেই চাচা ইহুদিদের সমর্থন করেন কিনা এই প্রশ্ন তুলে বসে। চাচা প্রশ্নটিকে অবান্তর বললে অস্কার বলে চলে- " প্রশ্নটা মোটেই অবান্তর নয়। ইহুদীরা যতদিন এদেশে থাকবে ততদিনই বর্ণসঙ্করের সম্ভাবনা থাকবে। জর্মনির নর্ডিক জাতের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে"। এরপর চাচা বর্ণসঙ্করের ধারণাকে খণ্ডন করে বলেছেন ভারত কিংবা জার্মানির প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি আর্য অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণ। এই কথা শুনে অস্কার আরো ক্ষেপে যায়। খাঁটি আর্যত্বের প্রশ্নে অটল অস্কার হুঙ্কার তুলে চাচাকে বলে- " আপনি বলতে চান, আমাদের সুপারম্যানরা সকলেই বাস্টার্ড?" সেদিনের কথোপথনের পর এক বছর কেটে গিয়েছে। র্যোনডর্ফের সাম্বৎসরিক মেলা উপস্থিত। বুড়োবুড়ি এবং মারিয়া নেমন্তন্ন করতে এসেছেন। চাচার দ্বিধার কারণ বুঝতে পেরে মারিয়া জানিয়েছে এ কদিন অস্কারের সঙ্গে দেখা হলেও সে চিনতে পারবে না কেননা অস্টপ্রহর ছুটি নিয়ে সে বিয়ার খায়। কীভাবে তার সঙ্গে চাচার দেখা হল এবং এক অর্থে ত্রাণকর্তা হয়ে উঠল অস্কার, সে সম্পর্কে পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। তবে এই অংশেও নাৎসিবাদী উপস্থিত। নাৎসির প্রেমিকা চাচার প্রতি মুগ্ধ হলে যে কৌতুকের সৃষ্টি হয় তার মধ্যেও শোনা যায় – " যত সব ইহুদি আর বাদ বাকি কালা- আদমি নেটিভরা এসে এদেশের মানইজ্জৎ নষ্ট করে ফেললো! এই করেই বর্ণসঙ্কর হয়...দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে..." ইত্যাদি ইত্যাদি। সবচেয়ে বড়ো কথা মিথ্যে দোষারোপের স্বপক্ষে সে দু-একজনের সায় পাচ্ছে। চাচার প্রতি জনতার দৃষ্টিও পাল্টে গেছে। সামাজিক মনস্তত্ত্বের এক অব্যর্থ নিদর্শন পাই এই লেখায়। নাৎসি ড্রাগনের হাত থেকে চাচাকে নাৎসি অস্কার উদ্ধার করলেও বিজাতীয় হিসেবে ততক্ষণে জোর শিক্ষা হয়ে গেছে চাচার। গল্পটির শেষে এক কপোতির প্রশ্নে চাচার চম্পটের কথা আছে। হাসির মোড়কে এই গল্পে নাৎসিদের অন্ধ জাতিবিদ্বেষ এবং নর্ডিক জাতির পবিত্রতা রক্ষার ভুল ধারণাকে তুলে ধরা হয়েছে। এই রচনা তৎকালীন নাৎসিপ্রভাবিত জার্মানির বিশ্বস্ত দলিল হয়ে ওঠে। কোনো এক দলের পতাকা যে জাতির পতাকা নয় এই বোধ আজকের সময়েও প্রাসঙ্গিক।

'কর্নেল' গল্পে নাৎসিবাদের তত্ত্বের প্রকাশ দেখা গেছে বেশি সেখানে 'বেলতলাতে দু'দুবার' গল্পে যেন তারই ব্যবহারিক প্রয়োগ। কর্নেল স্থির, শান্ত, প্রাজ্ঞ। অস্কার ততটাই অসংযত। দুইজনের বয়সের ব্যবধানও লক্ষ করার মতো। আলাদা আলাদা প্রজন্ম কীভাবে নাৎসিবাদের শিকার, লেখক কী সেটা দেখাতে চেয়েছেন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

নাকি দুটি গল্পের সময়ের ব্যবধান মানসিকতার পরিবর্তনকে সূচিত করে। কর্নেল চরিত্রের যন্ত্রণা অস্কারের চরিত্রে নেই। কর্নেল নিজের মৃত্যুকে নিজের জেদের বশে ত্বরান্বিত করেছেন। অস্কারের অল্প বিস্তর গুণ থাকলেও নেশায় তা দূরীভূত হয়েছে। আদতে কোনো মনোভাব যখন অন্ধত্বের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, মানবিকবোধ থেকে মানুষ ক্রমশ দূরে চলে যেতে থাকে। কল্পনার ফানুস মানুষকে প্রমত্ত করে তোলে। আর এর লাভ নিতে থাকে জাতীয়তাবাদী নেতারা। রক্ষণশীল দেশপ্রেমের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদী রূপ নেওয়ার ছবি হয়তো লেখক এই দুটি গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে নাৎসিবিরোধী স্বরের প্রস্তাবনা কিংবা প্রশ্নের অবতারণা 'চাচা কাহিনী'কে বহুস্বরমন্ডিত করে তোলে।

মূল্যায়ন :

"আমরা বাংলা গদ্য লিখতে গিয়ে অনেকেই ইংরেজী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করি, কিন্তু অচেনা আরবী- ফার্সী শব্দ সম্পর্কে কি রকম যেনো একটা শুচিবাই-এর ভাব। সৈয়দ মুজতবা আলী সমস্ত সংস্কারের বাঁধ ভেঙে দিয়েছিলেন। কোন ভাষা থেকে যে কোন শব্দ নিয়ে এসেছেন প্রয়োজন মতন, হোক না আরবী কিংবা নিছক হয়নি ঠিক হলো না। তিনি লিখতে জানতেই, তাই যা খুশী লিখেছেন। ··· সাহিত্য ক্ষেত্রে খুব রসিক বলে পরিচিত তারা কদাচিৎ নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করতে সাহস পান। " (মানুষ মুজতবা আলী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) একজন লেখকের সবচেয়ে বড়ো স্বীকৃতি উত্তরসূরীদের কাছে গৃহীত হওয়ায়, একক ব্যক্তিত্ব অনায়াসে প্রভাবিত করে ফেলেন অগণিত সাহিত্যসাধকদের। ভাঙাগড়ার খেলায় সিদ্ধি তখনই সম্ভব যখন লেখক আয়ত্ত করেন শিল্পের অধরা মাধুরীকে। বলা হয়ে থাকে যে শিল্পের ইতিহাস আসলে টেকনিকের ইতিহাস, সে হিসেবে 'চাচা কাহিনী' রসসাহিত্য হয়ে ওঠার মূলে কী কী বিষয় কাজ করেছে তা আমাদের নিবিড় পাঠের অপেক্ষা রাখে। " আমরা সাধারণত যে জার্মানীকে জানি, শিলার গ্যয়টে অথবা হাইনের রচনায়, মুজতবা আলীর জার্মেনী সে জার্মেনী নয়, তাঁর জার্মেনী হচ্ছে প্রতিদিনের কর্মকান্ডে প্রবাহিত নগর- জীবনের বিচিত্র মানুষের অবসর- মুহূর্তের জার্মেনী। এ জার্মেনীকে দেখা যায় বিভিন্ন শহরের বিয়ারের আড্ডায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ক্লাবের সভায়, যন্ত্রণার মধ্যেও রহস্যপ্রিয়তায়। বিদেশীরা সাধারণত এ জার্মেনীকে দেখে নি। মুজতবা আলীর সৌভাগ্য যে তিনি সে জার্মেনীকে দেখেছিলেন। এত অন্তরঙ্গভাবে একটি জাতির পরিচয় উদ্ঘাটন করা সহজ ক্ষমতার পরিচায়ক নয়।... তিনি জার্মেনীর আর্তনাদকে দেখেছেন, তার বেঁচে থাকার প্রয়াসকে দেখেছেন এবং তাকে একটি উজ্জ্বল সমৃদ্ধির মধ্যে দেখেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি এ পরিচয়গুলো তথ্যভারাক্রান্ত

গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন নি। জার্মেনীর বিচিত্র স্বভাবের মানুষের মধ্যে তিনি জার্মেনীকে আবিস্কার করেছেন। "- সমালোচকের এই মন্তব্য স্বীকার করে নিতে বাধা থাকে না। এ কথা খুব সত্যি যে দেশ কেবল মানচিত্রে থাকে না, দেশ থাকে মনচিত্রে। যে জীবন অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে চলে, যে জীবন সন্ধানী আলো ছাড়া ধরা যায় না, সৈয়দ মুজতবা আলী সে জীবনের কথাকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব। 'চাচা কাহিনী'তে যে মানুষগুলির ছবি তিনি এঁকেছেন, তারা সকলেই জীবন্ত। রাগে- দুঃখে- আনন্দে- হাসিতে পুরো মানুষ। দেশ কাল আলাদা হলেও আমাদের মনে স্থান পেতে তাদের অসুবিধা হয়নি। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব লেখকের প্রাপ্য। লেখকের জীবনবোধ এতটাই ব্যাপ্ত, অভিজ্ঞতার পৃথিবী এতটাই প্রসারিত, খুব সহজেই বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেন। ইতিহাসকে এমন আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন, ধরা যায় না। আসলে কিছুই যেন উদ্দেশ্যমূলক নয়, স্বাভাবিকভাবেই উৎসারিত।

"মুজতবা আলীর ছোটগল্পের বড় বৈশিষ্ট্য আড্ডার মধ্যেই নিটোল গল্প তৈরী হয়ে যাওয়া এবং অবলীলায়। 'স্বয়ংবরা' গল্পে তাই ঘটেছে। সমস্ত গল্পেই চাচা মধ্যমণি। নিজেকে নায়ক করে গল্পের আরম্ভ ও শেষ ঘটিয়েছে চাচা। প্রত্যেকটি গল্পের শেষে যেমন হিউমার আছে, তেমনি আছে হাল্কা বিষাদ। " (সৈয়দ মুজতবা আলীর ছোটগল্প, বীরেন্দ্র দত্ত) "সত্যই তাঁর লেখার ঢঙ্‌একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব- এ ঢঙ্‌বৈঠকী আলাপের ঢঙ্‌, লিখিত সাহিত্যের রচনারীতিতে এ বস্তু নিতান্তই দুর্লভ। মৌলিক বিচারে মুজতবা আলী প্রধানতঃ একজন শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের আলাপন-শিল্পী—নেহাৎই দৈবক্রমে এবং আমাদের নিয়েছেন তাঁর লেখনীকে। " (জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ভূমিকা, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, নবম খন্ড) প্রাবন্ধিক খুব সুন্দরভাবে বলেছেন সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখায় উঠে আসা আড্ডার কথা " …সুপণ্ডিত বিদগ্ধজনের আড্ডা; এ আড্ডায় যে-সব আলোচনা হয় তার মধ্যে বিদ্যার কৌলীন্য আছে কিন্তু আস্ফালন নেই, জ্ঞানের গৌরব আছে কিন্তু পেচক- গাম্ভীর্য নেই, সমালোচনা আছে কিন্তু ঈর্ষা বা অসূয়া নেই, রস ও রসিকতা আছে কিন্তু অশ্লীলতা নেই। " মুজতবা আলী কখনই পাঠকের থেকে উঁচু আসনে বসে কথা বসেন না। তিনি আর তাঁর পাঠক একই তলে অবস্থান করেন, নাহলে সখ্য গড়ে উঠবে কী করে? আর বিষয় কোনও স্থির থাকে না যেমন আড্ডায় তেমনি কথার পাল্টে কথায় চাচা কাহিনীতেও আমরা পাই আশ্চর্য কথামালা। এ গল্পের থেকে অন্য গল্প, এভাবে মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলে আখ্যান, সবচেয়ে বড় কথা পাঠক কখনই খেই অবসন্ন হয়ে যান না। হাসিখুশি পাঠে এ এক নতুন বর্ণ পরিচয়। আর পাণ্ডিত্য তাঁর লেখাকে

টিপ্পনী

ভারাক্রান্ত করেনি। রচনা মাধুর্য কোথাও ব্যাহত হয়নি। যে প্রাঞ্জলতা তিনি পাঠককে উপহার দিয়েছেন তা অনেক পরিশ্রমের ফল। প্রতিভা ও প্রেরণার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এ প্রসঙ্গে।

টিপ্পনী

" হাস্যরস অমনিবাসের সবচেয়ে কঠিনতম অধ্যয়ন হল 'হিউমার'। যার সঙ্গে কিছুটা হৃদয়বেত্তা কিছুটা পাণ্ডিত্য জড়িয়ে। দু'য়ের সঠিক মিশেল একটা অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয় মানুষকে। তখনই তাকে 'রসিক' বলা যায়। সেই তালিকায় ভারি মুষ্ঠিমেয় ক'জন—তাঁদেরই অন্যতম বিশিষ্টজন -– সৈয়দ মুজতবা আলী। " অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'সংবাদ প্রতিদিন' এর রোববার সংখ্যায়, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ –য়। আমাদের মনে পড়তে পারে শংকরের 'চরণ ছুঁয়ে যাই' বইটির প্রথম খন্ডের কথা। যেখানে শংকর স্মৃতি চারণা করেছেন রবীন্দ্রনাথের পর ইদানীংকালে সর্বাপেক্ষা উদ্ধৃত লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীকে নিয়ে। দুজনের কথোপকথনে উঠে এসেছে প্রাসঙ্গিক কিছু কথাবার্তা। শংকরের মতে মুজতবা আলী "… বাংলা সাহিত্যের ড্রইং রুমে সুরুচি ও সুশিক্ষাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। বাঙালি- মনের বন্ধ দরজা- জানালা খুলে দিয়ে সেখানে দেশ- বিদেশের হাওয়া ঢুকিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আপনি কুতুবমিনারের মতো তুলনাহীন। আপনার সঙ্গে তুলনীয় কোনো লেখক আপনার আগেও নেই পরেও নেই। " এর পর আলীসাহেব স্বভাবসিদ্ধ বিনম্র ভঙ্গিতে এই কথা এড়িয়ে গিয়ে বললেন- " তবে ভাষার দিক দিয়ে আমি একটু সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করেছি। গুরু এবং চণ্ডালকে এক পঙ্ক্তিভোজনে বসিয়ে দিয়েছি-গুরুচন্ডালি দোষ যে আসলে গুণ তা গৌড়জনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। সেদিক থেকে আমি স্বামী বিবেকানন্দের চেলা। তোমরা অন্তত আমাকে সেইভাবে মনে রেখো। " একজন লেখক নিজের সম্বন্ধে যখন মূল্যায়ন করেন সেটি আমাদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ববাহী হয়ে ওঠে। সৈয়দ মুজতবা আলী এক কথায় অনন্য। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই।

'দেশভ্রমণ' রচনায় সৈয়দ মুজতবা আলি গ্যেটের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন- "চরিত্রবল সৃষ্টি করতে হলে জনসমাজে মেশো, কিন্তু যদি প্রতিভার সম্যক প্রস্ফুরণ তোমার কামনা হয়, তবে সাধনা কর নির্জনে। " 'দেশে বিদেশে'-র লেখক নিছক দর্শকের আমোদে দেশ দেখেননি, স্রষ্টার আনন্দ তাঁর মনে ক্রিয়াশীল ছিল। আর যার নমুনা আমরা পাই 'চাচা কাহিনী'তেও। আমরা যদি বলি 'সুন্দরের পরিপূর্ণ আনন্দ-রূপের ধ্যানের বীজমন্ত্র' তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, তবে ভুল বলা হয় না।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলীর

তৃতীয় খণ্ডে ভূমিকা লিখেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কিছু কথা প্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে আমাদের আলোচনায়- " ... ভাষা বহতা নদীর মতন। যদি তার স্বাস্থ্য ভালো থাকে, তা হলে যেখানে থেকে যাই সংগ্রহ করুক, কিছুতেই তার অঙ্গে মলিনতার স্পর্শ লাগে না। এই ব্যাপারটি আমাদের সবচেয়ে স্পষ্ট বুঝিয়েছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। এই দিক থেকে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর সার্থক উত্তরাধিকারী। সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষাশিল্প সম্পর্কে গভীর আলোচনা হওয়া উচিত। " সৈয়দ আলী আহসান লেখকের রচনাবলীর পঞ্চম খন্ডের ভূমিকা লিখতে গিয়ে শব্দের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এটা তো খুব সত্যি যে সাহিত্য শুধু ভাবে নয় ভাষায় লেখা হয়। যেমন ম্যালার্মে বলেছিলেন কবিতা সম্পর্কে। পাঠকের বুদ্ধিকে পরিশীলিত করা, আবেগকে পরিশুদ্ধ করেন লেখকেরা শব্দের মধ্য দিয়ে। আমাদের প্রয়োজনের পৃথিবী থেকে, দৈনন্দিন ব্যবহারিক পৃথিবী থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটে এক অপূর্ব আনন্দের জগতে, তার মূলে শব্দ। সাহিত্যের ভুবন তাই শব্দ ভুবন। " সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে হলে আমাদের ভাষায় জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে ব্যবহৃত শব্দের প্রতাপের কথা বলতে হয়। যেভাবে তিনি শব্দকে ব্যবহার করেছেন , শব্দকে তার বহুবিধ লৌকিক অঞ্চল থেকে মুক্ত করে সাহিত্যে প্রবাহিত করেছেন, মানুষের উচ্চারণগত বাণীভঙ্গীকে নির্মিত বাক্যের মধ্যে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন তার তুলনা হয় না। তিনি নিজেই নিজের তুলনা।" এরপর " বাংলা শব্দ-ব্যবহারের বিচিত্র দ্যোতনায় মুজতবা আলী নিঃসন্দেহে এক অনন্য সমৃদ্ধমান ব্যক্তি। "

সমালোচকদের আলোচনা থেকে লেখকের বিভিন্ন পরিচয় ফুটে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থের সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে মনে গিয়ে আমাদের মনে হচ্ছে সৈয়দ মুজতবা আলীর 'চাচা কাহিনী'-কে এককথায় মিশ্র সংরূপ বলা যেতে পারে। সাহিত্যের পাঠকেরা অবগত আছেন যে সাম্প্রতিককালে সাহিত্যের সংরূপগত বিভাজনের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। একটি টেক্সট সমন্বিত হচ্ছে অনেক সংরূপের বিশিষ্টতা নিয়েই। 'চাচা কাহিনী' যেমন রম্যরচনা, তেমনই একে ছোটোগল্প হিসেবে পড়া যেতে পারে। বৈঠকি সাহিত্যের গড়নে মুজতবার হাল্কা মেজাজের ভেতর সংবেদনশীল মনের খোঁজ মেলে যা পাঠকের তন্ত্রীতে আলোড়ন তোলে। এককথায় সৈয়দ মুজতবা আলীর 'চাচা কাহিনী' রসসাহিত্যে উন্নীত হয়েছে। কীভাবে একটি বস্তু সাহিত্য হয়ে ওঠে তার কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা যেন 'অন্তহীন দ্রৌপদীর শাড়ি'। তবু সে চেষ্টা চলতেই থাকবে। আর এভাবেই গড়ে উঠবে নতুন নতুন পাঠ পরিসর । বাংলা সাহিত্য কেন বিশ্বসাহিত্যেও এই আখ্যানের জুড়ি মেলা ভার।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী :

ক. চাচাকাহিনী'র স্বয়ংবরা গল্পটি সম্পর্কে লেখো।

খ. 'কর্ণেল' গল্পের কর্ণেল চরিত্র সম্পর্কে লেখো।

গ. 'বেলতলাতে দু'বার' গল্পের মূল ভাববস্তু বিশদ করো।

ঘ. বেঁচে থাকো সর্দি কাশি - গল্পের হাস্যরস আলোচনা কর।

ঙ. বৈঠকি সাহিত্য হিসেবে 'চাচাকাহিনী'র সার্থকতা বিচার করো।

চ. চাচাকাহিনী ও নাৎসিবাদ কিভাবে মিলে মিশে একাকার হয়েছে - আলোচনা করো।

চতুর্থ একক :ভ্রমণসাহিত্য

মরুতীর্থ হিংলাজ : অবধূত

ভ্রমণ সাহিত্য : সংজ্ঞা ও স্বরূপ

টিপ্পনী

এগিয়ে চলা মানুষেরই একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আর এই এগিয়ে চলাই মানুষকে দিয়েছে নতুন কিছুকে জাগার, চেনার আগ্রহ। আদিম গুহাবাসী মানুষদের কাছে অবশ্য এই চলাটা অনুসন্ধান কিংবা শখ ছিল না, ভ্রমণ ছিল তাদের প্রয়োজনের অঙ্গ। কখনো খাবারের উদ্দেশ্যে, কখনো জলের সন্ধানে, আবার কখনো বা পশুপালনের স্বার্থে তাদেরকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে ফিরতে হয়েছে। তবে মানুষ যত সভ্য হয়েছে, শহরাভিমুখী হয়েছে, কাজের তাগিদে ও কাজের চাপে ক্রমশ তারা বন্দী হয়ে গিয়েছে চার দেওয়ালের মধ্যে। নিত্য কর্মব্যস্ততা তাকে করে তুলেছে প্রকৃতি বিমুখ। এখন মানুষের কাছে ভ্রমণ হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনে স্বাদ বদলাবার একটি নতুন উপায়। নিত্য নৈমিত্তিক এক ঘেয়ে জীবন যখন মানুষকে কোনঠাসা করে দেয় তখন সেই অসুস্থতাকে সাচরাবার সবচেয়ে সেরা ঔষধ এই ভ্রমণ। অবশ্য অনেকের কাছেই ভ্রমণ শুধুমাত্র চর্মচক্ষু দ্বারা অনুভব। তবে সৃষ্টি শীল মানুষেরা তাঁদের এই জীবনের অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখতে চান কোনো না কোনো ভাবে। কেউবা চিত্র গ্রহণে আবার কেউবা চলমান চিত্রে। প্রাচীন যুগে অবশ্য এসব ব্যবস্থা বিশেষ ছিল না। তাই মানুষ তার এই সব স্মৃতিকে ধরে রাখতে সাহায্য নিয়েছে দিনলিপির কিংবা স্মৃতিকথা রচনার মধ্য দিয়ে। আর এই সব টুকরো অভিজ্ঞতাই জন্ম দিয়েছে ভ্রমণ সাহিত্যের। অবশ্য এই অভিজ্ঞতাই জন্ম দিয়েছে ভ্রমণ সাহিত্যের। অবশ্য এই অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। কখনো তা হয়ে উঠেছে ভ্রমণ ডায়রি আবার কখনো বা শুধু মাত্র ভ্রমণের কথা ও কাহিনি। সর্বোপরি এ সব সংরূপই ভ্রমণ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

ভ্রমণনের তেমন সংজ্ঞায়ন বোধহয় আজ পর্যন্ত হয় নি। ভ্রমণ মানে বলা যেতে পারে। স্বস্থান ত্যাগ করে স্বল্প অথবা দীর্ঘ সময়ের জন্য অন্যত্র অথবা দূরে কোথাও যাত্রা করা। 'ভ্রমণবার্তা পত্রিকার সমপাদক প্রমোদাদিত্য মল্লিক মহাশয় অবশ্য 'দৈনন্দিন কর্মস্থানের বাইরে যে কোনো স্থানে যাওয়া' কেই ভ্রমণ বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানে উদ্দেশ্যটা কখনোই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই বলা বাহুল্য, একে ঠিক সংজ্ঞার মাণ্যতা দেওয়া যায় না। সেতুলনায় জর্জ গ্রিণগ্রাস যে মন্তব্যটি করেছেন তা অনেক বেশি কার্যকরী।

টিপ্পনী

তিনি বলেছেন -

> "The essence of travel is displacement a displacement in time, in space and in social hierarchy, an estranges from the protective enviroment of the familiar inordedr to discover the newness of one self and of things.

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ভ্রমণের সার কথা হল স্থানত্যাগ বা স্থানচ্যুতি । এই স্থানচ্যুতি কখনো বা কালগত, স্থানগত আবার কখনো সামজিক পরিবেশগত।

মধ্যনযুগে এ ধারণের পচরিবর্তন ঘটেছে অনেকটাই। মূলত প্রকৃতির আকর্ষণে, অসুস্থ শরীরকে সুস্থ করতে, তীর্থ দর্শনে অথবা চাকুরি ব্যবসা শিক্ষার জন্য মানুষ একস্থান থেকে অন্যত্র গিয়েছে। এ মাত্রই মূলত পর্যটন নামে পরিচিত।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে পূর্ববর্তি ধারণাগুলোর আরো সংকোচন হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু মাত্র অবসর বিনোদন অথবা উদ্দেশ্যহীন ভাবে নিছকই আনন্দ লাভের জন্য স্থানান্তরে গমণ হল ভ্রমণ।

এ তো হল ভ্রমণের নানা দিক ও তার গতি প্রকৃতি। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে ভ্রমণ সাহিত্য কাকে বলা যায়। জন্মের পর থেকেই প্রায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে সৃষ্টিশীল ক্ষমতার বিকাশ ঘটতে থাকে। অবশ্য সবাই এই সৃষ্টিশীলতাকে সর্বসমকে প্রকাশ করে উঠতে পারে না। যাঁরা পারেন তাঁরাই জগতে কোনো না কোনো ভাবে রেখে যান নিজের সৃষ্টি ছাপ। একজন সৃষ্টিশীল মানুষ যখন ভ্রমণ করেন তখন তাঁর চর্মচক্ষে যা ধরা পড়ে তার তুলনায় মানস কল্পনায় বীজ বোনে আরো বহু কিছু। আর তাঁদের সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যখন মানসচক্ষু দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে পাঠক কিংবা শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপিত হয় তখন তা শুধুমাত্র একটি ভ্রমণ কাহিনি বা টুকরো ঘটনার সংকলন হিসাবে প্রকাশ পায় না, তা নবতর এক মর্যাদা পায়। উন্নীত হয় সাহিত্যের স্তরে। যদি একটি ভ্রমণ সাহিত্যকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে সেখানে রয়েছে রচনাকারের নিজস্বতা। এই নিজস্বতা কে যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে দেখা যায় সেই ভ্রমণ সাহিত্যটিও সাহিত্যের মূল শাখা তথা গল্প উপন্যাসের মতোই। লেককেদর এই নিজস্বতা সেই গল্প কিংবা উপন্যাসকে একটি নতুন শিল্পের স্তরে উন্নীত করে। ভ্রমণ কাহিনী রুপ পায় ভ্রমন সাহিত্যে।

সংলাপ গত দিক থেকে এই ভ্রমণ নানা ধরণের অভিজ্ঞতা সম্বলিত হয়ে

সাইত্যের আকারে বারবার আত্মপ্রকাশ করেছে। কখনো তা হয়েছে দিচনলিপি আবার কখনো বা নিছকই বর্ণনাধর্মী। দুর্গম পাআড়ে ভ্রমণ, পদব্রজে যাত্রা, রলের পথে ওভ্রমণ কিংবা সমুদ্র পাড়ি - সবধরনের অভিজ্ঞতাই নিজেদের রং রূপ পাল্টে আকার নিবেছ ভ্রমণ সাহিত্যের। আবার কখনো এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে গাইড়বুকের মতো। যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণ কাহিনীতগুলি উল্লেখ্য। 'বর্দ্ধমান ভ্রমণ, কাশীযাত্রা, উড়িশ্যা ভ্রমণকালে পুরী দর্শন 'শতদ্রু নদী তীরে - এই সমস্ত ভ্রমণ কাহিনীগুলি পাঠ করলে বোঝা যাবে এগুলি ভ্রমণ বৃত্তান্ত কিংবা ভ্রমণ সাহিত্যের পাশাপাশি অনেকটা গাইড় বই এর মতো। এগুলিতে যেমন রয়েছে পথ ও প্রকৃতির বর্ণনা,তার পাশাপাশি রয়েছে পরিভ্রমণরত স্থানের মানুষজনের পরিচয়, সাধু মহান্তদের সাথে সাক্ষাত ও ধর্ম দর্শন তত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা ইত্যাদি।

আরেকটি বড় পার্থক্যের জায়গা হল ভ্রমণ কাহিনী ও ভ্রমণ সাহিত্য। এই দুই প্রকরণ অনেকটা একই কিংবা কাছাকাছি দেখতে শুনতে হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। এক কথায় বলতে গেলে সমস্ত ভ্রমণ সাহিত্যই হল ভ্রমণ কাহিনি, কিন্তু সব ভ্রমণ কাহিনী ভ্রমণ সাহিত্য নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, ভ্রমণ সাহিত্যে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ লেখকই তাঁর সৃষ্টি কৌশল ও মননের মধ্য সিয়ে একটি নিছক কাহিনীকে দেন শৈল্পিক মর্যাদা। যার ফলে ফুটে ওঠে দেশ কালের খন্ডিত জীবনের একটি অখন্ড শাশ্বত রূপ। তার তখনই একটি সামন্য ভ্রমণ কাইনীও অসামন্য রূপ নিয়ে হয়ে ওঠে ভ্রমণ সাহিত্য।

অবশ্য বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে ভ্রমণ কাহিনী ও ভ্রমণ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি অএক ক্ষেত্রে একই। যদিও শিল্পগত বিচারে এদেদর মধ্যে ব্যবধান অনেক হতে পারে তাও এই দুটি সংরূপোকে আমরা নিম্নলিখিত কিছু বৈশিষ্ট্যে বিভাজন করতে পারি -

(১) ভ্রমণ কাহিনী বা ভ্রমণ সাহিত্য সর্বদাই উত্তম পুরুষের অর্থাৎ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত হয়।

(২) ভ্রমণ সাহিত্য বা কাহিনীর মূল ও কেন্দ্রীয় বিষয় হল কোনো স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। তবে আঙ্গিক গত ভাবে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় অনেক ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কখনো তা বর্ণিত হয় পত্রসাহিত্যের আকারে আবার কখনো ডায়রির আকারে। আবার কখনো বা তা হয়ে ও ঠে শুধুই বর্ণনামূলক। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিবেকানন্দের অধিকাংশ ভ্রমণ পত্রের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আকারে লিখিত। ডায়রি সাহিত্যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত রয়েছে যদুনাথ সর্বাধিকারীর 'তীর্থভ্রমণ' বইটিতে। আবার প্রবোধ সান্যাল, শঙ্কু মহারাজ প্রমুখেদরা তাঁদের ভ্রমণকে লিপিবদ্ধ করেছেন নীছক বর্ণনারীতি দ্বারা।

(৩) ভ্রমণ সাহিত্যে ভ্রমণ কাহিনির পাশাপাশি বড় হয়ে ওঠে লেখকের আত্মোপলব্ধি। অর্থাৎ লেখকের ব্যাক্তি অভিজ্ঞতাই বড় হয়ে ওঠে এই রচণাভঙ্গিতে।

(৪) লেখকের রচনার স্বতঃস্ফূর্ততা ও কাহিনীর গতিশীলতা ভ্রমণ সাহিত্যকে পাঠকের কাছে জীবন্ত করে তোলে।

(৫) শুধুমাত্র ভ্রমণের বর্ণনাই নয়, তার পাশাপাশি দেশ, কাল, সমাজ, অথনীতি,সমাজনীতি, গল্প, আখ্যান চরিত্র - সমস্ত কিছু মিলে মিশে তবেই একটি যথাযথ ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচিত হয়।

(৬) ভ্রমণ রস হল একটি ভ্রমণকাহিনী বা ভ্রমণ সাহিত্যের সঞ্জীবনী শক্তি। ভ্রমণরস আর জীবনরস একত্রে মিলিত হলে তবেই সার্থক ভ্রমণ কাহিনী বা ভ্রমণ সাহিত্য হয়ে ওঠে। এখানে 'রস' শব্দেদর অর্থ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে 'আণন্দ'।

(৭) যদিও প্রতিটি ভ্রমণ কাহিনি আভ্যন্তরীন গঠনে একটি গল্প, উপন্যাস, পত্র কিংবা ডায়রি,তা সত্ত্বেও ভ্রমণ সাহীত্যকে বর্তমানে একটি আলাদা সংরূপ হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

পাঠ্য ভ্রমণ কাহিনি 'মরুতূর্থ হিংলাজ' এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য গুণে একটি সার্থক ভ্রমণ সাহিত্য হয়ে উঠেছে কিনা তাই এখন বিচার্য।

মরুতীর্থ হিংলাজ : কথা ও কাহিনি

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

182

শ্রী কালিকানন্দ অবধূত বিরোচিত 'মরুতীর্থ হিংলাজ' একটি সুপরিচিত ও সর্বজনপ্রিয় তীর্থভ্রমণ কাহিনী। এ কাহিনীর বর্ণনাভঙ্গির ধরণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল লেখক অবধূত প্রচলিত কাহিনি বর্ণনার একঘেয়ে পথকে বাদ দিয়ে একজন গল্পোলেখকের মানসিকতায় এ ভ্রমণবৃত্তআন্ত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাই গ্রন্থটি অনেকবেশি সুখপাঠভ হয়ে উঠেছে পাঠক মহলের কাছে।

হিংলজ হল একান্নটি মহাপীঠের মধ্যে অন্যতম। এইস্থানে সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পোড়েছিল বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে কথিত আছে, ভগবান রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের সময় লঙ্কেশ্বর রাজ রাবণকে বধ করে ব্রহ্ম হত্যার পাপভাগী হয়েছিলেন। আর তাঁর সেই পাপ স্খালনের জন্যই তাঁকে এই মহাতীর্থ দর্শন করতে হয়েছিল।

যাইহোক, লেখক এই তীর্থদর্শনেদর উদ্দেশ্যেই যাত্রার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন তাঁর এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে। সঙ্গে সহযাত্রী আরো প্রায় জনা ২৫ - ৩০। সমগ্র কাহিনিটির মধ্যে প্রায় সব ধরনের কাহিনিই উপস্থিত। খাবাচরের স্বল্পতা, জলের সংকট, মরুঝড়, প্রণয়, খুন, দস্যু আক্রমণ, সতীত্ব হরণ - প্রায় সব ধরণের ঘটনার সংমিশ্রণে কাহিনিটি হয়ে উঠেছে জমজমাট। চরিত্রগুলিকে লেখক এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন মনে হয় কোথাও কোথাও চরিত্রের গভীরতে গল্পরস তথা ভ্রমণরসকে অতিক্রম করে গিয়েছে। তাই এটি নিছক একটি ভ্রমণ কাহিনি শুধু নয়, হয়ে উঠেছে সর্থক একটি ভ্রমণ সাহিত্য।

করাচি শহরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত নাগনাথের আখড়ার একটি অতি প্রাচীন দালানের দৃশ্য অবতারণার মধ্য দিয়ে এ ভ্রমণ বৃত্তান্তের সূচনা করেছেন লেখক অবধূত। এই দালানেরই এক কোণে আশ্রয় নিয়েছেন সমস্ত হিংলাজ যাত্রী। বিস্তীর্ণ দুর্গম মরুপ্রদেশ পেরিয়ে হিংলাজ মাতার গুহা। তাই এই তীর্থ দর্শনের জন্য বীশেষ মানুষজন সচরাচর মেলা ভার। কারণ এ পথ সাধারণ নয়। এ পথের প্রতি পদক্ষেপে রয়েছে মৃত্যুর ভয়। খাদ্যাভাবের সংকট, সূর্যের প্রবল দাবদাহ, মরুঝড়ের তীব্রতা, জলকষ্ট, দস্যুদের ভয় - আরো অজানা নানা সংকট। তাই অধিকাংশ তূর্থভ্রমণ কারীদের নিকট হিংলাজ মাতার মন্দির একটি পরিত্যাক্ত তীর্থক্ষেত্র। সেজন্য এই তীর্থ দর্শনকারীদের প্রায় প্রতিটি তীর্থযাত্রীর অভিজ্ঞতা হয় বিচিত্র এবং ভয়াবহ। তাই রচনার সূচনাতেই লেখক মন্তব্য করেছেন -

> "আজ যাঁরা পেশা হিসেবে হিংলাজ যাত্রি নিয়ে তীর্থদর্শন করতে যান তাঁদের পোড়া পেটের দাবি মেটাবার মতো উদ্ধৃত এ পেশায় সম্ভব নয়। সারা ভারত থেকে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রসকষহীন এই তীর্থে যাত্রীই বা জোটে কয়জন ? যদিও বা কেউ আসেন, তিনি হয় লোটা কম্বল চিমটা সম্বল মাস্তকে খানেওয়ালা অথবা বড়জোর একদল কাথীওয়াড়ী চাষী, সম্বল যাদের আটা লবন মরিচ ও কম্বল।"

পূর্বেই বলা হয়েছে এ যাত্রার আসন্ন সংকটের কথা। সবচেয়ে কন্টদায়ক হল

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অত্যন্ত রুগ্ন প্রকৃতি ও নিদারুণ জলকষ্ট। তাই সকল যাত্রিদেরকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়যেছে যে তাদের সঙ্গে থাকা জল শুধুমাত্র ব্যাক্তিগত ব্যবহার ও পাণের জন্য। এ অঞ্চলের নদীগুলি সবচেয়ে ভয়াবহ। বছরের প্রায় সমস্ত সময়ই শুকনো থাকে। কিন্তু যদি জল বাঙতে থাকে তাহলে তা অতিক্রম করা দুরুহ। দিনের পর দিন আটকে পড়ে খাদ্যাভাবে মৃত্যু ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। চিহ্নরূপে শুতধু পড়ে থাকে 'রাশি রাশি শুকনো শুভ্র হাড়।''

হিংলাজ দর্শন রার জন্য যে যাত্রাপথ আতিক্রম করতে হয় তার সময়সীমা প্রায় ৩০ - ৩২ দিন। লেখকের সঙ্গে এ যাত্রায় সঙ্গী হয়েছেন নানা অঞ্চল থেকে আসা বিভিন্ন ধরণের যাত্রীরা। সংখ্যা সবমিলিয়ে জনা ৩০। সঙ্গ নিয়েছেন এক মহিলা তীর্থযাত্রী ও। করাচী শহরের সবচেয়ে বড় স্বর্ণ ব্যবসায়ী শেঠ ভগবান দাস এই তীর্থযাত্রার মূল পৃষ্ঠপোষক। শেঠ ভগবসান দাস শুধুমাত্র কোলকাতার কালী আর গৌহাটির কামাখ্যা দর্শন করেছেন মাত্র। কামাখ্যার ভৈরব ভৈরবীদেদর প্রতি তাঁর অটোল আস্থা, যদিও তিনি নিজে গোঁড়া জৈন। সেখানকার এক ভৈরবীর জন্য এই যাত্রার আয়োজন। হিংলাজের দুরূহ্ পথ ভৈরবীর পক্ষে পায়ে হেঁটে দর্শন করা অসম্ভব বলে প্রচুর অর্থব্যায় করে একটা আস্ত উটের ব্যবস্থাও করেছেন তিনি। এছাড়া এই যাত্রার অন্যান্য তীর্থ দর্শনকারীরা হলেন - ছড়িদার রূপলাল ও তার ভাই সুখলাল, পোপোটলাল প্যাটেল, উটওয়ালা গুলমহম্মদ ও তার পুত্র দিলমহম্মদ। এছাড়া রয়েছে বিপুল লটবহর উটের পিঠে তোলা হয়েছে মুকঢাকা টিনে বোঝাই চীনাবাদাম, আখরোট, কিশমিশ, খেজুর, মিছরি, আর বস্তা বস্তা চাল আটা লবন, মরিচ, আলু এমনকি বড় বড় বোম্বাই পেয়াঁজ। এই পেঁয়াজ বহনের মূল উদ্দেশ্য হল -

''শেঠজী বোজালেন বালুর মধ্যে এই পেঁয়াজ চিবিয়ে খেলে লু লাগবে না আর পিপাসা কম পাবে।''

যাত্রারম্ভের সূচনাতেই দলেদর মুখ্য কচর্তা পান্ডাজী সকলের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ তথা কিছু উপদেশ দিলেন ও সকলের নিকট শপথ করিয়ে নিলেন য, হিংলাজ মাতার তীর্থস্থান দর্শন করে ফিরে আসা পর্যন্ত সকলেই সন্ন্যাস ব্রত পালন করবেন এবং কেউ কাউকে যেন হিংসা না করেন সে বিষয়েও সতর্ক করে সে বিষয়েও সতর্ক করে দিলেন। সকলে নিল একটি নতুন বসন, যা পরে তারা হিংলাজ মাতার কাছে পুজো আর তা ছাড়া একটি বসন গেরুয়া রঙে চুবিয়েনিয়ে সকলে পরিধানের বস্ত্র করলে। হিংলাজ যাত্রাপথে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ঝগড়া। তাই সে বিষয়েও সকলকে সচেতন করা হল

যাতে কেউ অহেতুক সমস্যার সৃষ্টি করে বাকিদের বিপাকে ফেলে। সকলেই শপথ করল, প্রত্যেকে তাদের সাধ্যমতো একে অপরের সাআয্য করবে কিন্তু - 'কোনক্রমেই নিজ নিজ কুঁজোর জল অপরকে দান করবে না। এমন কি স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, মা ছেলেকে বা ছেলে মাকেও নিজের কুঁজোর জল দিতে পারবে না। তার কারণ তাতে শেষ পর্যন্ত দুটো জীবনই নষ্ট হতে পারে।"

যাত্রা করবার জকন্য সমস্ত কিছু প্রস্তত হলেও ছড়ীদার ছাড়া এ যাত্রা শুরু করা যায় না। কারণ এই সম্পূর্ণ যাত্রায় ছড়িদারের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই ছড়িদাররা ধারণ করে একটি ছড়ি। লেখক অবধূতের বর্ণনায় এই ছড়ী সম্পর্কে ধারণা করতে করতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। লেখক উল্লেখ করেছেন -

> "ছড়ি, অর্থাৎ হিংলাজ থকে আনা একটা গাছের ডাল দেখতে অনেকতা ত্রিশূলের মতো। জিনিসটাকে সিন্দুর মাখিয়ে এক অপূর্ব বিস্ময়কর বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। মুশকিল - আসানদের মতো তাতে বিচিত্র বর্ণের কাপড়ের ফালি জড়ান এটি একটি ভয়ানক পবিত্র বস্তু।"

এই ছড়ির ধারকদের বলা হয় ছড়িদার। তীর্থযাত্রিরা হলেন তাদের যজমান অর্থাৎ তাঁরা এঁদের ভক্তি করবেন, এঁদের পদাঙ্কল অনুসরণ করবেন এবং সর্য়ক্ষণ এঁদের সেবা করবেন। অবশ্য এ যাত্রার দুই ছড়িদারই স্বল্পবয়সী। উভয়েই য়স যোগ কচরলে ৩০ ও হবে বলে মনে হয় না। এরা হল রূপলাল ও সুখলাল। রূপলালের বয়স ১৭ কিংবা ১৮ আর সুখলালের ১১ - ১২। লেখক এদের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই এদেদর সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র মন্তব্য করেছেন যা এদের চরিত্রকে আরো ফুটিয়ে তোলে -

"এরা চললেন ছড়ি ঘাড়ে করে প্রথমে; কণ্ঠে হিন্দি ফিলমের গন।আমরা চলাম পিছনে ; কণ্ঠ রুদ্ধ মাথায় দুশ্চিন্তা।"

এদেরই মান্য ককরতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে, সেবা করতে হবে তবেই তীর্থে ফল মিলবে। তাই বোধহয় লেখকের দুশ্চিন্তা।

ছড়িদাররা রাত্রে এসে উপস্থিত হওয়াতে ঠিক হল পরের দিন ভোর বেলা আলো ফোটবার পরেই যাত্রা শুরু হবে, তাইই হল। সকল যাত্রীরা চলেছেন পদব্রজে, একা ভৈরবী উটের পিঠে। মালপত্রের উপর আনেকটা সমতল জয়গা বানিয়ে সেই স্থানে খাটিয়া বেঁধে তার উপরে বসেই দুলকিও চলে চলেছেন ভৌরবী। ক্রমশ আলো ফুটে সূর্যদেবের উদয়

টিপ্পনী

হল। হাব নদী পেরুবার পর যাত্রাপথ হল দুরুহ। ঝোপ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাত্রা করার সময় প্রায় সকলের পায়েই কাঁটা ফুটল। উট চলল ভারি মন্থায়, কাঁটাগাছ চিবুতে চিবুতে। এই ধরনের যাত্রাপথে সর্বদাই সঙ্গীদের সাথে থাকাই শ্রেয়। কারণ একবার দলছুট হলন কিংবা পিছিয়ে পড়লে পুনরায় দলকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কারণ পথ বলে তেমন তো কিছুই নেই, শুধুমাত্র কাঁটা গাছ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে পা ফেলে সামনেএগিয়ে চলা। হিংলাজের পথ সেই অর্থে কারুরই চেনা নয়, এমন কি ছড়িদারদেরও নয়। এ যাত্রার আসল পথ প্রদর্শক হল এই উটেরা। তারা তাদের ঘ্রাণ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের পূর্ব পরিচিত পথ ধরে অগ্রসর হয় মাত্র। তাই উটের উপর ভরসা করেই সকলকে চলতে হবে বাকিটা পথ।

ক্রমশ জঙ্গল ফিকে হয়ে এল। শুরু হল প্রকৃত মরুভূমি। যেদিকেই তাকানো হয়, যতদূর তাকানো যায় শুধু বালি আর বালি। বালি ভিন্ন অন্য কিছুই নজরে আসে না। এই বিস্তীর্ন বালুকারাশির মাঝে দাঁড়িয়ে লেখকের মনে নানা ভাবের উদয় হয়েছে বারবার। টানা একদিন তীব্র রৌদ্রে তপ্ত বালির উপর দিয়ে চলে প্রায় সকলেই ক্লান্ত। যাত্রীদের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক উল্লেখ করেছেন -

> "প্রথম মাধার তালু জ্বালা করতে থাকে, পায়ের তলার শেষ পর্যন্ত কোনও সাড়ই থাকে না। নিশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়। হাঁ করা উক দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস চলতে থাকে, ফলে গলা থেকে পেটের ভিতর পর্যন্ত শুকয়ে কাঠ হয়ে যায়।

অবশেষে দিন দুই তন চলার পচর প্রথম জলের সন্ধান মিলল। সকলেই দেখতে পেল 'দক্ষিণ দিকে আধ মাইল চওড়া সাদা ধপধপে পাতের মতো একটি নদী গর্ভ।' তা দেখে যাত্রীদের আনন্দের অন্ত রইল না। যদিও জলের গভীরতা দু'হাতও নয়, তাও সেখানেই বসে হাঁটু গেড়ে অঞ্জলি ভরা সবাই সেই জল পান করল।

জল কষ্ট মরুভূমি অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ত্রাস। এখানে প্রায় বিশ পঁচিশ ক্রোশ অন্তর একটিই করে মিষ্ট জলের কুয়ো মেলে। তীর্থ ভ্রমণকারী ও মরুদেশের অন্যান্য বাসিন্দারা সেই সমস্ত কূপ থেকেই জল সংগ্রহ করেন একানকারই স্থানীয় কূপওয়ালারা লতাঁরা সর্বদা কূপ খনন করে তাকে ব্যবহারের উপযোগী করে রাখেন। না হলে এক - দুদিনেই চারপাশের বালি উড়ে এসে কূপের মুখ উজিয়ে দিতে পারে। তীর্থ যাত্রীদেরকে জল দান করে তাঁরা তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন। পারিশ্রমিক হিসাবে প্রাপ্যয় হয় প্রতিই যাত্রীর কাছ থেকে মাথা পিছু একটি করে পোড়া রুটি। এই অঞ্চলের লোকেদের জল সংগ্রহ ও তাকে সঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতি বিষয়ে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন লেখক -

"কূপগুলি সেখানকার মরুবাসীদেরকাছে কত বড় সম্পদ তা স্বচক্ষে দেখেছি। দেখেছি ক্রোশের পর ক্রোশ ভেংএ দল বেঁধে স্ত্রী - পুরুষ আসছে একপাল ছাগল নিয়ে কূপের ধারে। ছাগল জলো বয়ে নয়ে যাবে। জল যাবেই ছাগলের মধ্যে ভর্তী হয়ে। এটা ঘাগলের গলা থেকে মাথাটা কেটে ফেলে কি এক অদ্ভুত উপায়ে চামড়ার ভিতর থেকে হাড় মাংস সমস্ত বার করে নেওয়া হয়। পায়ের খুর চারটে বাদ দিয়ে পায়ের শেষ প্রান্ত চারটি বেধে সেই চামড়ার মধ্যে গলা দিয়ে জল ভর্তী করা হ। তারপর গলাট চামড়ার ফিতে দিয়ে বেঁধে ছাগলের পিঠে চাপিয়ে তারা স্বস্থানে নিয়ে যায় জল। গভীর বালু খুঁড়ে, জল ভর্তি এই চামড়ার জেলগুলি বালুচাপা দিয়ে রাখা হয়। এতে জল ঠান্ডাও থাকে নষ্টও হয় না।"

এই প্রথম কুঁয়োর কাছে পৌঁছে বিশ্রামের ব্যবস্থা করল সবাই। একটা দালানের উপরেই সকলে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল সেয়ার মতো। পরদিন সকালল থেকে শুরু হল মাছিরউপদ্রব। সে মাছি ক্ষুদ্র তায়, কাবুলি মাছি। একটি আকার চিলাবাদামের মতো। তাদের সমবেত ঐকতানের সকালে সবার ঘুম ছুটে গেল। ঘুম ভেঙে লেখক দেখলেন সকলেই প্রায় উঠে পড়ে সেই দিনের খাবারের জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। খাবার হিসেবে যেদিনের রন্ধনের উপকরণ ভাত ও ডাল। রাতে পথের সম্বলের জন্য বানানো হবে রুটি। এর পরবর্তি আশ্রয়স্থল হল শোনরেনী ল রান্না খাওয়া সেরে ঘন্টা দুই তিন বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হবে বিকেল থেকে, সূর্যের দহন মাত্রা কমলে। কিন্তু এখানে অবস্থানের সময়েরই ঘটে গেল একটি বড় ঘটনা।

দুপুরে খাওয়া সেরে লেখক দালানে বিশ্রাম করার সময় হঠাৎই তাঁর চোখে পড়ল দূরে ধূ ধূ বালু প্রন্তর থেকে অস্পষ্ট দুটি ছায়ামূর্তি যেন এগিয়ে আসছে তাঁদেরই দিকে। তারপর হঠাৎই যেন তারা পড়ে গেল বালির মধ্যে।গুলমহম্মদ আর লেখক দ্রুত গিয়ে তাদের পিঠে করে নিয়ে এলেন। এদের একজন পুরুষ ও অপরজন নারী। বয়স দেখে মনে হ তরুণ ও তরুনী। তাদের চেহারা ও অবস্থা দেখে কারুরই অণুমান করতে অসুবিধে হয় না য, উভয়েই দস্যু কর্তক আক্রান্ত। নারীটিকে ধর্ষন করা হয়ে ছে। দুজনেই জ্ঞান শূন্য। এই সমস্ত কান্ড কারখানায় সেদিনের মতো যাত্রা স্থগিত রেখে সকলেই সেই তরুণ তরুণির সেবায় নিযুক্ত হল। বহুক্ষণ পর তাদের জ্ঞান ফিরলে তাদের কাছ থেকেই জানা গেল - মেয়টির নাম কুন্তী। ছেলেটির নাম থিরুমল। তাদের বাস রাজপুতনায়, বিলানির অঞ্চলের কোনো একটি গ্রামে, যদিও বর্তমানে তারা যাযাবর। শরীর একটু সুস্থ হলে তাদেরকেও

টিপ্পনী

দলের অন্তর্ভুক্ত করে এগিয়ে চলা হল। পরের দিন শরীরের প্রায় সব শক্তি নিঃশেষ করে সকলে পৌঁছাল শোনবেনী। প্রবল রৌদ্রের দাবদাহ থেকে সকলে আশ্রয় পেয়ে সূর্যদেবকে জোড় হাতে প্রণাম করল সবাই। ভক্তি কতটা ছিল যে প্রণামে তা বলা কঠিন, তবে ষোল আনা ছিল তাতে চকোনো সন্দেহ নেই। তাই লেখক বললেন -

"প্রণাম করার বদলে সভয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সেই উদিত আদিত্য রক্ত চক্ষু হয়ে তেড়ে আসছে আমাদের পাকড়াও করবার জন্য।"

এখানে উপস্থিত হয়ে প্রায় সকলের মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসতে লাগল - 'আর কর দূর'? এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র উটেদের কাছে। তারাই তো প্রকৃত পথ প্রদর্শক।

শোনবেণিতে যেখানে সবাই আশ্রয় নিয়েছিল সেটি একটি ধর্মশালা। সেখানে রয়েছে বাঁধানো কুড়ো, খাবারের জন্য মিষ্টি জল। ধর্মশালাটিও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেখানে রয়েছে রামসীতার একটি ছোট্ট মন্দির। কিছুটা দুরেই বিস্তৃত সমুদ্র। এখানকার অধিকাংশ বাড়িই পুর্বমুখী অর্থাৎ সমুদ্রের বিপরীত দিকে মুখ ফেরান। শোনবেনীর শহরটি খুব অপরিষ্কার। প্রত্যেকে তাদের নিত্য ব্যবহার্য ও উচ্ছিষ্ট আবর্জনা রাস্তার উপরেই ফেলে রাখে। তাই এসমস্ত কিছু দেখে লেখকক মন্তব্য করেছিলেন -

"এখানকার লেকো ঝাঁটার ব্যবহার জানে না।"

এখানেই বিশ্রাম নেওয়ার সময় সকলে শুনল থিরুমল ও কুন্তীর কাহিনি। তাদের সমস্ত কিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পথ চলা, সংসার গড়ার স্বপ্ন, ভাগ্য বিপর্যয়। যদিও ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে এই প্রণয় আখ্যাণ নতুন এক স্বাদ সংযোজন করেছে।

পরবর্তী ভ্রমণ বর্ণনায় এই দুটি চরিত্র অনেক ক্ষেত্রেই যুক্ত হয়েছে কাহিনীর সঙ্গে। হঠাৎই কুন্তীর প্রত্যাখানে থিরুমলের পাগল হয়ে যাওয়া ঘটনার অনেক অংশেই প্রভাব ফেলেছে। বিশেষত ভ্রমণ পর্বের একেবারে শেষে গিয়ে আকটি ক্লাইম্যাক্স গঠনও করেছে থিরুমল চরিত্রটি।

শোনবেনী থেকেই শুরু হয়েছে প্রকৃত হিংলাজ যাত্রা কারণ শোনবেনীর ধর্মশালা ত্যাগ করে আবার এখানে ফিরে না আসা পর্যন্ত আর কোথাও এরকম মাথায় ছাদ যুকক্ত বিশ্রামস্থল নেই বললেই চলে। যাত্রীদেরকে এর পর থেকে কাটাতে হয়েছে খোলা আকাশেদর নীচে অথবা বালির উপর।

ভ্রমণকাহিনীর বাকি অংশ জুড়ে রয়েছে যাত্রা পথের আনা বিবরণ, পান্ডাজীর

উপাখ্যান বর্ণনা, অন্যান্য সহযাত্রীদের জীবনের ওঠা নামার কিস্সা - কাহিনী , কুন্তির দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার কাহিনি, দস্যু আক্রমণ, শ্রীজয়াশংকর মুরারজী পান্ডে মহাশয়ের মৃত্যু ও হিংলাজ যাত্রাপথের নানান মর্মভেদী অভিজ্ঞতার উপাখ্যান।

দীর্ঘ ১১ দিন যাত্রা করে সকলে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে চন্দ্রকূপ স্বামীর পাহাড়ের কাছে। এখানে চনদ্রকূপ বাবার উপদেশ ও আদেশ গ্রহণ করে তবেই হিংলাজ দর্শন করার অণুমতি পাওয়া যায়। চন্দ্রকূপ হল একটি পাহাড়, যেখানে রয়েছে গলিত কাদা। ফুটন্ত সেই কাদায় প্রতি মুহূর্তে ধামার মতো বুদ বুদ উঠছে আর উঠছে রাশি রাশি ধোঁয়া। সেখানেই সমস্ত পাপ মোচন করে শুদ্ধ চিত্তে দর্শন করতে হয় হিংলাজ মাতাকে। এই স্থানে এসে কেউ যদি পাপ গোপন করে তাহলে তৎক্ষনাৎই বুদবুদ ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। তাকে আর হিংলাজ দর্শনের আনুমতি দেওয়াহয় না। সেখানেও ঘটে আরেক অঘটন। চন্দ্রকূপে আসার পূর্বে সকল তীর্থযাত্রীরা নরপর্বতে শেরদিলের আতিথ্য গ্রহণ করেছিল। উন্মাদ থিরুমল সেখানে হারিয়ে যায় ।তাকে পিছনে ফেলেই সবাই যাত্রা শুরু করে চন্দ্রকূপের উদ্দেশ্যে। কিন্তু চন্দ্রকূপ পাহাড়ে সকলের পাপ স্খলনের সময়ে থিরুমল হঠাৎই সেখানে উদয় হয় ও উন্মত্ত হয়ে ফুটন্ত কাদায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। মৃত্যুর এইরূপ প্রতিচ্ছবি সকলের চোখের সামনে ভয়ানক গ্রাসের জন্ম দিয়েছিল।

অবশেষে চন্দ্রকূপ অতিক্রম করে সবাই পাড়ি দেয় হিংলাজ পর্বতের উদ্দেশে। চোদ্দ দিন, চোদ্দ রাত্রি পর দেখা মেলে হিংলাজ পর্বতের। সকল নিয়ম পালন করে অঘোর নদী অতিক্রম করে পূজো দিতে যায় সবাই। পুজো সেরে সবাই আকাশগঙ্গা দর্শন করতে গেলেও লেখক, ভৈরবী ও কুন্তি ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব নেয়। আর এই প্রত্যাবর্তনের পথেই ঘটে যায় আরেক বড় বিপদ । লেখক, ভৈরবী ও কুন্তী তিন জনেই রীচিকার অন্ধকারে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। রীচিকার গোলক ধাঁধা তাদেরকে শ্রান্ত, ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত করে তোলে। সকলেই প্রায় মৃত প্রায় হয়ে পড়ষে। জলের তৃষ্ণায় কুন্তি পাগল হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ভৈরবী ও লেখকের কাছে এই ঘটনা যান বিভীষিকর মতো তাড়া করে ফিরছে শেষ জীবন পর্যন্ত। লেখক লিখেছেন -

> "প্রবৃত্তি হয় না তার পরের ঘটনাগুলো মনে করবার। এখনও প্রাণপনে চেষ্টা করছি যদি কোনো রকমে ভুলতে পারি। একেবারে মুছে ফেলতে পারি মন থেকে যা কিছু ঘটেছিল তারপর। কিন্তু তা হবার উপায় নেই।"

সামান্য জলের জন্য একটা সুন্দর প্রাণকে যে এভাবে হারাতে হবে তা বোধহয়

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মেনে নেওয়া যায় ননা। তাই বারবার গ্রন্থের শেষে লেখক অনুতাপ করেছেন -

"বাজারে গিয়ে যখন চোখে পড়েথরে থরে ভাব সাজানো রয়েছে,আর পাশে রয়েছে লাল টকটকে তরমুজ, আনারস, লেবু, পেঁপে, আম, তখন চোখদুটো জ্বাল করে ওঠে। বরফ আর শরবতের দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটতে চাই না। ওসব এখন আমার দুচোখের বিষ।"

যদিও হিংলাজের ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে এ ঘটনার বিশেষ যোগ নেই বললেই চলে, তবুও এ অভিজ্ঞতা লেখকের মনর গোপনে হয়ত আজীবন তাড়া করে ফিরেছে। গ্রন্থের অন্তিমে লেখক আরেকস্থানে যাত্রার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সমাপ্ত করেছেন। হিংলাজ দর্শন করলে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ভৈরব কোটেশ্বর দর্শন করতেই হবে। তবেই সম্পূর্ণ পুণ্যের ফললাভ হয়। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'হিংলাজের পরে' -র সূত্রপাত এখান থেকেই।

হিংলাজ যাত্রা : পরিবেশ ও প্রকৃতি :

একটি ভ্রমণ কাহিনি বা ভ্রমণ সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় লেখক গুরুত্ব দেন ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর। অর্থাৎ যাত্রা কোথা থেকে শুরু হল, যাত্রাপথ কেমন, কোথায় থাকা হল, খাওয়ার ব্যবস্থাদি ইত্যাদি। তবে এর পাশাপাশি থাকে পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা, যা একটি ভ্রমণকে বর্ণময় ও রূপময় করে তোলে। অবধূত বিরচিত 'মরুতীর্থ হিংলাজ' সম্পূর্ণতই একটি ভ্রমণ সাহিত্য তথা ভ্রমণ কাহিনি। করাচি শহর থেকে দীর্ঘ মরুভূমি পেরিয়ে এই তীর্থক্ষেত্র। লেখক ও আরো কয়েকজন সঙ্গী মিলে একত্রে যাত্রা করেছিলেন এই দুর্গম মরুপ্রদেশে। ৩২ দিন ব্যাপী এই যাত্রার ইতহাস ও পারিপার্শ্বিকের বর্ননাই রয়েছে এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে।

হিংলাজ যাত্রিরা মাতা হিংলাজকে দর্শন করতে যান পূণ্য সঞ্চয়ের জন্য। হিংলাজ হল ৫১ টি পীঠের একটি মহাপীঠ। সতীর ব্রম্ভরন্ধ্র এই স্থানে পতিত হয় বলে মানুষের বিশ্বাস। রামচন্দ্র রাবণহত্যার পরে ব্রম্ভহত্যার পাপে দোষী হয়ে এই স্থানে এসেছিলেন পাপ স্খলন করতে। বর্তমানে এটি একটি তীর্থক্ষেত্র। বিস্তীর্ণ মরুদেশ পেরিয়ে তবেই যেতে হয় এই স্থানে। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' গ্রন্থে এই হিংলাজ যাত্রার বিবরণই তুলে ধরেছেন লেখক পাঠকের সম্মুখে।

করাচি শহরে নাগনাথের আখড়া থেকে শুরু হয়েছে ভ্রমণ কাহিনি। সকল তীর্থযাত্রীরা এখানেই একত্রিত হয়ে যাত্রা শুরু করে। এই নাগনাথের আখড়া একসময়ে নাথ

সম্প্রদায়ের সাধুরাই সথাপন করেছিলেন। বর্তমানে অবশ্য এই আখড়া দখলকারী মানুষরা সকলেই সংসারী। পেশ হিসাবে জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সবই করে থাকে এদরা। আরেকটি বড় পেশা হল, যাত্রীদের নয়ে হিংলাজ যাত্রা। সেই আখড়াতেচই জড় হলেন লেখক সহ আরো নানা দিক থেকে আসা বিভিন্ন মানুষজন। সব মিলিয়ে সংখ্যায় প্রায় জনা ৩০।

টিপ্পনী

অবশেষে সকলের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিপুল লটবহর নিয়ে সবাই ভোর রাতে আলো ফোটার আগেই যাত্রা শুরু করল। হাব নদী অতিক্র করে সবাই চলা শুরু করল। সঙ্গে দুটি উঠও চললল মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এ প্রদেশে উটেরই হল পথ প্রদর্শক। অন্যান্য স্থানীয় ব্যাক্তিরাও হিংলাজের পথ ঠিক ভাবে নির্ধারণ করতে পারে না। তাই উটের ঘ্রাণ শক্তির উপর ভরসা করেই সকলকে চলতে হয়। বেশ কিছু সময় চলার পরেই শুরু হল ঝোপঝাড়, কাঁটার জঙ্গল। যদিও এই কাঁটাগাছ উটের প্রিয় খাদ্য। লেখক একপ্রকার রসিকতা করেই লিখেছেন -

> "বাবলা গাছের কদর আর কারর কাছে থাকুক না থাকুক, উটের জাছে এর গুণের তলনা নেই। ছোট ছোট পাতা সুদ্ধ কাঁটাময় ডাল চিবুতে যে কি আরাম তা এক উটই জানে। তার সঙ্গে চাটনিই হিসবে মাঝে মাঝে আরও বেশি কাঁটা ওয়ালা টককুলের গাছ। চোখ বুজে বিচিত্র ভঙ্গিমায় ধীরে সুস্থে সেই চর্বণ একটা দেখবার মতো ব্যাপার।"

অবসেষে কাঁটা ঝাড় জঙ্গল ফিকে হয়ে শুরু হল মরুপ্রদেশেদর যাত্রা। সূর্যদেব তখন মাথার উপরে উঠে তীব্র অগ্নিবর্ষন করছেন। তপ্ত বালুর উপর দিয়ে পথ চলা ক্রমশ দুরূহ হয়ে পড়তে লাগল সকলের নিকট। এই সময় পর্বের এক বিশেষ অনুভূতির কথা লেখক এ স্থানে উল্লেখ করেছেন -

> "প্রথমে মাথার তালু জ্বালা করতে থাকছে, পাবের তলার শেষ পর্যন্ত সাড়াই থাকে না। নিশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়। হাঁ করা মুখ দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস চলতে থাকে, ফলে গলা থেকে পেটের ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।"

দীর্ঘ ১০ - ১২ ঘন্টা যাত্রার পর মিলল জলের সন্ধান। মরুপ্রদেশে সবচেয়ে সংকট হল এই জল। হিংলাজ দর্শনার্থীরা কতজন যে এই জলকষ্টে মারা গিয়েছে তার কোনো হদিশ নেই। সেজন্য যাত্রা শুরুর প্রথমেই পান্ডাজী সকলকে জল বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। কেউ যেন জল কাউকে দান না করেন। এমন কি স্ত্রী - স্বামীকে বা ছেলে মাকে

পর্যন্ত নয়। তাহলে দুটি প্রাণই একসাথে খওয়া যাবে। তাই সকলকে যে বিষয়ে বারবার সচেতন করে দেওয়া হয়েছে। অবশেষে জলের সন্ধান মেলার পর সবাই প্রাণ ভরে তা পাণ করেছে।

টিপ্পনী

হিংলাজ যাত্রীদের রান্নার বিষয়গুলি অদ্ভুত ধরণের কোনো ভাবে আটা জল দিয়ে মেখে একটু গোলাকার রুটির মতো আকৃতি করে তাকে পুড়িয়ে নিলেই হল। সেই ভাবেই চলতে থাকল রান্না। তাই খেয়েই যেন সকলের তৃপ্তি। মরুপ্রদেশে জলকষ্ট থাকার জন্য এখানে অদ্ভুত কিছু ব্যবস্থা করা রয়েছে। প্রতি ২০ - ২৫ ক্রোশ দূরত্বে রয়েছে মিঠা জলের কূপ। আর সেসব কূপ রক্ষা করে কূপ-ওয়ালারা। তারা প্রতি নিবত কূপ থেকে বালি সরিয়ে কূপকে জীবন্ত রাখে। বার্তা আদান প্রদানের জন্যও এই কূপওয়ালারাই শ্রেয়। নানা প্রদেশ থেকে জল আনার সময় নানা জন কূপওয়ালার কাছে বার্তা রেখে যায়। তীর্থযাত্রীদের জলদান করেই এদের জীবন নির্বাহ হয়। প্রতি যাত্রির কাছ থেকে মাথাপিছু একটি পোড়া রুটি এদের প্রাপ্য।

শোনবেনী থেকেই প্রকৃত হিংলাজ যাত্রা শুরু। কারণ শোনবেনীর ধর্মশালা পরিত্যাগের সেই ভাবে আশ্রয় নেওয়ার মতো মাথার উপরে ছাদ নেইই। খোলা আকাশ কিংবা গাছের তলা ছাড়া আশ্রয় আর কিছুই নেই। শোনবেনী শহর সম্পর্কে বেশ কিছু মন্তব্যে একথা জানা যায় যে, এটি খুবই নোংরা। মানুষজন তাদের ব্যবহার্য ও উচ্ছিষ্ট সমস্ত কিছুই সড়কেদর উপরে ছুঁড়ে ফেলে। তাই এদের দেখে লেখক মন্তব্য করেছিলেন যে, বোধহয় এরা কেউই ঝাঁটার ব্যবহার জানে না। তবে লেখক সহ অণ্যান্য যাত্রীরা যে ধর্মশালায় উঠেছিলেন তা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেখানে রামসীতার মন্দির ও রয়েছে একটি। এখানকার মাড়োয়ারি মহিলাদের আদ্ভুত পোশাকের কথা উল্লেখ করেছেন লেখক -

> "বিশ পঁচিশজন নানা বয়সের মারোয়াডী মহিলা লাল রঙের উপরে কালোর বরফি কাটা ওড়না জড়িয়ে সেই ওড়নার মুখ ঢেকে আথচ সমস্ত উদরমায় নাভির নীচ পর্যন্ত খোলা রেখে বিস্তর ঘেরওয়ালা নানা রঙের ঘাঘর পরে উপস্থিত হয়েছেন।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

192

শোনবেণীর ধর্মশালায় থাকাকালীন আদ্ভুত এক দূর্যোগপূর্ণ রাত্রির অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছিলেন লেখক। লেখক লিখেছেন -

> "প্রথমে একটা দমকা হাওয়া পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে চলে গেল।

এমনই সাংঘাতিক এক ঝাপটা যে পাঁচিলের উপর থেকে আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জোগাড়। প্রানপণে পাঁচিলের মাথা আঁকড়ে পড়ে রইলাম। পরমুহূর্তেই আর একটা সেই রকমের ঝাপটা, তারপর একটার পর একটা।"

এ ধরনের দুর্যোগ অনেক বারই ফিরে এসেছে সম্পূর্ণ ভ্রমণ কাহিনি জুড়ে।

টিপ্পনী

শোনবেষণীতে অবসধান কালে দুই নারী পুরুষের সঙ্গে আলাপ ঘটে তীর্থযাত্রীদের। এরা থিরুমল ও কুন্তী। রাস্তায় দস্যুদের হাতে পড়ে কুন্তীর সতীত্ব নাশ হয়েছে, থিরুমল প্রায় অর্ধপাগল। সেই অবস্থাতেই তাদেদরকেও হিংলাজযাত্রীরা সঙ্গে নিয়েছে। শোনবেনী থেকে হিংলাজ যাত্রা করার সময় সবাই সচেতন করে দিয়েছে দস্যু সম্পর্কে। এখানে প্রবল দস্যুদের উপদ্রব। কিছুদিন ধরে শহরের চারপাশে গুন্ডামী রাহাজানি চলেছে সে সম্পর্কে সচেতন করে দেন খাঁ সাহেব। লোকগুলি বিদেশি, মরুর বুকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে আর সুযোগ পেলে পথিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কাহিনি কিছুদূর এগুতে না এগুতেই সাক্ষাৎ মিলল দস্যুদের।অবশ্য বীর পরাক্রমে দিলমহম্মদ ও গুলমহম্মদ পুরো বিষয়টিকেই সামলে নিলেন। তাদের রক্তাক্ত ছুরির ফল সকলকে আস্বস্ত করল যে দস্যুরা মৃত।

পরবতী সময় ধরে বালু পথে শুধুই অনন্ত পথ চলা। শ্রী জয়াশঙ্কর মুরারজী পান্ডে একজন ধর্মপ্রান ব্যাক্তি তিনিও চলেছেন তীর্থ দর্শনে। তাঁর নানা গল্প কাহিনি দলকে অক্লান্ত ভাবে এগিয়ে নিয়ে চলল উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে। প্রথমেই তিনি গল্প শুনিয়েছেন শ্রীশ্রী গুরুশিষ্যের স্থানের। এই গুরুশিষ্যের উপাখ্যান মরুপ্রদেশের জলের কষ্ট ও তার অদ্ভূত পরিণতি সম্পর্কে। এরকম আরো বহু গল্প চলতে লাগল পথে যেতে যেতে। অবশেষে দুপুর গড়িয়ে নেমে এল সন্ধ্যে, সন্ধ্যে পেরিয়ে এল রাত। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সকলে আশ্রয় নিল খোলা আকাশের নিচে।চারিদিকের নিস্তব্ধতায় সবাই হারিয়ে গেলেও লেখক শুনতে পেলেন রাত্রির নিজস্ব ভাষা -

"রাত্রির একটা নিজস্ব ভাষা আছে। তবে তা শোনবার মত কান থাকা চাই। না শুধু কান থাকলেই হবে না, শোনা, সে ভাষা শোনাবার জন্য যেতে হবে সেই সমস্ত স্থানে যেখানে রাত্রি কথা বলে। সর্বত্র রাত্রি কথা বলে না, আর যদিও বলে অন্য গোলমালে শুনতে পাওয়া যায় না সে কথা অন্য গোলমালে শুনতে পাওয়া যায় না সে কথাম, খুবই চুপি চুপি বলে কি না।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

রাতের নিশ্চিদ্র অন্ধকারে সামান্য আলো আরো যেন অন্ধকারকে বাড়ীয়ে তোলে

। তাই রাতের পথচলা গুলো যতটা সম্ভব জোৎস্নাত আলোতেই সারতে চাইল সকলে। রাত্রের পথচলা গুলো যেন আরো ভ্রান্তিময় হয়ে উঠতে লাগল। পথ কোনদিকে যাচ্ছে কারুরই খেয়াল নেই। শুধু অনন্ত পথ চলা।

টিপ্পনী

রাতের অন্ধকারে পথ চলতে চলতে সবারই যেন মনে হতে লাগল যে, সবাই হারিয়ে গিয়েছে অসীম এক কালির সমুদ্রে। এ হারানোকে আবার লেখক ব্যাঙ্গের সাথে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীতে হারানো যে কত প্রকার হতে পারে সে সম্পর্কে বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। হারিয়ে গিয়ে সংবাদপত্রে নাম তোলা কিংবা বড় মেলায় দলছুট হয়ে হারানো অথবা সর্বস্বান্ত হয়ে নিজের মধ্যেই নিজে হারিয়ে যাওয়া, এসমস্ত কিছুর সঙ্গে এই হারানোটাকে মেলাতে পারলেন না তিনি। এই হারানোর মধ্যে রয়েছে এক ধরণের ভয়, ফিরে না আসার অনিশ্চয়তা।

মরু অঞ্চলের কূপওয়ালাদের বিবরণ তিনি অদ্ভূত ভবে দিয়েছেন এ কাহিনীতে। লিখেছেন -

> "লোকটিকে প্রেতের মতো দেখতে। লম্বায় সাধারণ একটা মানুষের দেড়গুণ হবে তার শরীর, কিন্তু সেই দীর্ঘ শরীর শুধু একখানা কোঁচকানো চামড়া ঢাকা একটা প্রকান্ড কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু নয়। সাজ পোশাক বলতে যা কিছু ওর গায়ে ঝোলানো আর মাথায় জড়নো তার কোনও নাম না দেওয়াই ভাল। ফালি ফালি লম্বা ছেঁড়া কতকগুলো নেকড়ার টুকরো..... কোমর থেকে ঝুলছে।"

-এদের থাকার জন্য যে ঘরগুলি রয়েছে তা কাঁটা পাতা দিয়ে বানানো।একপ্রকার বুকে হেঁটেই ঢুকতে হয় তার মধ্যে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মরুভূমিতে জলকষ্ট প্রবল। তার উপর রয়েছে তপ্ত সূর্যের সর্বক্ষনের নজরদারী। দুপুরের অধিক কেউই বিশেষ চলার অবস্থায় থাকে না। তবুও এগিয়ে চলতে হবে এই ভেবে মনোবল সংগ্রহ করে পায়ে পায়ে গুটি গুটি এগিয়ে চলে সবাই গন্তব্যের দিকে। সবার মুখে একই কথা - 'এখন ভালয় ভালয় সকলে পৌঁছাতে পারলে বাঁচি'।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

দীর্ঘ প্রায় ৮ - ১০ দিন চলার পর সকলে এসে উপস্থিত হয় চন্দ্রকূপ বাবার পর্বতের কাছে। চন্দ্রকূপ হিংলাজ দর্শনের পথে অপর একটি তীর্থক্ষেত্র আসলে এখান থেকে আনুমতি পেলে তবেই হিংলাজের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই অণুমতি পাওয়ার বিষয় ও ঘটনাটি বড় অদ্ভুত। এই স্থানে এসে সবাই পাপ স্খলণ করে ও সেই পাপো থেকে মুক্তি

পেয়ে তবেই পরবর্তী পথের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। চন্দ্রকূপের মাথার উপর রয়েছে ফুটন্ত কাদার একটি বৃহৎ কুন্ড। সেখানে অনবরত ধামার মতো বড় বড় বুদবুদ উঠছে। সেই স্থানে গিয়ে যদি নিজের পাপ কেউ স্বীকার না করে তাহলে নাকি হঠাৎই বুদবুদ্ ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ চন্দ্রকূপ বাবা অসন্তুষ্ট হবে যান আর তৎক্ষণাৎই তাকে আর হিংলাজ দর্শনের অনুমতি দেওয়া হয় না। এমনই আশ্চর্য সেই কুন্ড। চন্দ্রকূপ বাবার কাছে সবাই আসে ভ্রূণহত্যা অথববা নারীহত্যার পাপ মোচন করতে।এখানে এসে পুজো দিয়ে সকল দোষ স্বীকার করলে সেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি মেলে বলে সকলের বিশ্বাস। চন্দ্রকূপের বিবরণ দিতে গিয়ে অবধূত লিখেছেন -

> "এ-পাড় থেকে ও পাড় - মাঝখানের মাপ একশ হাতের কম নয় - সুডৌল গোল একটি কালো থকথকে কাদার পুকুর। বহু জায়গায় পাড়ের উপর দিয়ে উপচে সেই কাদা গড়িয়ে নামছে নীচে। আর হ্যাঁ - মস্ত মস্ত ধামার মত বুদ্‌বুদ্ হরদম উঠছে সেই কাদায়, সঙ্গে সঙ্গে সাদা বাষ্পও। জীবন্ত - একেবারে ষোল আনা প্রাণময় এই চন্দ্রকূপ।"

এই চন্দ্রকূপ অঞ্চলের একটা বিপদের কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন। বিপদটিও বেশ বিস্ময় কর। এখানে বহেড়া বলে এক প্রাণীর বাস। তারা ঠিক নর খাদক না হলেও তাদের কাজ মানুষ চুরি করা। রাতের অন্ধকারে এরা চুপিচুপি ঘুমন্ত মানুষের কাছে গএসে তাদের বিষাক্ত জিহ্বা দিয়ে পায়েদর তলা চাটে ।এতে নাকি মানুষ খুব তাড়াতাড়ি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার পর নিঃশব্দে এদরা মানুষটিকে গুহার মধ্যে নয়ে চলে যায়। আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বহেড়া কাহিনি এ অঞ্চলের একটি বড় ত্রাস।

চন্দ্রকূপ দর্শনের সময়ই ঘটে যায় এই সম্পূর্ণ ভ্রমণ যাত্রার সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। পুজো চলাকালীন হঠাৎই দেখা যায় হারিয়ে যাওয়া থিরুমলকে। সেই অর্ধউন্মাদ থিরুমল বিচার বিবেচনা ছাড়াই হঠাৎই ঝাঁপ দেয় চন্দ্রকূপের ফুটন্ত কাদায় । এদৃশ্য সকলকে আকস্মিকভাবে চমকে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে কাদার মধ্যে মিলিয়ে যায় থিরুমল।

এই আকস্মিক ঘটনায় পুজো ও প্রায়শ্চিত্ত সকলেরই পন্ড হল। তবু কেউ থাকলে না। একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্য দিয়ে সবাই এগিয়ে চলল ও হিংলাজেদর উদ্দেশ্যে। সকলের অবস্থা অস্বাভাবিক বিধস্ত হলেও হিংলাজ দর্শনের ইচ্ছাইও তাদেরকে টেনে নিয়ে চলল সামনের দিকে। অবশেষে আরো একদিন সম্পূর্ণ যাত্রার পর সকলে উপস্থিত হল হিংলাজ দেবীর পাহাড়ের পাদদেশে। হিংলাজ দর্শনের নিয়ম হল, সারাদিন নিরম্বু

টিপ্পনী

টিপ্পনী

উপবাস করে ভোররাতে ব্রাভমুহূর্তে মাতৃদর্শন। তারপর মায়ের প্রসাদ নিয়ে বেলায় ফিরে আসে। পথেই আঘোর নদী ও নদীর পাশেই অঘোরী বাবার আশ্রম। এই অঘোরী বাবার এই অঞ্চলে বসবাস নাকি প্রায় ১০০ বছরেরও বেশী। সবাই তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে দক্ষিণা দিচ্ছে। লেখক অঘোরী বাবার দর্শনের পর তাঁর সম্পর্কে একটাই উক্তি করেছেন -

'জগতে সবচেয়ে দুলর্ভ বস্তুটির নাম..... অনাবিল প্রসন্নতা।''

এই অনাবিল প্রসন্নতার ছোঁয়া পেয়েছেন লেখক অঘোরী বাবার সান্নিধ্যে এসে। পরের দিন ভোর হওয়ার আগেই অঘোরী বাবার সঙ্গে সকলে যাত্রা শুরু করল হিংলাজের পাহাড় চড়া। অল্প সময়েই হিংলাজের গুহায় পৌঁছল সকলে। গুহার ভিতর অন্ধকার। উঁচু ছাদ, ছাদের নীচে বেদী - অন্ধকার। উঁচু ছা, ছাদের নীচে বেদী - অন্ধকার জমাট বাঁধা। সেখানেই একে একে প্রবেশ করে দেবীকে স্মরণ করে প্রদীপ জ্বালাতে লাগল বেদীর উপর। গুহার মধ্যে আরেক গুহা। তার মধ্যেই দেবীর অবস্থান। লেখক গুহার ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পেলন -

> ''চোখের সামনে ভেসে উঠল মায়ের মুখখানি। সেই আধ হাত চওড়া লালপাড় শাড়ির ঘোমটা, কপালে ডগডগে সিন্দুরের ফোঁটা, একমুখ পান দোক্তাসুদ্ধ আমার মায়ের মুখের হাসি, আমার মায়ের সেই চোখের দৃষ্টি। আমার দিকে মা চেয়ে হাসছেন।''
>
> এই অদ্ভুত কল্পনাই যেন লেককে মোহিত করে রাখল অনেকক্ষণ।

সকলের দর্শনের পর অঘোরী বাবা সবাইকে নিয়ে গুহার বাইরে এসে সবাইকে দেখালেন গুহার পাহাড়ের চূড়ায় খোদাই করে আঁকা রয়েছে চন্দ্র আর সুর্য। কথিত আছে, রামচন্দ্র এই চিহ্ন এঁকেছিলেন এই স্থানে এসে।

দেবী দর্শনের পর সবাই আকাশগঙ্গা দর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও লেখক, ভৈরবী ও কুন্তী ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সবাই তাই গুহার বাইরে এসে আলাদা হয়ে যায়। লেখক, কুন্তী ও ভৈরবী ফেরার সিদ্ধান্ত নিলে বিশেষ কেউ বাধাও দেয় না। কিন্তু অঘটন ঘতে ফেরার পথে। অঘোর নদী পেরিয়ে অঘোরী বাবার আশ্রম খুঁজতে গিয়ে সেই বিশাল মরুভূমির মাঝে পথ হারিয়ে ফেলে তারা।মাথার উপরে প্রখর সুর্যের দাবদাহ আর মনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার তীব্র ভয়ে সকলেই জলশূণ্যব আবস্থায় মরুভূমির মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেল। তৃষ্ণার জ্বালা কুন্তীকে পাগল করে দেয়। অর্ধচেতনা আবস্থার লেখকের বর্ণনা সত্যিই পাঠকের মনে শিহরণ জাগায়।

সম্পূর্ণ ভ্রমণ কাহিনিটি বিচার করে একথাই বলতে হয়, লেখক অবধূত শুধু কাহিনিই বর্ণনা করেননি - একই সাথে ভ্রমণরস মিশিয়ে যথাযথ রূপদানও করেছেন তিনি। তাই একটি যথাযথ ভ্রমণ সাহিত্য হিসাবে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' একটি সার্থক রচনা।

মরুপ্রদেশের জীবন ও সংস্কৃতি :

টিপ্পনী

অবধূত রচিত 'মরুতীর্থ হিংলাজ' এক অসামান্য ভ্রমণউপন্যাস । এটি শুধু দেশভ্রমণের সাধারণ বর্ণনামাত্র নয়, ভ্রমণকে কেন্দ্র করে একটি অপরিচিত ভূখন্ডের প্রায় সামগ্রিক বিবরণ। বালুচিস্তানের দুর্গম আঞ্চলে বিকভাত হিন্দুতীর্থ হিংলাজ কথিফত যে, এখানে ছিন্নদেহ সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছিলে। এই তীর্থে এসে রামচন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাই পুণ্যলোভী হিন্দুরা দীর্ঘকাল থেকে এ তীর্থে ভিড় করেন। কিন্তু পথ অতি দূর্গম। ব্রিটিশ ভারতের শেষ সীমা করাচী থেকে এর যা্রা শুরু। দীর্ঘ মরুর বালুকা - সমুদ্র পেরিয়ে তবেই যাত্রীদের যাত্রা শেষ হয়। যেতে আসতে লাগে বত্রিশ দিন। এত কষ্টকর পথ পেরোনো সহজ নয়। ক্ষুধা - তৃষ্ণায় শরীরের কষ্টে, গরমে, দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পথেই অনেকের জীবনান্ত হয়। লেখক তেমন এক যাত্রীর সঙ্গী। তিনি তাঁর রোমহর্ষক তীর্থযাত্রার বিবরণ ও গ্রন্থে দাখিল করেছেন। সেই বিবরণে শুধু নিজেদেদর কথা নেই, রয়েছে মরুপ্রদেশের জীবন ও সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ । আমরা এখানে সেই প্রসঙ্গগুলিকে নানাসূত্রে তুলে ধরব।

মরুপ্রদেশ সমতলভূমির দেশের মতো নয়। সজল শ্যামল সবুজ প্রকৃতির সাক্ষাৎ এখানে মিলবে না। গোটা বছরে বৃষ্টিপাত হয় কিনা সন্দেহ। দু'দশ বছরে হয়তো দু'চারবার । মরুভূমি হল বালির সমুদ্র । কোথাও ঝুরে ঝুরে হলুদ বালি কিংবা সাদা বালি, আবার কোথাও নুড়ি পাথর। মাঝে মাঝে টিলা। আর সর্বত্র বালির ঢেউ খেলানো রূপ পারিদৃশ্যমান ।করাচী থেকে যাত্রা শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এ দৃশ্য দেখা যাবে না। কাঁটা ঝোপের জঙ্গলেদর মধ্যে দিয়ে পথ। যেতে যাত্রীদের পায়ে কাঁটা ফোটে, পা রক্তাক্ত হয়। এই কাঁটা গাছগুলো উটেদের ভীষণ পচ্ছন্দেদর খাবার। খেতে গেলে তাদের জিভ ছড়ে যায়, কিন্তু তাতেই তাদের আনন্দ । এ অঞ্চলের শেষ লোকালয় শোনবেনী । তার আগে একটা সরকারি দালান পড়ে বটে, কিন্তু সেখানে লোকজন নেই। যাত্রীদের মাঝপথে বিশ্রামের জন্য বানিয়ে রাখা হয়েছে। শোনবেনীর বাজারঘাটের দৃশ্য বইটাতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। লেখক লিখেছেন -

"প্রথমেই বাজার। পূর্বপশ্চিমে লম্বা পাশাপাশী পাঁচ - ছটা চালা, এত নীচু

টিপ্পনী

যে প্রাব হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। আঁকাবাঁকা তেউড়ানো গাছের ডালের খোঁটা পুতে তার উপর ঘরের চাল। চাল ঢাকা রয়েছে যা হাতের কাছে মিলেছে তাই দিয়েই। কম্বলের টুকরো, ছেঁড়া চট, তার উপর আলকাতরা মাখানো কাটা ত্রিপল, কেরোসিনের টিন চ্যাপটা করে আটকানো হয়েছে ঘরের চালে। ..... এইরকম এক একটা লম্বা চালার নীচে আট দশটা দোকান। এখানে শহুরে সংস্কৃতির ছোঁয়া আছে গ্রমাফোন বাজানোয় ও দেওয়ালে ঝোলানে সুন্দরী সিনেমা তারকাদের সাহায্যমুখে। এই বাজারের পশ্চিপ্রান্ত থেকে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত বস্তির সার। কাঁচা পাকা সবধরনের বাড়িই আছে। বাড়ি তৈরিতে কোথাও কোনো শৃঙ্খলা কিংবা পরিকল্পনা নেই। ঘরবাড়ির অবস্থা বাজারের চালাগুলোর মতোই। আবর বালি মাটি পাথর, জমানো শ্লেটপাথরের ছাদওয়ালা অনেক অট্টালিকাও রয়েছে। অনেক বাড়ির মেঝে সিমেন্ট করা। ঘরগুলির উচ্চতা বেশি নয়। কেননা যেকোনো মুহূর্তের প্রবল সামুদ্রিক ঝড় এসে সবকিছু তছনছ করে দিতে পারে। 'শহরসুদ্ধ লোকের পেশা সমুদ্রে মাছ ধরা, সেই মাছকে শুঁটকিতে পরিণত করা এবং সেই শুঁটকি মাছ বস্তাবন্দী করে সমুদ্রপথে বা উটের পিঠে করাচী চালান দেওয়া। শহরময় তাই যত্রতত্র দেখা যায় মাছ ধরার জাল। এখানকার রাস্তাঘাট নোংরা আবর্জনায় পরিপূর্ণ। ছাই পাঁশ, পেঁয়াজ, ডিমের খোলা, পশুপাখীর চামড়াপালক হাড়গোড়, মানুষ জীবজন্তুর বিষয়টা রাস্তাময় ছড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যে শহরবাসীরা পরম সন্তোষে বসবাস করে, গৃহস্থালির নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম চলছে।

শোনবেনীর পর ধেকে শুরু হয়েছে হিংলাজের প্রকৃত পথ। এরপর আর কোনো এমন জমজমাট লোকালয় নেই। ধূ ধূ মরুর প্রান্তর। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ঢেউ খেলানো বালি। পা পুড়ে যায়, চামড়ায় পোস্কা পড়ে। শরীরের সমস্ত রস শুষে নেয়, সূর্যের প্রচন্ড দাবদাহ। একটা গাছেরও চিহ্নমাত্র নেই। হয়তো দশ - বিশ ক্রোশ দূরে মিলবে শীর্ণ জলের ধারা কিংবা কূপ। কূপগুলি জলের ক্ষীণ উৎস। বালি সরালে চুইয়ে চুইয়ে জল জমা হয় গর্তে। তারপর সেটা পাত্রে ভরে নিতে হয়। এই কূপগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য কিছু স্থানীয় মানুষ আছে। তারা সারাবছর বিপুল কষ্ট ও অসুবিধা ভোভগ করে এগুলি পাহারা দেয়। তার পরিবর্তে পায় যাত্রীদলের কাছ থেকে রুটি, আটা। এইভাবেই তাদের সংসার চলে। এখানে কেউ কেউ থাকে কাঁটাগাছ দিয়ে তাঁবু কিংবা ঘর বানিয়ে। তার ভিতরে আসা যাওয়া দুঃসাধ্য। একটু অসাবধান হলেই শরীরে কাঁটা ফুটে যাবে। শোনবেনীতে ছিল

ভয়ংকর মাছির উপদ্রব। রাস্তায় দস্যুদের উৎপাত। এমন উৎপাতের কবলে পড়েছিল থিরুমল ও কুন্তী।এখানকার মানুষ খুবই অভাবি। খাবার পায় না। বাইরে থেকে যেসব যাত্রী আছে তাদের কাছে এদের প্রত্যাশা তাই বেশী। তবে এরা খুবই অতিথি বৎসল।এরা অধিআংশই ধর্মে মুসলমান, কিন্তু হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ভীষণ সাহায্য সহযোগিতা করে। যাদের দীর্ঘদিন স্নান হয়নি, তাদের জন্য স্নানের জল দেয়। এইসব কূপ থেকে জল নিতে আসে দূর দূরান্তের স্থানীয় অধিবাসীরা। ঘড়া, কলসীর মতো পাত্র তো আছেই, সেইসঙ্গে আনে ছাগলের চামড়া দিয়ে বানানো ভিস্তি। তার ভেতরে জলভরে নিয়ে গিয়ে বালির নীচে চাপা দিয়ে রাখে। এঅঞ্চলের মানুষের অদ্ভুত আতিথেয়তার বিবরণে ধরা পড়েছে মরুপ্রদেশের জীবন ও সংস্কৃতির টুকরো টুকরো ছবি। শেখ বসিরুদ্দিন তুলোর মতো সাদা চুলে ভর্তি এক মানুষ। বয়স কিন্তু তার বেশি হয়নি। তাঁর স্ত্রীটি অত্যন্ত সুন্দরী। ভারী আপ্যায়ন করলেন যাত্রীদলকে। শোনবেনীতে থাকার সময় সে অঞ্চলের সধবা রমণীরা ভৈরবীকে ঘিরে গানের আসর বসিয়েছিল। তীর্থ কিছু উপকরণও দিয়েছিল। এ একধরণের মরুপ্রদেশের স্ত্রী আচার। আবার আস্তানায় যাত্রীদল পৌছলে সেখানে আপ্যায়নেদর জন্য আনা হয় বকরীর ঘি, যার গন্ধ নাকে গেলে বমি উঠে আসার যোগাড় হয়।

মরু অঞ্চলের কিছু প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার ও রীতির কথা পাওয়া যায়, 'মরুতীর্থ হিংলাজ' গ্রন্থটিতে। রয়েছে বেশ কয়েকটি কিংবদন্তির উল্লেখ। যেমন, যাত্রার শুরুতে যাত্রীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকের কুঁজোর জল কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। মরুভূমিতে জলের আকাল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তেষ্টার ছাতি ফেটে গেলেও কাউকে, সে যতো নিকটাত্মীয় হোক, একবিন্দু জল দিতে পারবে না। জল পাওয়া যাবে যেমন কূপগুলিতে তার রক্ষণাবেক্ষনে রত মানুষরা পারিশ্রমিক পাবে। সেটা টাকাপয়সা নয়, যাত্রীদের আহার্য রুটি। প্রত্যেক যাত্রীর কাছে থেকে একএকটি তার প্রাপ্য। একই নিয়ম উটওয়ালাদের ক্ষেত্রেও। এর চেয়ে বেশী কিছু তারা পায় না, প্রত্যাশা করে না। কূপগুলি মরুবাসীদের কাছে সম্পদ। মরু অঞ্চলের মানুষ অনেক দূরের লোককে কীভাবে আহ্বান করে গুলমহম্মদের ডাকে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অদূরে আগুণ দেখতে পেয়ে বুঝেছিলেন ওখানে মানুষ আছে। তাদের কাছে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য তিনি দুহাতের চেটো দিয়ে চোঙাবানিয়ে তাতে মুখলাগিয়ে একটানা আওয়াজ করে চললেন - উ উ উ হো। এমন বিচিত্র শব্দতরংগ তিনবার ছড়িয়ে গেল গোটা প্রান্তর জুড়ে। তারপর তার একই ধবনিতে উত্তর ভেসে এলো। এটি অঞ্চলের জানান দেবার বিশেষ রীতি। যাত্রীরা যখন উট নিয়ে যাতাযাত করে তখন মরুদ্যান গোছের জায়গা পেলে মানুষ যেমন বিশ্রাম

টিপ্পনী

টিপ্পনী

নেয়, তেমনি উটেদের চড়ে খাবার মতো ব্যবস্থা করতে হয়। জলের এইসব উৎসের আশে পাশে কিংবা একটু দূরে গজিয়ে ওঠে কাঁটা ঝোপ। উট এই কাঁটাগাছ খেতে পছন্দ করে। তাই উটওয়ালাদের কাজের বিরাম থাকে না যাত্রীরা বিশ্রাম নিলেও তারা সেই কাঁটাগাছের সন্ধানে চলে উঠের পেছন পেছন। উটকে ভরপেট খাইয়ে তবে তাদের ছুটি। মরুভূমিতে জল যেহেতু কম, তাই মানুষের স্নানের জল ফেলে দেওয়া হয় না, তা উটেদর মতো গবাদিপশুরা পান করে। উটওয়ালা উটকে চালনার জন্য উটের নাকে একটা ইঞ্চি দুয়েক লম্বা কাঠি ছেঁদা করে পরিয়ে দেয়। কাঠিটা ধুনরীদের তুলো ধুনবার মুগুরের মতো দেখতে। নাকের দুই গর্ত থেকে সেই কাঠিটার দুই প্রান্ত বেরিয়ে থাকে। সেই দুই প্রান্তে বাঁধা হয় একগাছি রেশম কিংবা লোমের তৈরি সরু দড়ি। পরে সেই দড়ির প্রান্তটা বাঁধা হয় অপেক্ষাকৃত মোটা দড়ি। মোটা দড়ির প্রান্তটা উট ওয়ালার হাতে থাকে। এটা হল উটের লাগাম, নাকে টান পড়লে উট জব্দ। তবে মাঝে মাঝে উট ভীষণ বেয়াড়া করে। যখন তারা ক্ষুধার্ত হয় তখন তাদের দিকবিদিক জ্ঞান থাকে না। খাদ্যের অন্বেষণে সোজা পথ ধরে। সে এই খাবারের সন্ধান পায় ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে।

হিংলাজের যাত্রীদের ক্ষেত্রে একটি সরকারি নিয়ম আছে। শোনবেনীতে একটি সরকারি অফিস। প্রত্যক তীর্থযাত্রীকে সেখানে নাম, ধাম, পির্তপরিচয় সবকিছু লেখাতে হয়। জমা দিতে হয় মাথাপিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ কর। কোনো খবর চাউর করতে হলে উটওয়ালারা কূপওয়ালাদের কাছে জনাইয়ে দেয়, যাতে তাদের মারফৎ বাদবাকিরা সতর্ক থাকতে পারে। হিংলাজ যাত্রার পথে প্রথম তীথর্স্থান গুরুশিষ্যের পবিত্রস্থান। এখানে পান্ডাকে দানদক্ষিণা দিয়ে পুণ্য অর্জন করতে হয়। রূপলাল ছড়িদার এই তীর্থ গজিয়ে ওঠবার ইতিহাস জানিয়েছে। কিংবনদন্তিটি হচ্ছে এই - একদা একগুরুদেব তাঁর এক শিষ্যকে নিবে হিংলাজ দর্শন করে ফিরছিলেন। দুজনের কাছে দুটি জলের কুঁজো। গুরু চালাক। নিজের জল অটুট রেখে তিনি বারবার শিষ্যের কুঁজোর জল পান করেছিলেন। শিষ্যও গুরুভক্তিতে না করতে পারছিলেন না। একসময় শিষ্যের কুঁজোর জল শেষ হয়ে গেল। প্রচন্ড তেষ্টায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হল শিষ্যের। তবু গুরু নিজের খুঁজোর জল একটুকুও ছোঁয়ালেন না। শিষ্য ধড়পড়িয়ে সেই প্রান্তরে শেষ নিঃশ্বাস তভাগ করল। এরপর আকস্মিকভাবে গুরুর জলের পাত্রটি গেল চৌচির হয়ে। সব জল মুহূর্তে শুষে নিল তপ্ত বালুকা। গুরুও উত্থানশক্তি রহিত হলেন।পাশাপাশি পড়ে বইল দুই দেহ। সেই দেহ দুটি নাকি পরে পাথরে পরিণত হয়। এভাবেই গড়ে ওঠে পথের মাঝে গুরুশিষ্যের তীর্থাস্থান। এমন ধরণের আর একটি তীর্থক্ষেত্র চন্দ্রকূপ বাবার পাহাড়। চারিদিকেদর পাহাড় বেষ্টিত

হয়ে আছে একটি পুকুর। কিন্তু সে পুকুরে জল নেই। রয়েছে শুধু কাদা। যেমন তেমন কাদা নয়, সেই পাঁকের মধ্যে দনরাত বড় বড় বুদবুদ উঠছে। কেননা কাদার পিন্ডগুলি প্রচন্ড গরমে ফুটছে। হিংলাজ যাত্রীদের এখানে আসতেই হবে ল কেননা যতক্ষণ না চন্দ্রোকূপ স্বামীর অনুমতি পাওয়া যাবে ততক্ষণ হিংলাজের দিকে পা বাড়ানো নিষেধ। একানে নিয়ম আছে, ওই জলাশয়ের কাছে দাঁড়িয়ে তীর্থযাত্রীরা সবাই নিজেদের অতীত অন্যায় নানা অধর্মের কথা জোরে জোরে বলে স্বীকার করে, তারপর নৈবেদ্য ছুঁড়ে দেবে ওই পুকুরের মধ্যে। যদি কেউ মিথ্যে বলে তাহলে মুউর্তে বুদবুদ ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং আর হিংলাজের পথে যাওয়া হবে না। চন্দ্রকূপ তীর্থযাত্রীদের তীর্থকর্মের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ছড়িওয়ালাদেদর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তারা নিষ্ঠা সহকারে মন্ত্র আওড়ায়। চন্দ্রকূপ স্বামীর ভোগ লোট বানায়। প্রত্যেক যাত্রীকেই একটা করে নারকেল দিতে হয়, দিতে হয় ছোট কল্কচের গাঁজা। এইসব উপাচার ফেলতে হয় কাদার পুকুরটাতে। কিন্তু চন্দ্রচূড়া বাবার হুকুম না পেলে ওসব ফেলা যায় না। বাবার প্রসাদের জন্য লোট বানানো হয়। লোট বানাতে লাগে আটা, চিনি, ঘি, পেস্তা বাদাম, কীশমিশ। এগুলো সবই আলাদাভাবে কেনা। একটা নতুন কাপড়ের চার কোণ চারজন জোরে টষেনে ধরে। তারপর এগুলো ফেলে মাখা হয়। মাখবার আগে ছড়িদার আদুড় গায়ে জোড়হাত করে চারজন লোক আর তাদের ধরা চাদরকে প্রদক্ষিণ করে নেয়। এই ভোগ কোনভাবেই মাটিতে রাখা চলবে না। এরপর ডালপালা যোগাড় করে আগুন লাগনো হয়। তাতেএবং সেই আগুনের ওপর তুলে দেওয়া হয় প্রকান্ড আটার এলাটা। চাপিয়ে দেওয়া আরও ডালপালা যাতে সারারাত ধরে আগুনটা জ্বলতে পারে। সেই পোড়ানো আটার ডেলাটাই লোট যেটা পরদিন সকালে চন্দ্রকূপে ফেলা হয়।

মরু অঞ্চলের আর একটি বিস্ময় বাহেড়া বা বাস। এরা বনমানুষ জাতীয় জীব। পাহাড়ের গহ্বরে কোথাও এরা লুকিয়ে থাকে। এদেরকে কখনই দিনের আলোয় দেখা যায় না। এদের স্বভাব হচ্ছে ঘুমন্ত মানুষ চুরি করা। চুরি করার পদ্ধতিটি অদ্ভূত। রাতের অন্ধকারে সবাই যখন পড়ে তখন তারা নিঃশব্দে আসে। মানুষের মতো দুপায়ে ভর করেই তারা চলাফেরা করে। ঘুমন্ত মানুষের কাছে এসে তার পায়ের কাছে মুখ রেখে শুয়ে পড়ে বহেড়া। তারপর তার লম্বা লকলকে জিভ দিয়ে মানুষের পায়ের পাতা চাটতে থাকে। যত চাটতে থাকে তত লোকটির ঘুমও গাঠ হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের বিষাক্ত লালার কারণে মানুষটির চৈতন্য লুপ্ত হয়। এরপর সেই অচৈতন্য মানুষটিকে তারা চুরি করে নিয়ে পালায়। আর চুরি করার মধ্যেও একটা বিশিষ্টতা আছে। বাহেড়া নারী চুরি করে পুরুষমানুষকে, আর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পুরুষ চুরি করে মেয়ে মানুষকে। এরা মানুষের মাংস খায় না। চুরি কনরে নিজেদের আস্তানায় ফেলে রাখে। হুঁশ ফিরে আসতে দেখলে আবার পা চাটতে থাকে, এতে মানুষটি আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এইভাবে চাটতে চাটতে নাকি পায়ের গোছ পর্যন্ত তাদের জিভেই চলে যায়। ঘুমন্ত মানুষ যখন আর কিছুই খেতে পায় না তখন মারা যায়।মারা যাওয়ার পরেও মৃত মানুষকে যত্ন করে বহেড়ারা রেখে দেয় রক্ত খাওয়ার লোভে। যখন আর একটুও রক্ত তাদের জিভে লাগে না, তখন তাকে বয়ে নিয়ে বাইরে খোলা জায়গায় রেখে আসে।

মরু অঞ্চলের মানুষের জীবিকা বলতে তেমন কিছু নেই এখানে কৃষির অবকাশ কম, তাই ব্যবসা অচল। তবুও এ গ্রন্থে একটি বিশেষ খাদ্যদ্রব্য বিক্রির উল্লেখ মেলে। ও যাত্রীদল তখন চলেছে চন্দ্রকূপ থেকে হিংলাজের পথে। তখনও অনেকটা দূর আঘোর নদী। রাস্তা নেই কোথাও মাটি কোথাও বালি। চারদিকে মানুষের বসতি। মানুষের তুলনায় সে অঞ্চলে ছাগলের পরিমাণই বেশি। ছাগলগুলো আকারে বেশ বড়ো - লেখকের ভাষায় 'রাবন ছাগল', রামছাগলের তুলনায় তিনগুণ আয়তন। চলার পথেই পড়েছে কুলগাছ। শ্রাবণ - ভাদ্রমাসে এখানে প্রচুর কুল ফলে। ফুলের স্বাদ না টক না মিষ্টি - কষাটে। কুলের হজমীগুন আছে। এ খেলে নাকি জ্বর সেরে যায়। আর একটু যেতেই সাদা ফুটি মিলল। স্থানীয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তুলে এনে বিক্রি করে। প্রায় আধক্রোশ দূর থেকে তারা ছুটে আসছে। প্রত্যেকের হাতেই দুটো তিনটে করে ওই ফল। এ পথে যাত্রী এলে তাদের গছাতে চেষ্টা করে। সাইজ অনুযাবী ফলের দাম। কিন্তু তারা নাচার। নির্দিষ্ট পরিমাণ পয়সা ছাড়া তারা মাল বেচবে না। এঅঞ্চলে পাওয়া যায় উটের দুধ। এক কলসী দুধের বদলে তারা পেতে চায় এক সের আটা। জলের মতো পাতলা দুধ। এখানকার মানুষ কাঁটায় ঘরে বাস করে না। কাঠ দিয়ে তা দিয়ে ঘর বানিয়ে। দেওয়াল চাল সবই কাঠের তেরি। স্থানীয় অধিবাসীরা যাত্রীদলকে রত্রিবাসের আহ্বান জানায়। তার পিছনে উদ্দেশ্য আছে। যদি রুটি তৈরি করা হয় তাহলে আশ্রয়দাতারা যাত্রীদের সকলের কাছ থেকে মাথাপিছু একখানা করে রুটি আদায় করবে। বোঝা যায়, গোটা মরু অঞ্চল জুড়েই খাদ্যের প্রচন্ড অভাব। তবুও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে এখানে বয়ে চলেছে জীবন - তার নিজস্ব ঢঙে। রাস্তার চোর - দস্যু ছাড়া বাকিরা অমন হিস্র নয়। অনেকেই যাত্রীদলকে দেয় নিরাপত্তা, সহায়তা।

অঘোর নদী পেরিয়ে অবশেষে মিলল বহু প্রতীক্ষিত হিংলাজ। সেটি পুণ্যভূমি। সেখানেও পা রাখার আলাদা নিয়ম আছে। হিংলাজ মাতার মন্দিরে প্রবেশের নিয়ম হচ্ছে, দিনের বেলা থাকতে হবে ঝরণার ও পারে। সেখানে রাস্তার ধারে জঙ্গলের ভেতর একটি

পাথরের ঘর আছে। সেই ঘরে যাত্রীদের সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটানো নিয়ম। এরপর সেখানে রান্না - খাওয়া সেরে সন্ধ্যের পর যাত্রীরা পার হয়ে ঝরণা। আর ভোররাতে ব্রাহ্মমুহূর্তে দেবী হিংলাজের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে ঝরনা পেরিয়ে চলে যেতে হবে ওপারে।

হিংলাজ পাহাড়ের মাথায় পাথরের গায়ে অঙ্কিত চন্দ্র-সূর্যকে নিয়েও রয়েছে এক কিংবদন্তি - যা শোনা গেল অঘোরী বাবার মুখে। ভগবান রামচন্দ্র নাকি ত্রেতাযুগে এসেছিলেন এই দেবীমন্দিরে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ থেকে উদ্ধার পেতে। রাক্ষস রাবণ ছিলেন ব্রাহ্মণসন্তান - মুনি বিশ্বশ্রবার পুত্র। সেই পাপ থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন এখানে জ্যোতিদর্শন করে। বিশ্বাস - অবিশ্বাসের মাঝখানে দুলতে থাকে কথাটা। রামচন্দ্রই নাকি নিজ হাতে এঁকে দিয়ে গিয়েছেন ওই চন্দ্র সূর্যের ছবি। বাস্তবত অত উঁচুতে শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে অমন ছবি আঁকা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। অঘোরীবাবা বললেন, 'ঐ অসম্ভব কাজ একমাত্র গভবান রামচন্দ্রের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। এই পৃথিবীতে যতকাল চন্দ্র - সূর্য থাকবে ততকাল এই হিংলাজ পাহাড়ের চূড়ায় আঁকা চন্দ্র - সূর্যও থাকবে। আর মানুষ এখানে এসে চাক্ষুষ প্রমান পাবে যে, একসময় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও এই তীর্থদর্শন করতে এসেছিলেন।'

এভাবেই শেষ হয়েছে 'মরুতীর্থ হিংলাজ'। এ কেবল ভ্রমণকথা নয়, তীর্থভ্রমণকে কেন্দ্র করে মরুপ্রদেশের জীবনকথা। যাত্রীদলের যাত্রাকালীন নানা পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে মিশে গেছে বালুচিস্তানের জনজীবন, তাদের রীতিনীতি - বিশ্বাস - সংস্কার - জীবিকা - প্রাণধারণের বিভিন্ন প্রসঙ্গ। যে পাঠক কোনোদিন সে তীর্থক্ষেত্রে যায়নি, প্রত্যক্ষ চিত্রবৎ বর্ণনায় তার সামনে তার সামনেও জীবন্ত হয়ে ওঠে এই মরু অঞ্চলের মানুষ আর তাদের আদেখা সংস্কৃতি। লেখকের নিপুণ বর্ণনাগুণেই সেটা সম্ভব হয়েছে।

চরিত্র - চিত্রণ :

কাহিনি মাত্রই চরিত্র নির্ভর। চরিত্রের অন্তবর্তি চিন্তাভাবনা, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া কাহিনি নির্মাণ করে। চরিত্র বলতে বোঝায়, বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পাত্রপাত্রী। এদের স্বভাব - বৈশিষ্ট্য, আবার - আচরণ, ভাষিক বিনিময় লেখার, মেদ - মজ্জা - মাংস গড়ে তোলে। কোনো চরিত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানা অভিব্যাক্তি তার সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা দিতে সক্ষম হয়। সাহিত্যের চরিত্রকেন্দ্রিক আলোচনায় মূলত সেই ধারণাটকে উপস্থাপিত করা হয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

উপন্যাস - ছোটোগল্প কিংবা নাটক আখ্যান নির্ভর রচনা ।সুতরাং সেখানে চরিত্রের উপস্থিতি অনিবার্য। ওচরিত্রের অনেকরকম ভাগ বিভাগ করেচেন সাহিত্য - সমালোচকরা। সেই জটিলতার মধ্যে না গিয়চে কেবল এটুকু বললেই চলবে যে, সব চরিত্রের গুরুত্ব সমান নয়। কাহিনীর সঙ্গে এক একটি পাত্রপাত্রীর এক এক ধরনের সম্পর্ক, প্রয়োজন ও উপযোগিতা গড়ে ওঠে। তার নিরিখে প্রধান - অপ্রধান কেন্দ্রীয় -প্রান্তিক ইত্যাদি বিভাজন আমরা করে ধাকি। ঘটনাসৃষ্টির ক্ষেত্রে চরিত্রের ভূমিকাই মুখ্য। সুতরাং কাহিনি - সৌধের মূল স্তম্ভ হিসেবে দেখা যেতে পারে চরিত্রগুলিকে। সাহিত্যিক চরিত্রটি সামাজিক মানুষেরই প্রতিবিম্ব। অতএব চরিত্রবিচারের মধ্য দিয়ে পাঠকের একধরণের সমাজবীক্ষণও ঘটে।

'অবধূত' রচিত 'মরুতীর্থ হিংলাজ' একটি ভ্রমণকাহিনী। মূলত তির্থভ্রমণের অভিজ্ঞতা দিয়ে এর বর্ণনাংশ সমৃদ্ধ। মরু অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট হিন্দুতীর্থ হিংলাজ। পুরানে কথিত যে, বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পড়ছিল এইস্থানে। তাই এটি দীর্ঘকাল ধরে একটি মহাপীঠ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। বলা হয়ে থাকে যে বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র রাবনকে রামচন্দ্র বধ করলে ব্রহ্মহত্যাজনিত যে পাপ হয়, তা থেকে মুক্ত রামচন্দ্র এই মহাতীর্থ দর্শন করে তাঁর মহাপাতক স্খালন করেছিলেন। এ ভ্রমণকাহিনীরে প্রায় ত্রিশজন যাত্রী চলেছে সেই দুর্গম মরুতীর্থে। গোটা পথ জুড়ে মরুভূমিতে ধূ ধূ বালির প্রান্তর। প্রথম দিকের কিছুটা পথ কাঁটা ঝোপে ভরা থাকলেও বাকিটা রুক্ষ, বিশুষ্ক। যেন কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। বহুদূরে জলের উৎস। মাটি খুঁড়ে হারিয়ে যাওয়া নদী থেকে এক চিলতে করে জল মেলে। যাত্রীরা সেখান থেকে বহু মেহনত করে নিজেদের কুঁজোতে সামান্য একটু জল ভরে নেয়। মরুদ্যানের মতো সেই জায়গাটায় গজীবে ওঠে দু'চার ঘর মানুষের বসতি। যাত্রীরা দীর্ঘ ক্লান্তিকর লম্বা এই যাত্রাপথে যাত্রীরা একে অপরের অপরিচিত হলেও সখ্যের বন্ধনে পরস্পরে বেঁধে ফলে। এক অদ্ভুত মিথোজীবিতা দেখা দেয় তাদের মধ্যে, হয়ে ওঠে একে অন্যের অনন্য সহায়। ধর্ম, বর্ণ, জাত, লিঙ্গ - কোনো পরিচয়ই আর বড়ো হয়ে ওঠে না তাদের কাছে, প্রধান হয়ে ওঠে শুধু জীবনের দায়, প্রাণটুকু নিয়ে ফেরার মস্ত তাগিদ। হিংলাজের যাত্রীরা একটানা একমাস কাটানোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। কিন্তু যাত্রাপথে যা কিউ ঘটনা ঘটে তার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি তাদের ছিল না। লেখক যাত্রীদলের যাত্রার বিবরণই তুলে ধরেছেন গোটা লেখাটি জুড়ে। সেই বিবরণে যেমন মরু অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছ, তেমনি আছে যাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বর্ণনা। কখন কোথায় কীভাবে তারা উপস্থিত হল, আসার সময় পথের কষ্ট, নানাজনের

অভিব্যাক্তি, মত, মন্তব্য, পথের অন্যান্য বিপদ সব কিছু লেখক চিত্রবৎ যেন অঙ্কণ করেছেন। এই যাত্রিদলের মধ্যে প্রায় আকস্মিকভাবে এসে পড়ে রাজপুতনার দুই বিপন্ন যুবক - যুবতী থিরুমল এবং কুন্তী। তাদের জীবনের জটিলতা কাহিনীতে নানা সময়ে আবর্ত ঘনীভূত করে তুলেছে। তাদের নিয়ে যাত্রীদলের যেন দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। থিরুমল আরকুন্তী পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসেই ঘর ছেড়ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে তিন মরুদস্যুর দ্বারা কুন্তী ধর্ষিতা ও থিরুমল প্রচন্ডভাবে আহত হয়। যাত্রীদলের দ্বারা শুশ্রুষা প্রাপ্ত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেও তারা একে অপরকে আর সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না।এদের সম্পর্কের টানাপোড়নে জড়িয়ে পড়ে বাকিরাও। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' কোনো প্রথাসিদ্ধ উপন্যাস নয়, কিন্তু তার কাহিনীর বয়ান উপন্যাসেবান। সুতরাং এদর চরিত্রগুলি পরিস্ফুট হওয়ার অবকাশ পেয়েছে। এই অংশে সেই বিশিষ্ট চরিত্রগুলি পরিস্ফুট হওয়ার অবকাশ পেয়েছে। এই অংশে সেই বিশিষ্ট চরিত্রগুলির ওপর বিশ্লেষণী নজর দেওয়া গেল।

স্বামীজী মহারাজ :

'মরুতীর্থ হিংলাজ' এর লেখক তথা গোটা আখ্যানটির কথক হলেন ইনি। উত্তম পুরুষের জবানিতে সমস্ত তীর্থযাত্রাটি বর্ণিত হয়েছে। এই যাত্রীদলের তিনিই মুখ্য পরিচালক। সেজন্য তাঁকে সবাই 'মোহন্ত মহারাজ' বলে সম্বাধন করেছে। স্বামীজী বাংলাদেশের মানুষ। অনেক তীর্থভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। ঘরের চেয়ে পথই তাঁকে বেশি টানে। সেই পথের আহ্বানেই তিনি এবার ছুটে চলেছেন হিংলাজ মাতার ন্দিরে। তার প্রধান সঙ্গী ভৈরবী। কিন্তু এই নারীর সঙ্গে মহারাজের কী সম্পর্ক তা কোথাও বলা হয়নি। তাঁরা পরস্পর শ্রদ্ধা করেন ভালোবাসেন কেবল এটুকুই অনুভব করা যায়। তীর্থযাত্রার সমস্ত বিবরণই স্বামীজী মহারাজের চোখ দিয়ে দেখা। সবাই তাঁকে বিশিষ্ট স্থান দিলেও তিনি কোথাও বিওশিষ্টতা দাবি করেন না, অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করতে চান না। এই মানুষটির মধ্যে একদিকে যেমন সন্তসুলভ ঔদাসীন্য দেখা যায়, তেমনি গৃহী মানুষের প্রেম - ভালোবাসা, দুঃখ - কাতরতা দ্বারা তাঁর হৃদয়পূর্ণ। তিনি বিবেকবান, বিবেচক, ধৈর্য্যশীল, বুদ্ধিমান, সহৃদয়। তিনি অপরের দুঃখে কষ্টে ব্যাথিত। সকলের সঙ্গে সদাশাপ করতে করতে এগোন। মরুপ্রকৃতির নির্মমতায় তাঁর জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে, কিন্তু হাল ছাড়েন না।কারণ জানেন যে যাত্রীদলের নেতা দুর্বল হয়ে পড়লে যাত্রীদের মনোবল শেষ হয়ে যাবে। তই পথের কষ্টে পিছিয়ে পড়ার যাত্রীকে উৎসাহ দিতে নিজেই কয়েক কদম পেছনে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

হেঁটে আসেন। অন্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ান। দস্যুদলের হাতে নির্যাতিত বিপন্ন অর্ধমৃত থিরুমল ও কুন্তীকে যে দুজন মানুষ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছিল স্বামীজী মহারাজ ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনিই প্রথম বিনিদ্র চোখে দেখতে পেয়েছিলেন ভূপতিত থিরুমলকে। তারপর রুদ্ধশ্বাসে ছুটে অকুস্থলে পৌঁছে কুন্তীর অচৈতন দেহ কাঁধে তুলে রওনা দিয়েছিলেন নিশ্চিত আশ্রয়ে দিকে। শোনবেণীর যে চটীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা, যেখানে এক ঝড়ের রাতে থিরুমল লুকিয়ে কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, তিনিই পাঁচিলের ওপর প্রবল ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে শুনতে পেয়েছিলেন দুজনের কথাবার্তা। কুন্তী সেদিন রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল থিরুমলকে। থিরুমলের পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে গিয়েছিল। নিজের জীবনের প্রতি প্রবল ধিককারে সে নিজেকে শেষ করতে সেদিন আত্মবিনাশের পথে ছুটেছিল উন্মত্ত সাগরের দিকে দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে। স্বামীজী মহারাজ ছুটেছিলেন তার পিছু পিছু। অনেক কষ্টে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে থিরুমলকে ফেরাতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। সবশেষে কুন্তীর হতে উন্মত্ত থিরুমলকে সমর্পণ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।সেদিন প্রবল ঝড়ের মুখে মহারাজেরও জীবন বিপন্ন হতে পারত। কিন্তু তিনি এই দুই অবোধ প্রেমিক - প্রেমিকার প্রেমকে সফল করে তুলতে জীবনের ঝুঁকি নিতে পিছপা হননি।

চন্দ্রকূপে পৌঁছানোর আগে শেরদিলের আস্তানায় যাত্রিদল যখন রাত্রিযাপন করছিল তখন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। কুন্তী ও ভৈরবী শুয়েছিল আলাদা জায়গায়। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থিরুমল তখন কুন্তির ওপর চড়াও হয়। প্রচন্ড আক্রোশে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারার মতলব করে। কিন্তু কুন্তীর চিৎকারে, সবাই জেগে থিরুমলের পিছনে তাড়া করলে সে রুদ্ধশ্বাসে পালিয়ে যায়। শতবার তার নাম ধরে ডাকাডাকি করলেও সে যাত্রীদলের ত্রিসীমানায় ফেরে না। অন্যদের মনে এ নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা না থাকলেও স্বামীজী মহারাজ ভাবিত হন। গোতা দলটি যখন থিরুমলকে ছাড়াই পা বাড়িয়েছে, তখন স্বামীজীর মনের মধ্যে যেন প্রবল দ্বিধা। তাঁর কানে যেন বাজছে কুন্তীর প্রতি থিরুমল। সে দেখছে তাকে ফেলে রেখে সবাই তার কুন্তীকে নিয়ে পালাচ্ছে। এই অনুভব স্বামীজীকে আর সবার তুলনায় আলাদা অবস্থানে দাঁড় করায়। তিনি শুধু এই অপরাধবিধের অনুভূতিটি নিজের মধ্যেই জমিয়ে রাখেন না, গোটা দলকে জানান। চলমান দলটিকে মুহূর্তে থামিয়ে দেন। দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'নামাও কুন্তীকে। নামিয়ে দাও বলছি এখনই। আমাদের কোন অধিকার নেই ওকে নিয়ে যাবার -'। কিন্তু সে কথায় কেউ আমল দেয় না। স্বামীজী সকলকে বোঝাতে কসুর করেন না। তাঁর যুক্তি স্পষ্ট ; সকলের ভয়ে থিরুমল এখন দূরে

সরে থাকলেও একসময় সে ফিরবে। তখন কুন্তীকে না দেখলে আরও ক্ষেপে উঠবে। কুন্তী - থিরুমল তীর্থযাত্রী নয়, তারা আচমকা এসে পড়া দুর্গত দুই নরনারী। তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টতে মহারাজের ধর্মবোধ বিবেকবোধ সায় দিচ্ছে না।

স্বামীজী মহারাজ এ ভ্রমনোপন্যাসের কথক পুরুষ। তাঁর দৃষ্টি, তাঁর অনুভব দিয়েই রচনাটির শরীর গড়া হয়েছে। যাত্রাপথে যে যে ঘটনাগুলি প্রতিমুহূর্তে ঘটেছে, যেসব নৈসর্গিক দৃশ্যাবলির জন্ম হচ্ছে, চলমান যাত্রীদের কষ্ট, কাতরতা, সুখ, আনন্দ, গ্লানি, বেদনা, মরু অঞ্চলের মানুষের জীবন যাপন, সেখানকার প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার - সবকিছু তাঁর জবানিতে উঠে এসেছে। তিনি কোথাও ম্রিয়মান, মূহ্যমান, উৎফুল্ল , অভিভূত, বিস্মিত, আপ্লুত হয়েছেন। যেন তাঁর এই বিচিত্র অনুভূতির চোখ দিয়েই পাঠক অজানা দুর্গম এক পথযাত্রার শরিক হতে পেরেছে। অথচ বর্ণনার ভঙ্গিটি তাঁর নিরাসক্ত। তাঁদের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে ঘটেছে তিন তিনটি ভয়ঙ্কর মৃত্যু। রুদ্র মরুভূমি তিনটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে তিনজনকে গ্রাস করেছে। জয়াশঙ্কর মুরারাজি পান্ডে থিরুমল আর কুন্তীর মৃত্যু স্বামীজী মহারাজের অন্তরকে নাড়িবে দিয়ে গেছেন। অবশেষে পথের প্রান্তে দুই মৃত্যু - যার আকস্মিকতায় তিনি যেন নির্বাক হয়ে গেছেন। অবশেষে পথের প্রান্তে মিলল বহু প্রতীক্ষিত দেবী হিংলাজের পূণ্যতীর্থ। সেখানকার পরিবেশ, পরিস্থিতি ও মন্দিরের রহস্যময়তা স্বামী মহারাজের অনুভূতিকতে আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সমস্ত দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে বলা যেতে পারে, স্বামীজী মহারাজ তথা কথকই এ ভ্রমণোপন্যাসের নায়ক।

ভৈরবী :

হিলংজ যাত্রীদের মধ্যে স্বামীজী মহারাজের পর সবচেয়ে যিনি বীশিষ্ট। তাঁর পরিচয় কথক প্রায় এককথায় সেরেছেন - 'বাঙলাদেশের আওয়াত'। বঙ্গের সজল শামল প্রকৃতির দ্বারা লালিতা তিনি। তাই স্বভাব কোমল। তাঁর পক্ষে এই রুক্ষ মরুভূমির দেশে দীর্ঘ পথ অতিবাহন করা অসম্ভব। এমন বিবেচনা করেই করাচী শহরের সবথেকে বড়ো সোনার ব্যবসায়ী শেঠ ভগবান দাস একটা আস্ত উটের ব্যবস্থা করেছেন, যার পিঠে চড়ে ভৈরবী রওনা দেবেন ইংলজ তীর্থের দিকে। স্বামীজী মহারাজ যেমন গোটা দলটির অভিভাবক তেমনি ভৈরবী দেখা দিয়েছেন অভিভাবিকা রূপে। যাত্রীদলের সকলের সুখ দুঃখ, আর্তি - যন্ত্রনার সঙ্গগে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন। তাই দেখা যায়, উট তাঁর জন্য বরাদ্দ হলেও যে যখন সংকটে পড়েছে নিজে উট থেকে নেমে পদব্রজনের কষ্ট

টিপ্পনী

স্বীকার করে অন্যের যন্ত্রণা লাঘবের ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে উটের পিঠে চড়েছে কুন্তী, থিরুমল,স্বল্পবয়সী মনিরাম। তিনি যেন জননি স্নেহে সকলকে আপনার করে নিয়েছেন। পথের দুঃখ কষ্ট ক্লান্তি বেদনা মুছিয়ে দিয়েছেন ভালোবাসা ও বাৎসল্যের আঁচলে।

টিপ্পনী

এক্ষেত্রে দু'তিনটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। প্রথম ঘটনা বিপন্ন কুন্তীকে আশ্রয়দান। রাজপুতানার এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েকুন্তী, যে স্বামীকে হারানোর পর জীবনের তানে ভালোবাসার মানুষ থিরুমলকে নিয়ে ঘর ছেড়েছিল। মরু - দস্যুদের দ্বারা ধর্ষিতা হওয়ার পর প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় কুন্তী। উদ্ধার পায় যাত্রীদলের দ্বারা। ভৈরবী মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা কুন্তীকে আপন করে নেন। জননী বাৎসল্যে যেন স্নেহের সবটুকু দিয়ে কুন্তীর মনের গ্লানি, শরীরের যন্ত্রণা, নারীত্বের অসমানবোধ সবকিছু ধুয়ে সাফ করে দেন। কুন্তীর কাছ থেকে যতটুকু জানতে পারেন তাতে তাঁর ধারনা হয় এই সমস্ত দুর্গতি মূলে রয়েছে থিরুমল। তাই কুন্তীকে ভালোবেসে আপন করে নিতে পারলেও থিরুমলকে সেভাবে ভৈরবী গ্রহণ করতে পারেননি। থিরুমল সম্পর্কে তাঁর এই অনীহা, ঘৃণা, ক্রোধ আরো প্রবল হয়ে উঠল শেরদলের আস্তানায় বিশ্রাম নেবার রাত্রিতে থিরুমলের অপকীর্তিতে। থিরুমল যে অক্ষম ক্রোধে গলা টিপে কুন্তীর প্রাণনাশ করতে এসেছিল, এটা জানবার পর তার প্রতি ভৈরবীর দুর্বলতা একদম উঠে গিয়েছিল। তিনি থিরুমলকে নির্জন মরুপ্রান্তরে ফলে চলে যেতে বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন।

ভৈরবীর বাৎসল্য প্রকাশ পেয়েছে আর একটি ঘটনায় - সেটি কিশোর মনিরামের প্রতি। মনিরাম পোপটলাল প্যাটেলের লোক। যাত্রাপথে তার ভয়ানক জ্বর এল। কোনমতেই জ্বরনামে না। সুতরাং তার পক্ষে কষ্টকরে পথ হেঁটে পার হওয়া অসম্ভব। দুপুর রৌদ্রে সমস্ত প্রকৃতি তখন জ্বলেছে। ভৈরবী উর্বশির পিঠ থেকে নামলেন, তার পিঠে অসুস্থ মনিরামকে চড়াবেন বলে। পোপটলালের ভেতরটা অস্বস্তিতে খচ্‌খচ্‌ করে উঠল। তিনি তাঁর আফশোসের কথা বলতে এলেন ভৈরবীকে। ভৈরবী দিলেন এক ধমক - "আপনি থামুন তো বাবা দয়া করে। এখন ভালয় ভালয় সকলে পৌঁছতে পারলে বাঁচি। তা আমি হেঁটেই পারি আর গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়েই পারি তাতে আমার কোন দুঃখ নেই।' এই মহানুভবতা ভৈরবীকে মহীয়সী নারীতে পরিনত করেছে।

ভৈরবীর মধ্যে নারীসুলভ দয়া মায়া - মমতা -সেবার এমন দৃষ্টান্ত সমস্ত রচনাটিতে ছড়িয়ে আছে। স্বামীজী মহারাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে নিজের ক্লেশকর অনুভূতির কথা ব্যাক্ত

করলেও ভৈরবীর ক্ষত্রে তা দেখা যায় না। তিনি যেন সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। গোটা দলটি যেন তাঁর পরিবার। সেই পরিবারের সুখ - স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তিনি নিয়ত যত্নশীল। দিনের শেষে যখন কোনো আশ্রয় পেয়ে গোটা দল বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা করছে, তিনি তখন আহারের বন্দোবস্ত নিত। যাত্রাপথে যখন কিছু খাবার মেলেনি, ভৈরবী নিজেই উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে আনা ব্যাক্তিগত খাবারের ভাঁড়ার - কিশমিশ, পেস্তা, বাদাম। তিনি ভক্তিমতী রমনী। স্বামীজী মআরাজের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক স্পষ্ট নয়। কিন্তু মহারাজকে যে মন্যতা দিয়েছেন তাতে যেন জীবনসঙ্গী মর্যাদায়, স্বামীজী ভূষিত। হিংলাজ দর্শনের পর মরুভূমির মরীচিকা স্বামীজী, ভৈরবী ও কুন্তীকে যেভাবে বিভ্রান্ত করে গ্রাস করেছে তা ভয়ংকর। সেইসময়ে ভৈরবীর কষ্ট, যন্ত্রণা, উদ্‌ভ্রান্তময় অবস্থা পাঠককে বভাথিত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ও স্বামীজী মহারাজ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছেন।

টিপ্পনী

থিরুমল :

রাজপুতনার ছেলে, যে জন্ম-ভবঘুরে। যার মা -বাবার পরিচয় অজ্ঞাত, যে পথে পথেই নানাজনের কৃপায়, ধীরে ধীরে বড়ো হতে হয়ে উঠেছে। যে অশৈশব স্নেহের কাঙাল কিন্তু কোথাও তেমন আশ্রয় পায়নি শেষ যাকে সে আশ্রয় করল সেও ভুল বুঝল তাকে। দুর্ভাগা নিয়তি তাকে তাড়া করে নিয়ে গেল মৃত্যুর দিকে, আত্মহননের মধ্য দিয়ে যে নির্বাপিত করল তার অন্তরের সকল জ্বালা। এ কাহিনীতে থিরুমল হতভাগ্য এক প্রেমিক যুবক, যে কোনোখানেই তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেল না।

থিরুমলের প্রথম দিকের জীবন ফ্ল্যাশব্যাকে উপস্থাপিত হয়েছে। তা থেকে দেখা যাচ্ছে তার জন্মের পর হয় তার বাপ মা দুজনেই মারা যায় অথবা পালিয়ে যায়। এক নাচনেওয়ালীর বুকের দুধ খেয়ে সে মানুষ হয়। একদিন সেও তাকে তভাগ করে। এরপর থিরুমলের ঠাঁই হয় এক হারমোনিয়াম বাজিয়ের কাছে। তার জীবিকার আশ্রয় হয়ে ওঠে থিরুমল। ছেলে হয়েও ছোটো মেয়ের যোগ্য পোশাক ঘাঘরা - কাঁচুলি পরে হাটে বাজারে ঘুরতে হত তাকে। একদিন সেই চিলতে আশ্রয়টুকুও ভেসে গেল তার। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হাত সাফাইয়ের খেলা ধরল থিরুমল।ধরা পড়ে তিন বছর জেল। কারামুক্তির পর নতুন মানুষ হয়ে জীবনের পথ বেদরিয়ে পড়ল সে। আবশ্য ততদিন তার নাম ছিল ছুল্লু, এখনই তার নাম হল থিরুমল। ঘুরতে ঘুরতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল রাজস্থানের বড়োদরের এক রানা সাত্তরেদর, যিনি বাইজি পুষতে অভ্যস্ত। সেই বাইজির দেখা শোনার কাজে বহাল হল সে। দিন মন্দ কাটছিল না। আবার ও বাদসাধল ভাগ্য। বাইজি খুন হল। অনেকের

টিপ্পনী

সঙ্গে থিরুমলের হাজতবাস হল। বছরখানেক বাদে সে ছাড়াও পেল। এবার জীবিকা নির্বাহ করতে থিরুমল বেছে নিল লোকঠকানো জ্যোতিষীর পেশা। ভাগ্যগণনা করতে গিয়ে সাক্ষাৎ হল কুন্তীর সঙ্গে, যে বিবাহিত ও যার স্বামী যুদ্ধে গিয়ে আর ফেরেনি। কুন্তীর প্রতি ধীরে ধীরে আসক্ত হয়ে পড়ল সে। কুন্তীও বিষয়টিকে অনুমোদন করল। তারপর একদিন দুজনে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঘরের শিকল কেটে প্রেমের মুক্তাকাশে পাড়ি দিল। জীবন ধারণ করতে গিয়ে থিরুমল বেছে নিল তার চেনা পেশা - পথে ঘাটে নেচে গেয়ে মানুষের মনোরঞ্জন করে পয়সা উপার্জন। কিন্তু যে দর্শক কুন্তী নাচ দেখছে তার লোভী চোখ কুন্তীর যৌবনোচ্ছল শরীরকে না দেখেথাকতে পারে না। সুতরাং নারীদেহ লোভীরা ক্রমশ এগিয়ে এল কুন্তীর দিকে প্রমাদ গুনল থিরুমল। নরপশুদের হাতথেকে নিজের ভালোবাসার জনকে বাঁচাতে অজানা ভাগ্যের হাতে নিজেদের জীবনকে সঙ্গে দিতে থিরুমল দ্বিধা করল না। এই ঝুঁকিটা নিতে সে আদৌ অগ্রপশ্চাৎ ভাবেনি। আর তাই তার চরম খেসারত দিতে হল মরুপ্রান্তরে তিন দস্যুনর হাতে। কুন্তীর উজ্জত লুণ্ঠিত হল, থিরুমল বেদম প্রহৃত হল। তাদের প্রাণ বাঁচল তীর্থযাত্রীদের সহায়তায়। তাদের জীবন বইতে সুরু করল নতুন খাতে।

প্রথম দিকের এই জীবনে থিরুমলের নিজের কোনো হাত ছিল না। সে ভেসে চলেছিল ভাগ্যের গড়া স্রোতে। তখন তার কাছে কেবল অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নটাই প্রধান। এই ভবঘুরে জীবনে সে নানা অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছে কিন্তু নিজের মুষ্যত্ব বিসর্জন দেয়নি। আর দেয়নি বলেই তার প্রেমকে - প্রেমিকাকে অপমান করতে পারেনি। কুন্তীর রূপ তার মধ্যে নেশা ধরিয়েছে, কুন্তীর স্বামী হীনতার বেদনা তার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। কুন্তীকে নিয়ে ঘরবাঁধার স্বপ্ন থিরুমল দেখলেও তাকে বাস্তবায়িত করার সামর্থ্য তার ছিল না। অভাব তাদেরকে নিত্য তাড়না করে ফিরেছে। পেটের দায়ে রাস্তায় নামতে হলেও কুন্তীকে বাজারের মেয়েতে পরিনত করতে তার মন চায়নি। বরং কুন্তীর দিকে লোভের হাত প্রসারিত হতেই সে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে নরুপ্রদশে পাড়ি দিয়েছে।

কুন্তী আর থিরুমলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সূচনা হল দস্যুদলের হাতে তাদের নিগৃহীত হওয়ার পর। শোনবেনীর ধর্মশালায় আশহরয় নেবার পর ধাতস্থ থিরুমল যখন কুন্তীর ঘনিষ্ঠ হতে চাইল, তখন সে প্রথম প্রত্যাখ্যান পেল কুন্তীর দিক থেকে। থিরুমলের বাঁচার জগৎটা মুহূর্তে দুলে উঠল। যার জন্যে আজ সে সবকিছু পরিত্যাগ করে মরুপ্রদেশে এসেছে, আজ সেই তাকে পরিহার করতে চাইছে। এই আঘাতের প্রাথমিক ধাক্কায়, থিরুমল নিজের জীবনটাকেই নিঃশেষ করতে চাইল। প্রবল দুর্যোগের মধ্যে সে ছুটতে লাগল উন্মত্ত সমুদ্রেদর দিকে। তার অতল জলে নিজের সব জ্বালা জুড়াতে চায়। কিন্তু

সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন স্বামীজী মহারাজ । তিনি অতি কষ্টে ফিরিয়ে আনলেন থিরুমলকে। থিরুমল ফিরল বটে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হয়ে নয়। তার চিন্তায় কোথায় যেন জট পাকিয়ে গেছে। সুস্থ স্বাভাবিক নয় আর সে। কখনো সঙ্গত আবরণ করে, কখনো বেহিসেঈ । হঠাৎ হা হা করে হাসে , কখনো মুখ ভার করে থাকে, কখনো বেদনায় মুষড়ে পড়ে। পথশ্রমের ক্লান্তি যেন তার গায়েই লাগে না। সে ভাবে শুধু তার আর কুন্তীর সম্বন্ধের কথা। কুন্তীও তার প্রতি কখনো প্রেমাশক্ত, কখনো বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, উদাসীন। কুন্তীও বুঝে উঠতে পারে না তাকে ইয়ে সে কী করবে।

এই রকম সময়ে দুটি ঘটনা ঘটে, যা থেকে থিরুমলের চরিত্রের অন্দর মহলটি স্পষ্ট হয়। যাত্রাপথে যাত্রীদল সেই তিন দস্যুর কবলে পড়ে যাদের হাতে কুন্তীর উজ্জত লুণ্ঠিত হয়। আন্ধকারের মধ্যে হানা দেয় দস্যুরা। সবাই ভয় পেলেও থিরুমল অকুতোভয়। সে সবার আগে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাফিয়ে পড়ে দস্যুদলের ওপর। এই নির্ভীকতা সে পায় কোথা থাকে? বোধহয় জীবনের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা তার মধ্যে আত্মবলিদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। কুন্তীহীন জীবনে বেঁচে ধাকায় সে কোনো আগ্রহ বোধ করেনি। দ্বিতীয় ঘটনা জয়াশঙ্করজীকে পিঠে করে দীর্ঘ পথ অতিবাহন করা। ক্ষুধাতৃষ্ণার সঙ্গে লড়াই করতে একজন পূর্ণবযস্ক মানুষকে পিঠে বহন করে নিয়ে চলা যে কত কষ্টসাধ্য কাজ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জয়াশঙ্কর যখন নিজে হেঁটে যেতে অসমর্থ ও তার বাহকেরা বহন করতে অপারগ, তখন বীরের মতো থিরুমল এগিয়ে এসেছে। তার মধ্যে মুহূর্তে ঝিলিক দিয়ে ওঠে পরোপকারিতার মানবিক মুখ। কুন্তী আপত্তি করা সত্ত্বেও একটা মানুষকে বহন করার দায় সে নিজের কাঁধে তুলে নেয় ।এ থেকে তার মুক্তি ঘটে জয়শঙ্করের মৃত্যুতে। জয়শঙ্করের মৃতদেহ পঠে নিয়েই সে বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে।

প্রবল প্রেমের প্রত্যাখ্যান যে মানুষকে কোন প্রতিক্রিয়ার দিকে ঠেলে দিতে পারে । থিরুমলের জীবনে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । থিরুমল ভয়ংকর আবেগ নিয়ে ভালোবেসেছিল কুন্তীকে। সে তার নৈমিত্তইক জীবনের অপরিআর্য অঙ্গ করে তুলেছিল। তাই শোনবেনীর ধর্মশালায় কুন্তীর প্রত্যাখ্যান তার জীবনে চরম আঘাত হেনে বসে। সে অস্বাভাবিক আচরণের মানসিক রোগীতে পরিণত হয়। সে মনে করতে থাকে কুন্তী তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই ধারণে থেকেই কুন্তীর ওপর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয় সে। যে রাত্রে অন্ধকার নামল ঘন কালো হয়ে দুহাত দুরের কিছু দেখা যায় না, একটু বাদেই বালির ঝড় উঠবে গোটা মরুভূমি জুড়ে, সেদিন থিরুমল চড়াও হল কুন্তীর ওপর। উটের ওপর কুন্তী চাপা গলায় বলে উঠল - 'উঃ ছাড় - লাগে যে ছিঃ! উন্মাদ থিরুমল

টিপ্পনী

টিপ্পনী

থিরুমল হি হি করে হেসে উঠল লজ্জাহীন হাসি।" কুন্তী নিজেকে থিরুমলের কবল থেকে ছাড়িয়ে নিতে সামান্য ধস্তাতস্তিও করেছিল। থিরুমল বুঝেছিল কুন্তীর জীবনে বোথহয় আর তার ঠাঁই নেই। প্রথমে যে যাত্রীদলকে মনে হয়েছিল তাদের আশ্রয়, একসময় সে মনে করতে শুরু করল এরাই তার কুতীকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে। এজন্য সে একবার কুন্তীকে নিয়ে কাচী ফিরতে চেয়েছে। কিন্তু রূপলাল অর্ধোন্মাদ থিরুমলকে কৌশলে ভুলিয়ে আবার হিংলাজের পথে টেনে নিয়ে গেছে। এই ব্যাথিত প্রত্যাঘ্যাত বেদনাহত থিরুমলের মধ্যে কখনো কখনো জেগে উঠেছে ঔদাসীন্য। সুস্থ থাকার মুহূর্তে তার সাধের হারমোনিয়ামটি নিয়ে সুরের সাধনায় সে মগ্ন হয়েছে। তার সুর গানের মিড় সবাইকে মুগ্ধ করেছে, ভাসিয়ে দিয়েছে আনন্দ - হিল্লোলে। কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ থিরুমল আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না শেরদিলের আস্তানায়। সেদিনও ছিল ঘোর অন্ধকার রাত্রি। সে নিঃশব্দে চুপিসাড়ে কুন্তীর পাশে এসে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবার ফন্দি করে। এই আক্রোশ তার না পাওয়ার বেদনাসঞ্জারত। অবশ্য সফল হয় না তার উদ্দেশ্য। কুন্তীর চিৎকারে সবাই জেগে উঠে তাড়া করলে সে প্রাণ ভয়ে পালায়। আর সহজে যাত্রীদলের সঙ্গ নেয় না ল ভয় না অপরাধবোধ কী যে তাকে তাড়া করে বেড়িবেছে এরপর বোঝা যায় না। তারপর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও।

থিরুমলের জীবনের সেষ অঙ্কের যবনিকাপাত ঘটে চন্দ্রকূপে। যাত্রীদলের পরে সে একাকী চন্দ্রকূপে পৌঁছয়। কুন্তী ভেবেছিল চন্দ্রকূপ স্বামীর প্রসাদে থিরুমপলকে সে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে।কিন্তু বাস্তবে ঘটল অন্যরকম। ফুটন্ত কাদার কুন্ডে ঝাঁপ দিয়ে থিরুমল আত্মহননের মাধ্যমে তার অভিশপ্ত জীবনটি শেষ করে দিল। সামগ্রিক বিচারে মনে হয়, থিরুমল এক দুর্ভাগ্য পীড়িত মানুষ। সে যখন যাকে আশ্রয় করতে চেয়েছে, সেই অবলম্বন শেষ পর্যন্ত টেকেনি। অভাব দারিদ্র্য বুভুক্ষা তার পদে পদে। তাদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তার প্রতিমুহূর্তের বাঁচা। এই সংগ্রামী জীবনে কুন্তী এসেছিল শান্তির বারি বয়ে। কিন্তু তাও তার ভাগ্যে সহিল না। কুন্তী তাকে ভুল বুঝল। আত্মহননের সিদ্ধান্ত প্রায় তখনই সে নেয়। চেষ্টা করে সে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে। কিন্তু তাতে সফল হলে থিরুমল চরম পথ বেছে নেয়। আত্মহননের মধ্য দিয়ে শেষ করে তার অভিশপ্ত জীবন - যাবতীয় কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তও ঘটে এর মধ্য দিয়ে। তার এই আত্মহত্যা তীর্থযাত্রীদের সবার মনে চিরস্থায়ী দাগ রেখে যায়।

কুন্তী :

থিরুমলের মতো কুন্তী ও এক হতভাগিনী নারী। থিরুমলের সঙ্গে তার গাঁটছাড়া বাঁধবার অনেক আগে থাকতেই আত দুর্ভাগ্যের সূচনা। সেও রাজপুতানার মেয়ে। তবে সে যে সে ঘরের মেয়ে নয়। তার বাবা একজন ছোটখাট জায়গীরদার। সুতরাং ছোটোবেলা থেকে কুন্তী আদর যত্নে, ঐশ্বর্যে - সমৃদ্ধিতে প্রতিপালিত। জীবনে তাকে কখনো অর্থাভাবে পোড়তে হয়নি। কুন্তীর যখন বিয়ের বয়স হল তার বাপ সরকারি চাকুরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিল। কুন্তীর স্বামী ফৌজে চাকরি করে। বছরে দু'চার দিনের জন্যে ছুটি পেয়ে বাড়িতে ফেরে, আবার কর্মস্থলে চলে যায়। এভাবেই তাদের দাম্পত্যজীবন চলছিল। গোল বাধল লড়াই শূরু হলে। কুন্তীর স্বামীর আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। স্বামীর বিরহে মনমরা হয়ে পড়ল কুন্তী। নিখোঁজ মানুষটার সন্ধান পাওয়ার চেষ্টায় ব্যগ্র হয়ে পড়ল সে। ঠিক এই সময়টার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল থিরুমলে, যে পেশায় জ্যোতিষী - হাত দেখে মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে। থিরুমলকে কুন্তী বিশ্বাস করেছিল, মনে করেছিল সেই হয়তো একদিন তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। কিন্তু থিরুমল কুন্তীকে দেখে আকৃষ্ট হল, তার স্বামীহীন জীবন অন্যভাবে ভরিয়ে দিতে চাইল। কুন্তী বুঝতে পারল থিরুমলের মনোগত উদ্দেশ্যে এবং সেও উপয়ান্তর না দেখে তাতে নিঃশব্দে সায় দিল।

এরপর থিরুমলের সঙ্গে কুন্তীর ভবঘুরে জীবন হল শুরু। কুন্তীর প্রেমের টানে হয়তো শরীরের আকর্ষণে বেছে নিয়েছে এ পথ। সুতরাং অভাব ও দারিদ্র্যে যত কষ্টই হোল মেনে নিতে দ্বিধা করল না। সে ভুলে গেল তার সামাজিক অভিজাত্য, পিতার সমান, প্রেমের টানে প্রেমিকের সঙ্গেই পথে ঘাটে নাচ দেখিয়ে মানুষের মন ভুলিয়ে টাকা উপার্জণ করতে লাগল। তার মধ্যেও ছিল থিরুমলের মতো আত্মসম্মান। তাই তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে যখন অন্যতরা তার শরীর পেতে আগ্রহী হয়ে উঠল, কুন্তী সেই আহ্বানে কোনো সাড়া দিল না। এইখানেই তার প্রেমের একনিষ্ঠতা। স্বামী ছাড়া আর যাকে সে ভালোবেসেছিল সে এই থিরুমল। এবার সে থিরুমলের সঙ্গে পালিয়ে এল রাজস্থান থেকে করাচী। কিন্তু যে নরশিশুদের হাত থেকে সে মুক্তি পেতে মরুপ্রান্তরে পা বাড়িয়েছিল সেখানেই ওৎ পেতে ছিল ওই জন্তুদেরই ভিন্নরূপ। 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'। কুন্তীর যৌবন আহ্বান করল তিন প্রমও মরুদস্যুকে। তারা নৃশংসভাবে অসহায় কুন্তীকে ধর্ষণ করে প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় মরুভূমিতে ফেলে রেখে চলে গেল। এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ি কে? পরিস্থিতি না ভাগ্য? কুন্তী কিন্তু তাদের দোষারোপ না করে থিরুমলকের ওপর এর দায়ভাগ

টিপ্পনী

চাপিয়ে দিল। মনে হয় এক্ষেত্রে সে তার অবস্থা বিপর্যয়ের জন্য থিরুমকেই একমাত্র কারণ হিসেবে বিবেচনা করেছিল - যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

যাত্রীদল দ্বারা থিরুমল ও কুন্তীর প্রাণরক্ষা পাওয়াসর পর কুন্তী বোধহয় নতুন এক জগতে প্রবেশ করল। সে পেতে শুরু করল জননীসদৃশা ভৈরবীর স্নেহ ও সাহচর্য। ভৈরবীর কাছে সে মনের সবকথা খুলে বলেছিল। হয়তো তখনই কুন্তীর মধ্যে দেখা দেয় কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ। এতদিন যে প্রেমের নেশায় সে বুঁদ হয়েছিল, তার ইজ্জত লুণ্ঠিত হওয়ার পর সেই প্রেমিকের প্রতি তার বিশ্বাস আশ্রয় চিড় ধরল। থিরুমল যে তার গোটা জীবন রক্ষা করতে পারবে না, তার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পারবে না - এই ধারনায় এসে পৌঁছেয় কুন্তী। তার অর্থ এই নয়, যে অন্য পুরুষকে সে আর তার জীবনে গ্রহণ করতে পারবে। আসলে কুন্তী তখ স্বামীজী মহারাজ ও ভৌরবীর আশ্রয়ে বাৎসল্যে জীবনের নতুন তাৎপর্য খুঁজে পেতে শুরু করেছে। ভৈরবী তাকে আশ্বাস দিয়েছেন তীর্থ থেকে তাঁর করাচী ফিরে অন্য যেখানে যাবেন সেখানেই কুন্তীকে নিয়ে যাবেন। ঈশ্বরের পায়ে জীবন উৎসর্গ করাই কুন্তীর এখন লক্ষ্য। বোধহয় এইজন্য শোনবেনীর ধর্মশালায় থিরুমলল দেখা করতে গেলে সে তীব্রকণ্ঠে বলে উঠেছে - "ছুয়ো না বলছি, খবরদার। ..... বলছি আর এগিও না - পথ ছাড়। ..... সরদর দাঁড়াও বলছি বেইমান। সাইজী জাগলে আমার সর্বনাশ হবে। যে চুলোয় ইচ্ছা তুমি যাও, দূর হও।" এই কথাগুলোর মধ্যে কুন্তীর আশাভঙ্গের বেদনা যেন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সে আর চায় না থিরুমলের সঙ্গে বাকি জীবনটা বয়ে নিয়ে বেড়াতে।

কিন্তু কুন্তীকে আবার ফিরতে হয় তার পুরনো বাঁধাধরা রাস্তায় । তার প্রবল প্রত্যাখানে প্রায় উন্মাদ হয়ে যায় থিরুমল ছোটে আত্ম হননে পথে। অনেক কষ্টে স্বামীজী মহারাজ থিরুমলকে ঋত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে এনে সঁপে দেন কুন্তীর হাতে। কুন্তী 'না' বলতে পারে না। তার কাছে একদিকে থিরুমল অসহনীয়, অন্যদিকে অপরিহার্য। তার পরবর্তী আচরণে এই মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কখনো সে উদ্‌ভ্রান্ত অপ্রকৃতিস্থ থিরুমলের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে বলেছে, কখনো থিরুমল ঘনিষ্ঠ্য হতে গেলে রূঢ় ব্যবহারে আঘাত করেছে। জয়াশঙ্করজীকে পিঠে করে নেবার প্রস্তাবে কুন্তী হাঁ হাঁ করে ওঠে, সে কোনমতেই নিতে দেবে না থিরুমলকে । তারপ্রতি ভালবাসার এ আর এক প্রকাশ। একই ব্যাপার লক্ষ করা যায় নির্জনে থিরুমলের হারমোনিয়াম বাকয়ে সুর তোলার সময় । তার শান্ত স্নিগ্ধ মুখের দিকে নির্নিমেষে তাইয়ে থাকে কুন্তী । সে ভেবেছিল, থিরুমলকে একবার চন্দ্রকূপ বাবার মন্দিরে নিয়ে যেতে পারলে তার সমস্ত অস্বাভাবিকতাস কাতীয়ে ফেলতে পারবে। থিরুমল ছাড়া সে আর কারও সঙ্গে জীবন কাটাতে পারবে না,

কুন্তীর মনের ভেতর এই ভাবটা ছিল। তবে শেরদিলের আস্তানায় থিরুমলের আচরণ কুন্তীকে শুধু নির্বাক করে দেয়, তাই নয় তার প্রতি প্রবল ঘৃণারও জন্ম দেয়। স্বামীজী মহারাজ থিরুমলের ব্যাপারে দুর্বলতা দেখালেও কুন্তী একেবারেই নিশ্চুপ। অবশেষে চন্দ্রকূপের গলন্ত ফুটন্ত কাদার পিন্ডের মধ্যে থিরুমলের সেই মরণ ঝাঁপ। চোখের নিমেষে তার দেহ সেই পঞ্চরাশির মধ্যে ডুবে গেল। সেই মুহূর্তে কুন্তীর অভিব্যাক্তির যে বিবরণ আছে তাতে অণুমান করা যায় কী প্রচন্ড বেদনা ও নরাশ্য তাকে গ্রাস করেছিল। থিরুমলকে ছাড়া সে চন্দ্রকূপ পাহাড়ে উঠতে চায় নি। থিরুমলের দ্বারা সে বারবার নিগৃহীত হলেও তার প্রতিই তার ভালোবাসা যে সদাজাগ্রত ছিল নিচের উক্তিটি তার পাথুরে প্রমাণ -

> "না না না - যাব না আমি ঐ পাহাড়ের উপরে। একলা আমি ওখানে কিছুতেই যাব না। বড় আশা করেছিলেম আমি একবার তাকে নিয়ে চন্দ্রকূপ বাবার সথানে পৌঁছতে পারলেই তার মাথার গোলমাল সেরে যাবে, সে আবার মানুষ হয়ে উঠবে। তার হাত ধরে সারাজীবন আমি পথে পথে ঘুরে বেডাব। লোকের দরজায় দরজায় ভিক্ষা মেগে খাব। সে ভিন্ন আর কেউই যে আমাকে ছোঁবে না। যতক্ষণ তার হুশ ছিল সে আমায় ছেড়ে পালায় নি। আমাকে বাঁচবার জন্য সে নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে গিয়েচিল আর আজ তাকে যমের মুখে ফেলে রেখে নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে গিয়েছিল আর আজ তাকে যমের মুখে ফেলে রেখে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি!"

এই কথাগুলির মধ্যে অনুতাপানলে দগ্ধ কুন্তীর বিবেক যেন আর্তনাদ করে উঠেছে। সে বিশ্বাস রতে শুরু করেছে যদি সে স্বামীজী মহারাজের কথামতো শেরদিলের আস্তানাতেই রয়ে যেত, তাহলে থিরুমল একদিন না - একদিন এসে ঠিক তার কাছে ধরা দিত। থিরুমলের আত্মহননের সেই বীভৎস দৃশ্য কুন্তীর আন্তরটাকে টলিয়ে দিল। সে একটা প্রাণফাটা চিৎকার করে উঠল। যেন তার সামনেই নির্বাষিত হল তার সকল আশার প্রদীপ। কিন্তু জীবন তো বয়ে চলেছে। কুন্তীকেও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়েছে। ধীরে ধীরে সামলে নিয়েছে তার ব্যাক্তিগত শোক তাল মিলিয়ে চলতে হয়েছে। ধীরে ধীরে সামলে নিয়েছে তার ব্যাক্তিগত শোক যন্ত্রণা।

প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী :

ক. ভ্রমণ সাহিত্য কাকে বলে?

টিপ্পনী

খ. মরুতীর্থ হিংলাজ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত কাহিনী সার আলোচনা করো।

গ. হিংলাজ যাত্রার পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পককে আলোচনা কর।

ঘ. মরুপ্রদেশের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে লেখ।

টিপ্পনী

ঙ. মরুতীর্থ হিংলাজের স্বামীজী মহারাজের চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করো।

চ. কুন্তী চরিত্রটি আলোচনা করো।

ছ. ভৈরবী চরিত্র সম্পককে লেখ।

জ. থিরুমল চরিত্র সম্পককে লেখ।